গল্পগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তৃতীয় খণ্ড
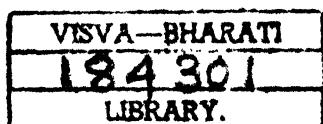
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কলিকাতা

বিশ্বভারতী সংস্করণ জানুয়ারি ১৯২৭
পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৪২, চৈত্র ১৩৫৩, চৈত্র ১৩৫৬
বৈশাখ ১৩৬৪, শ্রাবণ ১৩৬৭
আষাঢ় ১৩৭৬ : ১৮৯১ শক

গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডে, ১৩১০ পৌষ হইতে
১৩৪০ কার্তিকের মধ্যে প্রকাশিত গল্পগুলি
প্রকাশের কালক্রমে সংকলিত হইল
প্রত্যেক গল্পের শেষে প্রকাশকাল মুদ্রিত

প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
মুদ্রক শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস। ৬৬ গ্রে স্ট্রীট। কলিকাতা ৬
৫·১

সূচীপত্র

প্রকাশ ও বিন্যাস-অনুযায়ী

সূচীপত্র

বর্ণানুক্রমিক

গল্পগুচ্ছ

তৃতীয় খণ্ড

কর্মফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

আজ সতীশের মাসী সুকুমারী এবং মেসোমশায় শশধরবাবু আসিয়াছেন—সতীশের মা বিধুমুখী ব্যস্তসমস্তভাবে তাঁহাদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত। "এসো দিদি, বোসো। আজ কোন্ পুণ্যে রায়মশায়ের দেখা পাওয়া গেল!—দিদি না আসলে তোমার আর দেখা পাবার জো নেই।"

শশধর। এতেই বুঝবে, তোমার দিদির শাসন কী রকম কড়া। দিনরাত্রি চোখে চোখে রাখেন।

সুকুমারী। তাই বটে, এমন রত্ন ঘরে রেখেও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমনো যায় না।

বিধুমুখী। নাক ডাকার শব্দে!

সুকুমারী। সতীশ, ছি ছি, তুই এ কী কাপড় পরেছিস। তুই কি এইরকম ধুতি প'রে ইস্কুলে যাস নাকি। বিধু, ওকে যে ফ্রকটা কিনে দিয়েছিলেম সে কী হল।

বিধুমুখী। সে ও কোন্ কালে ছিঁড়ে ফেলেছে।

সুকুমারী। তা তো ছিঁড়বেই। ছেলেমানুষের গায়ে এক কাপড় কতদিন টেঁকে। তা, তাই বলে কি আর নূতন ফ্রক তৈরি করাতে নেই। তোদের ঘরে সকলই অনাসৃষ্টি।

বিধুমুখী। জান'ই তো দিদি, তিনি ছেলের গায়ে সভ্য কাপড় দেখলেই আগুন হয়ে ওঠেন। আমি যদি না থাকতেম তো তিনি বোধ হয় ছেলেকে দোলাই গায়ে দিয়ে কোমরে ঘুনসি পরিয়ে ইস্কুলে পাঠাতেন—মা গো! এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দও কারও দেখি নি।

সুকুমারী। মিছে না। এক বই ছেলে নয়—একে একটু সাজাতে-গোজাতেও ইচ্ছা করে না! এমন বাপও তো দেখি নি। সতীশ, পরশু রবিবার আছে, তুই আমাদের বাড়ি যাস, আমি তোর জন্যে এক-সুট কাপড় র‍্যাম্‌জের ওখান হতে আনিয়ে রাখব। আহা, ছেলেমানুষের কি শখ হয় না।

সতীশ। এক-সুটে আমার কী হবে, মাসিমা। ভাদুড়ি সাহেবের ছেলে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে, সে আমাকে তাদের বাড়িতে পিংপং খেলায় নিমন্ত্রণ করেছে—আমার তো সেরকম বাইরে যাবার মখমলের কাপড় নেই।

শশধর। তেমন জায়গায় নিমন্ত্রণে না যাওয়াই ভালো, সতীশ।

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না। ওর যখন তোমার মতন বয়স হবে তখন—

শশধর। তখন ওকে বক্তৃতা দেবার অন্য লোক হবে, বৃদ্ধ মেসোর পরামর্শ শোনবার অবসর হবে না।

সুকুমারী। আচ্ছা মশায়, বক্তৃতা করবার অন্য লোক যদি তোমাদের ভাগ্যে না জুটত তবে তোমাদের কী দশা হত বলো দেখি।

শশধর। সে কথা বলে লাভ কী। সে অবস্থা কল্পনা করাই ভালো।

সতীশ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) না না, এখানে আনতে হবে না, আমি যাচ্ছি।

প্রস্থান

সুকুমারী। সতীশ ব্যস্ত হয়ে পালালো কেন, বিধু।

বিধুমুখী। থালায় করে তার জলখাবার আনছিল কিনা, ছেলের তাই তোমাদের সামনে লজ্জা।

সুকুমারী। আহা, বেচারার লজ্জা হতে পারে। ও সতীশ, শোন্‌ শোন্‌। তোর মেসোমশায় তোকে পেলেটির বাড়ি থেকে আইস্‌ক্রীম খাইয়ে আনবেন, তুই ওঁর সঙ্গে যা। ওগো, যাও-না, ছেলেমানুষকে একটু—

সতীশ। মাসিমা, সেখানে কী কাপড় পরে যাব।

বিধুমুখী। কেন, তোর তো চাপকান আছে।

সতীশ। সে বিশ্রী।

সুকুমারী। আর যাই হোক বিধু, তোর ছেলে ভাগ্যে পৈতৃক পছন্দটা পায় নি তাই রক্ষা। বাস্তবিক, চাপকান দেখলেই খানসামা কিম্বা যাত্রার দলের ছেলে মনে পড়ে। এমন অসভ্য কাপড় আর নেই।

শশধর। এ কথাগুলো—

সুকুমারী। চুপিচুপি বলতে হবে? কেন, ভয় করতে হবে কাকে। মন্মথ নিজের পছন্দমতো ছেলেকে সাজ করাবেন আর আমরা কথা কইতেও পাব না?

শশধর। সর্বনাশ। কথা বন্ধ করতে আমি বলি নে। কিন্তু সতীশের সামনে এ-সমস্ত আলোচনা—

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ। তুমি ওকে পেলেটির ওখানে নিয়ে যাও।

সতীশ। না মাসিমা, আমি সেখানে চাপকান পরে যেতে পারব না।

সুকুমারী। এই-যে মন্মথবাবু আসছেন। এখনি সতীশকে নিয়ে বকাবকি করে ওকে অস্থির করে তুলবেন। ছেলেমানুষ, বাপের বকুনির চোটে ওর একদণ্ড শান্তি নেই। আয় সতীশ, তুই আমার সঙ্গে আয়— আমরা পালাই।

সুকুমারীর প্রস্থান। মন্মথর প্রবেশ

বিধু। সতীশ ঘড়ি ঘড়ি করে কয়দিন আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। দিদি তাকে একটা রুপোর ঘড়ি দিয়েছেন— আমি আগে থাকতে বলে রাখলেম, তুমি আবার শুনলে রাগ করবে।

বিধুমুখীর প্রস্থান

মন্মথ। আগে থাকতে বলে রাখলেও রাগ করব। শশধর, সে ঘড়িটি তোমাকে নিয়ে যেতে হবে।

শশধর। তুমি তো আচ্ছা লোক। নিয়ে তো গেলেম, শেষকালে বাড়ি গিয়ে জবাবদিহি করবে কে।

মন্মথ। না শশধর, ঠাট্টা নয়, আমি এ-সব ভালোবাসি নে।

শশধর। ভালোবাস না, কিন্তু সহ্যও করতে হয়— সংসারে এ কেবল তোমার একলারই পক্ষে বিধান নয়।

মন্মথ। আমার নিজের সম্বন্ধে হলে আমি নিঃশব্দে সহ্য করতেম। কিন্তু ছেলেকে আমি মাটি করতে পারি না। যে ছেলে চাবা-মাত্রই পায়, চাবার পূর্বেই যার অভাবমোচন হতে থাকে, সে নিতান্ত দুর্ভাগা। ইচ্ছা দমন করতে না শিখে কেউ কোনো কালে সুখী হতে পারে না। বঞ্চিত হয়ে ধৈর্যরক্ষা করবার যে-বিদ্যা— আমি তাই ছেলেকে

দিতে চাই, ঘড়ি ঘড়ির-চেন জোগাতে চাই নে।

শশধর। সে তো ভালো কথা, কিন্তু তোমার ইচ্ছামাত্রেই তো সংসারের সমস্ত বাধা তখনি ধূলিসাৎ হবে না। সকলেরই যদি তোমার মতো সদ্‌বুদ্ধি থাকত তা হলে তো কথাই ছিল না; তা যখন নেই তখন সাধুসংকল্পকেও গায়ের জোরে চালানো যায় না, ধৈর্য চাই। স্ত্রীলোকের ইচ্ছার একেবারে উলটামুখে চলবার চেষ্টা করলে অনেক বিপদে পড়বে—তার চেয়ে পাশ কাটিয়ে একটু ঘুরে গেলে সুবিধামতো ফল পাওয়া যায়। বাতাস যখন উলটা বয় জাহাজের পাল তখন আড় করে রাখতে হয়, নইলে চলা অসম্ভব।

মন্মথ। তাই বুঝি তুমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সায় দিয়ে যাও। ভীরু!

শশধর। তোমার মতো অসম সাহস আমার নেই। যাঁর ঘরকন্নার অধীনে চব্বিশ ঘণ্টা বাস করতে হয় তাঁকে ভয় না করব তো কাকে করব। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বীরত্ব করে লাভ কী। আঘাত করলেও কষ্ট, আঘাত পেলেও কষ্ট। তার চেয়ে তর্কের বেলায় গৃহিণীর মতকে সম্পূর্ণ অকাট্য ব'লে স্বীকার ক'রে কাজের বেলায় নিজের মত চালানোই সৎপরামর্শ—গোঁয়ারতুমি করতে গেলেই মুশকিল বাধে।

মন্মথ। জীবন যদি সুদীর্ঘ হত তবে ধীরে-সুস্থে তোমার মতে চলা যেত, পরমায়ু যে অল্প।

শশধর। সেইজন্যই তো ভাই, বিবেচনা করে চলতে হয়। সামনে একটা পাথর পড়লে যে লোক ঘুরে না গিয়ে সেটা ডিঙিয়ে পথ সংক্ষেপ করতে চায়, বিলম্ব তারই অদৃষ্টে আছে। কিন্তু তোমাকে এ-সকল বলা বৃথা—প্রতিদিনই তো ঠেকছ তবু যখন শিক্ষা পাচ্ছ না, তখন আমার উপদেশে ফল নেই। তুমি এমনি ভাবে চলতে চাও যেন তোমার স্ত্রী ব'লে একটা শক্তির অস্তিত্ব নেই—অথচ তিনি যে আছেন সে-সম্বন্ধে তোমার লেশমাত্র সন্দেহ থাকবার কোনো কারণ দেখি নে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাম্পত্য কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া—শাস্ত্রে এইরূপ লেখে। কিন্তু দম্পতি-বিশেষে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা অস্বীকার করেন না।

মন্মথবাবুর সহিত তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে মধ্যে যে বাদপ্রতিবাদ ঘটিয়া থাকে তাহা নিশ্চয়ই কলহ, তবু তাহার আরম্ভ বহু নহে, তাহার ক্রিয়াও লঘু নহে—ঠিক অজাযুদ্ধের সঙ্গে তাহার তুলনা করা চলে না।

কয়েকটি দৃষ্টান্তদ্বারা এ কথার প্রমাণ হইবে।

মন্মথবাবু কহিলেন, "তোমার ছেলেটিকে যে বিলিতি পোশাক পরাতে আরম্ভ করেছ, সে আমার পছন্দ নয়।"

বিধু কহিলেন, "পছন্দ বুঝি একা তোমারই আছে। আজকাল তো সকলেই ছেলেদের ইংরেজি কাপড় ধরিয়েছে।"

মন্মথ হাসিয়া কহিলেন, "সকলের মতেই যদি চলবে তবে সকলকে ছেড়ে একমাত্র আমাকেই বিবাহ করলে কেন।"

বিধু। তুমি যদি কেবল নিজের মতেই চলবে তবে একা না থেকে আমাকেই বা

তোমার বিবাহ করবার কী দরকার ছিল।

মন্মথ। নিজের মত চালাবার জন্যও যে অন্য লোকের দরকার হয়।

বিধু। নিজের বোঝা বহাবার জন্য ধোবার দরকার হয় গাধাকে, কিন্তু আমি তো আর—

মন্মথ। (জিব কাটিয়া) আরে রাম রাম, তুমি আমার সংসার-মরুভূমির আরব ঘোড়া। কিন্তু সে প্রাণীবৃত্তান্তের তর্ক এখন থাক্। তোমার ছেলেটিকে সাহেব করে তুলো না।

বিধু। কেন করব না। তাকে কি চাষা করব।

এই বলিয়া বিধু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিধুর বিধবা জা পাশের ঘরে বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে করিলেন, স্বামী-স্ত্রীতে বিরলে প্রেমালাপ হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মন্মথ। ও কী ও, তোমার ছেলেটিকে কী মাখিয়েছ।

বিধু। মূর্ছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছু নয়, একটুখানি এসেন্স্ মাত্র। তাও বিলাতি নয়—তোমাদের সাধের দিশি।

মন্মথ। আমি তোমাকে বারবার বলেছি, ছেলেদের তুমি এ-সমস্ত শৌখিন জিনিস অভ্যাস করাতে পারবে না।

বিধু। আচ্ছা, যদি তোমার আরাম বোধ হয় তো কাল হতে কেরোসিন এবং ক্যাস্টর অয়েল মাখাব।

মন্মথ। সেও বাজে খরচ হবে। যেটা না হলেও চলে সেটা না অভ্যাস করাই ভালো; কেরোসিন, ক্যাস্টর অয়েল গায়ে মাথায় মাখা আমার মতে অনাবশ্যক।

বিধু। তোমার মতে আবশ্যক জিনিস কটা আছে তা তো জানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে বসতে হয়।

মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদপ্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে। এতকালের দৈনিক অভ্যাস হঠাৎ ছাড়লে এ-বয়সে হয়তো সহ্য হবে না। যাই হোক, এ-কথা আমি তোমাকে আগে হতে ব'লে রাখছি, ছেলেটিকে তুমি সাহেব কর বা নবাব কর বা সাহেবি-নবাবির খিচুড়ি পাকাও, তার খরচ আমি জোগাব না। আমার মৃত্যুর পরে সে যা পাবে তাতে তার শখের খরচ কুলোবে না।

বিধু। সে আমি জানি। তোমার টাকার উপরে ভরসা রাখলে ছেলেকে কোপ্‌নি পরানো অভ্যাস করাতেম।

বিধুর এই অবজ্ঞাবাক্যে মর্মাহত হইয়াও মন্মথ ক্ষণকালের মধ্যে সামলাইয়া লইলেন; কহিলেন, "আমিও তা জানি। তোমার ভগিনীপতি শশধরের 'পরেই তোমার ভরসা। তার সন্তান নেই বলে ঠিক করে বসে আছ, তোমার ছেলেকেই সে উইলে সমস্ত লিখে-পড়ে দিয়ে যাবে। সেইজন্যই যখন-তখন ছেলেটাকে ফিরিঙ্গি সাজিয়ে এক-গা গন্ধ মাখিয়ে তার মেসোর আদর কাড়বার জন্য পাঠিয়ে দাও। আমি দারিদ্র্যের লজ্জা অনায়াসেই সহ্য করতে পারি, কিন্তু ধনী কুটুম্বের সোহাগযাচনার লজ্জা

আমার সহ্য হয় না।"

এ-কথা মন্মথর মনে অনেকদিন উদয় হইয়াছে, কিন্তু কথাটা কঠোর হইবে বলিয়া এ-পর্যন্ত কখনো বলেন নাই। বিধু মনে করিতেন, স্বামী তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, কারণ স্বামীসম্প্রদায় স্ত্রীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অপরিসীম মূর্খ। কিন্তু মন্মথ যে বসিয়া বসিয়া তাঁহার চাল ধরিতে পারিয়াছেন, হঠাৎ জানিতে পারিয়া বিধুর পক্ষে মর্মান্তিক হইয়া উঠিল।

মুখ লাল করিয়া বিধু কহিলেন, "ছেলেকে মাসির কাছে পাঠালেও গায়ে সয় না, এতবড়ো মানী লোকের ঘরে আছি সে তো পূর্বে বুঝতে পারি নি।"

এমন সময় বিধবা জা প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মেজবউ, তোদের ধন্য। আজ সতেরো বৎসর হয়ে গেল তবু তোদের কথা ফুরালো না! রাত্রে কুলায় না, শেষকালে দিনেও দুইজনে মিলে ফিস্‌ফিস্‌! তোদের জিবের আগায় বিধাতা এত মধু দিনরাত্রি জোগান কোথা হতে আমি তাই ভাবি। রাগ কোরো না ঠাকুরপো, তোমাদের মধুরালাপে ব্যাঘাত করব না, একবার কেবল দু মিনিটের জন্য মেজবউয়ের কাছ হতে শেলাইয়ের প্যাটার্নটা দেখিয়ে নিতে এসেছি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সতীশ। জেঠাইমা!

জেঠাইমা। কী বাপ।

সতীশ। আজ ভাদুড়িসাহেবের ছেলেকে মা চা খাওয়াবেন, তুমি যেন সেখানে হঠাৎ গিয়ে পোড়ো না।

জেঠাইমা। আমার যাবার দরকার কী, সতীশ।

সতীশ। যদি যাও তো তোমার এ কাপড়ে চলবে না, তোমাকে—

জেঠাইমা। সতীশ, তোর কোনো ভয় নেই, আমি এই ঘরেই থাকব, যতক্ষণ তোর বন্ধুর চা খাওয়া না হয়, আমি বার হব না।

সতীশ। জেঠাইমা, আমি মনে করছি, তোমার এই ঘরেই তাকে চা খাওয়াবার বন্দোবস্ত করব। এ বাড়িতে আমাদের যে ঠাসাঠাসি লোক—চা খাবার, ডিনার খাবার মতো ঘর একটাও খালি পাবার জো নেই। মার শোবার ঘরে সিন্দুক-ফিন্দুক কত কী রয়েছে, সেখানে কাকেও নিয়ে যেতে লজ্জা করে।

জেঠাইমা। আমার এখানেও তো জিনিসপত্র—

সতীশ। ওগুলো আজকের মতো বার করে দিতে হবে। বিশেষত তোমার এই বঁটি-চুপড়ি-বারকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখলে চলবে না।

জেঠাইমা। কেন বাবা, ওগুলোতে এত লজ্জা কিসের। তাদের বাড়িতে কি কুটনো কুটবার নিয়ম নেই।

সতীশ। তা জানি নে জেঠাইমা, কিন্তু চা খাবার ঘরে ওগুলো রাখা দস্তুর নয়। এ দেখলে নরেন ভাদুড়ি নিশ্চয় হাসবে, বাড়ি গিয়ে তার বোনদের কাছে গল্প করবে।

জেঠাইমা। শোনো একবার, ছেলের কথা শোনো। বঁটি-চুপড়ি তো চিরকাল ঘরেই থাকে। তা নিয়ে গল্প করতে তো শুনি নি।

সতীশ। তোমাকে আর-এক কাজ করতে হবে,—জেঠাইমা— আমাদের নন্দকে তুমি যেমন করে পার এখানে ঠেকিয়ে রেখো। সে আমার কথা শুনবে না, খালি গায়ে ফস্‌ করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জেঠাইমা। তাকে যেন ঠেকালেম, কিন্তু তোমার বাবা যখন খালি গায়ে—

সতীশ। সে আমি আগেই মাসিমাকে গিয়ে ধরেছিলেম, তিনি বাবাকে আজ পিঠে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন, বাবা এ-সমস্ত কিছুই জানেন না।

জেঠাইমা। বাবা সতীশ, যা মন হয় করিস, কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ঐ খানাটানাগুলো—

সতীশ। সে ভালো করে সাফ করিয়ে দেব এখন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সতীশ। মা, এমন করে তো চলে না।

বিধু। কেন, কী হয়েছে।

সতীশ। চাঁদনির কোট ট্রাউজার পরে আমার বার হতে লজ্জা করে। সেদিন ভাদুড়িসাহেবের বাড়ি ইভনিং পার্টি ছিল, কয়েকজন বাবু ছাড়া আর সকলেই ড্রেস সুট পরে গিয়েছিল, আমি সেখানে এই কাপড়ে গিয়ে ভারি অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম। বাবা কাপড়ের জন্য যে সামান্য টাকা দিতে চান তাতে ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

বিধু। জান তো সতীশ, তিনি যা ধরেন তা কিছুতেই ছাড়েন না। কত টাকা হলে তোমার মনের মতো পোশাক হয়, শুনি।

সতীশ। একটা মর্নিং সুট আর একটা লাউঞ্জ সুটে এক-শ টাকার কাছাকাছি লাগবে। একটা চলনসই ইভনিং ড্রেস দেড়-শ টাকার কমে কিছুতেই হবে না।

বিধু। বল কী, সতীশ। এ তো তিন-শ টাকার ধাক্কা, এত টাকা—

সতীশ। মা, ঐ তোমাদের দোষ। এক ফকির করতে চাও সে ভালো, আর যদি ভদ্রসমাজে মিশতে হয় তবে অমন টানাটানি করে চলে না। ভদ্রতা রাখতে গেলে তো খরচ করতে হবে, তার তো কোনো উপায় নেই। সুন্দরবনে পাঠিয়ে দাও-না কেন, সেখানে ড্রেস কোটের দরকার হবে না।

বিধু। তা তো জানি, কিন্তু— আচ্ছা, তোমার মেসো তো তোমাকে জন্মদিনের উপহার দিয়ে থাকেন, এবারকার জন্য একটা নিমন্ত্রণের পোশাক তাঁর কাছ হতে জোগাড় করে নাও-না। কথায় কথায় তোমার মাসির কাছে একটু আভাস দিলেই হয়।

সতীশ। সে তো অনায়াসেই পারি, কিন্তু বাবা যদি টের পান আমি মেসোর কাছ হতে কাপড় আদায় করেছি, তা হলে রক্ষা থাকবে না।

বিধু। আচ্ছা, সে আমি সামলাতে পারব।

সতীশের প্রস্থান

ভাদুড়িসাহেবের মেয়ের সঙ্গে যদি সতীশের কোনো মতে বিবাহের জোগাড় হয় তা হলেও আমি সতীশের জন্য অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। ভাদুড়িসাহেব ব্যারিস্টার মানুষ, বেশ দু-দশ টাকা রোজগার করে। ছেলেবেলা হতেই সতীশ তো ওদের বাড়ি আনাগোনা করে, মেয়েটি তো আর পাষাণ নয়, নিশ্চয় আমার সতীশকে

পছন্দ করবে। সতীশের বাপ তো এ-সব কথা একবার চিন্তাও করেন না, বলতে গেলে আগুন হয়ে ওঠেন, ছেলের ভবিষ্যতের কথা আমাকেই সমস্ত ভাবতে হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মিস্টার ভাদুড়ির বাড়িতে টেনিসক্ষেত্র

নলিনী। ও কী সতীশ, পালাও কোথায়?

সতীশ। তোমাদের এখানে টেনিস পার্টি জানতেম না, আমি টেনিস সুট পরে আসি নি।

নলিনী। সকল গোরুর তো এক রঙের চামড়া হয় না, তোমার নাহয় ওরিজিন্যাল ব'লেই নাম রটবে। আচ্ছা, আমি তোমার সুবিধা করে দিচ্ছি। মিস্টার নন্দী, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

নন্দী। অনুরোধ কেন, হুকুম বলুন না— আমি আপনারই সেবার্থে।

নলিনী। যদি একবারে অসাধ্য বোধ না করেন তো আজকের মতো আপনারা সতীশকে মাপ করবেন—ইনি আজ টেনিস সুট পরে আসেন নি। এতবড়ো শোচনীয় দুর্ঘটনা!

নন্দী। আপনি ওকালতি করলে খুন জাল ঘর-জ্বালানোও মাপ করতে পারি। টেনিস সুট না পরে এলে যদি আপনার এত দয়া হয় তবে আমার এই টেনিস সুটটা মিস্টার সতীশকে দান করে তাঁর এই— এটাকে কী বলি! তোমার এটা কী সুট, সতীশ— খিচুড়ি সুটই বলা যাক— তা আমি সতীশের এই খিচুড়ি সুটটা পরে রোজ এখানে আসব। আমার দিকে যদি স্বর্গের সমস্ত সূর্য চন্দ্র তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তবু লজ্জা করব না। সতীশ, এ কাপড়টা দান করতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তবে তোমার দরজির ঠিকানাটা আমাকে দিয়ো। ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে মিস ভাদুড়ির দয়া অনেক মূল্যবান্।

নলিনী। শোনো শোনো সতীশ, শুনে রাখো। কেবল কাপড়ের ছাঁট নয়, মিষ্ট কথার ছাঁদও তুমি মিস্টার নন্দীর কাছে শিখতে পার। এমন আদর্শ আর পাবে না। বিলাতে ইনি ডিউক ডাচেস ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথাও কন নি। মিস্টার নন্দী, আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালি ছাত্র কে কে ছিল।

নন্দী। আমি বাঙালিদের সঙ্গে সেখানে মিশি নি।

নলিনী। শুনছ, সতীশ? রীতিমতো সভ্য হতে গেলে কত সাবধানে থাকতে হয়। তুমি বোধ হয় চেষ্টা করলে পারবে। টেনিস সুট সম্বন্ধে তোমার যেরকম সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান তাতে আশা হয়।

অন্যত্র গমন

সতীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নেলিকে আজ পর্যন্ত বুঝতেই পারলেম না। আমাকে দেখে ও বোধ হয় মনে মনে হাসে। আমারও মুশকিল হয়েছে, আমি কিছুতে এখানে এসে সুস্থমনে থাকতে পারি নে— কেবলই মনে হয়, আমার টাইটা বুঝি কলারের উপরে উঠে গেছে, আমার ট্রাউজারে হাঁটুর কাছটায় হয়তো কুঁচকে আছে। নন্দীর মতো কবে আমিও বেশ ঐরকম অনায়াসে স্ফূর্তির সঙ্গে—

নলিনী। (পুনরায় আসিয়া) কী সতীশ, এখনো যে তোমার মনের খেদ মিটল না। টেনিস কোর্তার শোকে তোমার হৃদয়টা যে বিদীর্ণ হয়ে গেল। হায়, কোর্তাহারা হৃদয়ের সান্ত্বনা জগতে কোথায় আছে—দরজির বাড়ি ছাড়া।

সতীশ। আমার হৃদয়টার খবর যদি রাখতে তবে এমন কথা আর বলতে না, নেলি।

নলিনী। (করতালি দিয়া) বাহবা। মিস্টার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিষ্ট কথার আমদানি এখনই শুরু হয়েছে। প্রশ্রয় পেলে অত্যন্ত উন্নতি হবে ভরসা হচ্ছে। এসো, একটু কেক খেয়ে যাবে, মিষ্ট কথার পুরস্কার মিষ্টান্ন।

সতীশ। না, আজ আর খাব না, আমার শরীরটা—

নলিনী। সতীশ, আমার কথা শোনো—টেনিস কোর্তার খেদে শরীর নষ্ট কোরো না, খাওয়াদাওয়া একেবারে ছাড়া ভালো নয়। কোর্তা জিনিসটা জগতের মধ্যে সেরা জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু এই তুচ্ছ শরীরটা না হলে সেটা ঝুলিয়ে বেড়াবার সুবিধা হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শশধর। দেখো মন্মথ, সতীশের উপরে তুমি বড়ো কড়া ব্যবহার আরম্ভ করেছ; এখন বয়েস হয়েছে, এখন ওর প্রতি অতটা শাসন ভালো নয়।

বিধু। বলো তো, রায়মশায়। আমি তো ওঁকে কিছুতেই বুঝিয়ে পারলেম না।

মন্মথ। দুটো অপবাদ এক মুহূর্তেই! একজন বললেন নির্দয়, আর-একজন বললেন নির্বোধ। যাঁর কাছে হতবুদ্ধি হয়ে আছি তিনি যা বলেন সহ্য করতে রাজি আছি—তাঁর ভগ্নী যা বলবেন তার উপরেও কথা কব না, কিন্তু তাই ব'লে তাঁর ভগ্নীপতি পর্যন্ত সহিষ্ণুতা চলবে না। আমার ব্যবহারটা কী রকম কড়া শুনি।

শশধর। বেচারা সতীশের একটু কাপড়ের শখ আছে, ও পাঁচ জায়গায় মিশতে আরম্ভ করেছে, ওকে তুমি চাঁদনির—

মন্মথ। আমি তো চাঁদনির কাপড় পরতে বলি নে। ফিরিঙ্গি পোশাক আমার দু চক্ষের বিষ। ধুতি-চাদর চাপকান-চোগা পরুক, কখনো লজ্জা পেতে হবে না।

শশধর। দেখো মন্মথ, সতীশ যদি এ-বয়সে শখ মিটিয়ে না নিতে পারে তবে বুড়োবয়সে খামকা কী করে বসবে, সে আরও বদ দেখতে হবে। আর ভেবে দেখো, যেটাকে আমরা শিশুকাল হতেই সভ্যতা বলে শিখছি তার আক্রমণ ঠেকাবে কী করে।

মন্মথ। যিনি সভ্য হবেন তিনি সভ্যতার মালমসলা নিজের খরচেই জোগাবেন। যে-দিক হতে তোমার সভ্যতা আসছে টাকাটা সেদিক হতে আসছে না, বরং এখান হতে সেই দিকেই যাচ্ছে।

বিধু। রায়মশায়, পেরে উঠবেন না—দেশের কথা উঠে পড়লে ওঁকে থামানো যায় না।

শশধর। ভাই মন্মথ, ও-সব কথা আমিও বুঝি। কিন্তু, ছেলেদের আবদারও তো এড়াতে পারি নে। সতীশ ভাদুড়িসাহেবের সঙ্গে যখন মেশামেশি করছে তখন উপযুক্ত কাপড় না থাকলে ও-বেচারার বড়ো মুশকিল। আমি র‍্যাঙ্কিনের বাড়িতে

ওর জন্য—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। সাহেব-বাড়ি হতে এই কাপড় এয়েছে।

মন্মথ। নিয়ে যা কাপড়, নিয়ে যা। এখনি নিয়ে যা।

বিধুর প্রতি

দেখো, সতীশকে যদি আমি এ কাপড় পরতে দেখি তবে তাকে বাড়িতে থাকতে দেব না, মেসে পাঠিয়ে দেব, সেখানে সে আপন ইচ্ছামতো চলতে পারবে।

দ্রুত প্রস্থান

শশধর। অবাক কাণ্ড!

বিধু। (সরোদনে) রায়মশায়, তোমাকে কী বলব, আমার বেঁচে সুখ নেই। নিজের ছেলের উপর বাপের এমন ব্যবহার কেউ কোথাও দেখেছে?

শশধর। আমার প্রতি ব্যবহারটাও তো ঠিক ভালো হল না। বোধ হয় মন্মথর হজমের গোল হয়েছে। আমার পরামর্শ শোনো, তুমি ওকে রোজ সেই একই ডালভাত খাইয়ো না। ও যতই বলুক-না কেন, মাঝে মাঝে মসলাওয়ালা রান্না না হলে মুখে রোচে না, হজমও হয় না। কিছুদিন ওকে ভালো করে খাওয়াও দেখি, তার পরে তুমি যা বলবে ও তাই শুনবে। এ-সম্বন্ধে তোমার দিদি তোমার চেয়ে ভালো বোঝেন।

শশধরের প্রস্থান। বিধুমুখীর ক্রন্দন

বিধবা জা। (ঘরে প্রবেশ করিয়া, আত্মগত) কখনো কান্না, কখনো হাসি— কতরকম যে সোহাগ তার ঠিক নেই— বেশ আছে।

দীর্ঘনিশ্বাস

ও মেজবউ, গোসাঘরে বসেছিস! ঠাকুরপোকে ডেকে দিই, মানভঞ্জনের পালা হয়ে যাক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নলিনী। সতীশ, আমি তোমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছি বলি, রাগ কোরো না।

সতীশ। তুমি ডেকেছ ব'লে রাগ করব আমার মেজাজ কি এতই বদ।

নলিনী। না, ও-সব কথা থাক্। সকল সময়েই নন্দীসাহেবের চেলাগিরি কোরো না। বলো দেখি আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে অমন দামি জিনিস কেন দিলে।

সতীশ। যাকে দিয়েছি তাঁর তুলনায় জিনিসটার দাম এমনই কি বেশি।

নলিনী। আবার ফের নন্দীর নকল!

সতীশ। নন্দীর নকল সাধে করি? তার প্রতি যখন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষপাত—

নলিনী। তবে যাও, তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কব না।

সতীশ। আচ্ছা, মাপ করো, আমি চুপ করে শুনব।

নলিনী। দেখো সতীশ, মিস্টার নন্দী আমাকে নির্বোধের মতো একটা দামি ব্রেসলেট পাঠিয়েছিলেন, তুমি অমনি নির্বুদ্ধিতার সুর চড়িয়ে তার চেয়ে দামি একটা নেকলেস পাঠাতে গেলে কেন।

সতীশ। যে-অবস্থায় লোকের বিবেচনাশক্তি থাকে না সে-অবস্থাটা তোমার জানা

নেই ব'লে তুমি রাগ করছ, নেলি।

নলিনী। আমার সাত জন্মে জেনে কাজ নেই। কিন্তু, এ নেকলেস তোমাকে ফিরে নিয়ে যেতে হবে।

সতীশ। ফিরে দেবে?

নলিনী। দেব। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে যে-দান, আমার কাছে সে-দানের কোনো মূল্য নেই।

সতীশ। তুমি অন্যায় বলছ, নেলি।

নলিনী। আমি কিছুই অন্যায় বলছি নে— তুমি যদি আমাকে একটি ফুল দিতে আমি ঢের বেশি খুশি হতেম। তুমি যখন-তখন প্রায়ই মাঝে-মাঝে আমাকে কিছু-না-কিছু দামি জিনিস পাঠাতে আরম্ভ করেছ। পাছে তোমার মনে লাগে ব'লে আমি এতদিন কিছুই বলি নি। কিন্তু, ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চলেছে, আর আমার চুপ করে থাকা উচিত নয়। এই নাও তোমার নেকলেস।

সতীশ। এ নেকলেস তুমি রাস্তায় টান মেরে ফেলে দাও, কিন্তু আমি এ কিছুতেই নেব না।

নলিনী। আচ্ছা সতীশ, আমি তো তোমাকে ছেলেবেলা হতেই জানি, আমার কাছে ভাঁড়িয়ো না। সত্য করে বলো, তোমার কি অনেক টাকা ধার হয় নি।

সতীশ। কে তোমাকে বলেছে। নরেন বুঝি?

নলিনী। কেউ বলে নি। আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারি। আমার জন্যে তুমি এমন অন্যায় কেন করছ।

সতীশ। সময়বিশেষে লোকবিশেষের জন্য মানুষ প্রাণ দিতে ইচ্ছা করে; আজকালকার দিনে প্রাণ দেবার অবকাশ খুঁজে পাওয়া যায় না— অন্তত ধার করবার দুঃখটুকু স্বীকার করবার যে সুখ তাও কি ভোগ করতে দেবে না। আমার পক্ষে যা দুঃসাধ্য আমি তোমার জন্য তাই করতে চাই, নেলি, একেও যদি তুমি নন্দীসাহেবের নকল বল তবে আমার পক্ষে মর্মান্তিক হয়।

নলিনী। আচ্ছা, তোমার যা করবার তা তো করেছ— তোমার সেই ত্যাগস্বীকারটুকু আমি নিলেম— এখন এ জিনিসটা ফিরে নাও।

সতীশ। ওটা যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয় তবে ঐ নেকলেসটা গলায় ফাঁস লাগিয়ে দম বন্ধ করে আমার পক্ষে মরা ভালো।

নলিনী। দেনা তুমি শোধ করবে কী করে।

সতীশ। মার কাছ হতে টাকা পাব।

নলিনী। ছি ছি, তিনি মনে করবেন, আমার জন্যই তাঁর ছেলের দেনা হচ্ছে।

সতীশ। সে-কথা তিনি কখনোই মনে করবেন না, তাঁর ছেলেকে তিনি অনেকদিন হতে জানেন।

নলিনী। আচ্ছা, সে যাই হোক, তুমি প্রতিজ্ঞা করো, এখন হতে তুমি আমাকে দামি জিনিস দেবে না। বড়োজোর ফুলের তোড়ার বেশি আর কিছু দিতে পারবে না।

সতীশ। আচ্ছা, সেই প্রতিজ্ঞাই করলেম।

নলিনী। যাক, এখন তবে তোমার গুরু নন্দীসাহেবের পাঠ আবৃত্তি করো। দেখি, স্তুতিবাদ করবার বিদ্যা তোমার কতদূর অগ্রসর হল। আচ্ছা, আমার কানের ডগা

সম্বন্ধে কী বলতে পার বলো— আমি তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলেম।

সতীশ। যা বলব তাতে ঐ ডগাটুকু লাল হয়ে উঠবে।

নলিনী। বেশ বেশ, ভূমিকাটা মন্দ হয় নি। আজকের মতো এইটুকু থাক্, বাকি-টুকু আর-একদিন হবে। এখনই কান ঝাঁ ঝাঁ করতে শুরু হয়েছে।

নবম পরিচ্ছেদ

বিধু। আমার উপর রাগ কর যা কর, ছেলের উপর কোরো না। তোমার পায়ে ধরি, এবারকার মতো তার দেনাটা শোধ করে দাও।

মন্মথ। আমি রাগারাগি করছি নে, আমার যা কর্তব্য তা আমাকে করতেই হবে। আমি সতীশকে বার বার বলেছি, দেনা করলে শোধবার ভার আমি নেব না। আমার সে কথার অন্যথা হবে না।

বিধু। ওগো, এতবড়ো সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির হলে সংসার চলে না। সতীশের এখন বয়স হয়েছে, তাকে জলপানি যা দাও তাতে ধার না ক'রে তার চলে কী করে বলো দেখি।

মন্মথ। যার যেরূপ সাধ্য তার চেয়ে চাল বড়ো করলে কারোই চলে না— ফকিরেরও না, বাদশারও না।

বিধু। তবে কি ছেলেকে জেলে যেতে হবে।

মন্মথ। সে যদি যাবার আয়োজন করে এবং তোমরা যদি তার জোগাড় দাও, তবে আমি ঠেকিয়ে রাখব কী করে।

মন্মথর প্রস্থান। শশধরের প্রবেশ

শশধর। আমাকে এ বাড়িতে দেখলে মন্মথ ভয় পায়। ভাবে, কালো কোর্তা ফরমাশ দেবার জন্য ফিতা হাতে তার ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেছি। তাই কদিন আসি নি। আজ তোমার চিঠি পেয়ে সুকু কান্নাকাটি করে আমাকে বাড়িছাড়া করেছে।

বিধু। দিদি আসেন নি?

শশধর। তিনি এখনি আসবেন। ব্যাপারটা কী।

বিধু। সবই তো শুনেছ। এখন ছেলেটাকে জেলে না দিলে ওঁর মন সুস্থির হচ্ছে না। র‍্যাঙ্কিন-হার্মানের পোশাক তাঁর পছন্দ হল না, জেলখানার কাপড়টাই বোধ হয় তাঁর মতে বেশ সুসভ্য।

শশধর। আর যাই বল, মন্মথকে বোঝাতে যেতে আমি পারব না। তার কথা আমি বুঝি নে, আমার কথাও সে বোঝে না, শেষকালে—

বিধু। সে কি আমি জানি নে। তোমরা তো তাঁর স্ত্রী নও যে মাথা হেঁট করে সমস্তই সহ্য করবে। কিন্তু, এখন এ বিপদ ঠেকাই কী করে।

শশধর। তোমার হাতে কিছু কি—

বিধু। কিছুই নেই— সতীশের ধার শুধতে আমার প্রায় সমস্ত গহনাই বাঁধা পড়েছে, হাতে কেবল বালাজোড়া আছে।

সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ, খরচপত্র বিবেচনা করে কর না, এখন কী মুশকিলে পড়েছ

দেখো দেখি।

সতীশ। মুশকিল তো কিছুই দেখি নে।

শশধর। তবে হাতে কিছু আছে বুঝি! ফাঁস কর নি।

সতীশ। কিছু তো আছেই।

শশধর। কত?

সতীশ। আফিম কেনবার মতো।

বিধু। (কাঁদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কী কথা তুই বলিস, আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, আমাকে আর দগ্ধাস নে।

শশধর। ছি ছি, সতীশ। এমন কথা যদিবা কখনো মনেও আসে তবু কি মার সামনে উচ্চারণ করা যায়। বড়ো অন্যায় কথা।

সুকুমারীর প্রবেশ

বিধু। দিদি, সতীশকে রক্ষা করো। ও কোন্‌দিন কী করে বসে আমি তো ভয়ে বাঁচি নে। ও যা বলে শুনে আমার গা কাঁপে।

সুকুমারী। ও আবার কী বলে।

বিধু। বলে কিনা আফিম কিনে আনবে।

সুকুমারী। কী সর্বনাশ। সতীশ, আমার গা ছুঁয়ে বল্‌, এমন কথা মনেও আনবি নে। চুপ করে রইলি যে? লক্ষ্মী বাপ আমার! তোর মা-মাসীর কথা মনে করিস।

সতীশ। জেলে বসে মনে করার চেয়ে এ-সমস্ত হাস্যকর ব্যাপার জেলের বাইরে চুকিয়ে ফেলাই ভালো।

সুকুমারী। আমরা থাকতে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে।

সতীশ। পেয়াদা।

সুকুমারী। আচ্ছা, সে দেখব কতবড়ো পেয়াদা; ওগো, এই টাকাটা ফেলে দাও-না, ছেলেমানুষকে কেন কষ্ট দেওয়া।

শশধর। টাকা ফেলে দিতে পারি, কিন্তু মন্মথ আমার মাথায় ইঁট ফেলে না মারে।

সতীশ। মেসোমশায়, সে ইঁট তোমার মাথায় পৌঁছবে না, আমার ঘাড়ে পড়বে। একে এক্‌জামিনে ফেল করেছি, তার উপরে দেনা, এর উপরে জেলে যাবার এতবড়ো সুযোগটা যদি মাটি হয়ে যায় তবে বাবা আমার সে অপরাধ মাপ করবেন না।

বিধু। সত্যি, দিদি। সতীশ মেসোর টাকা নিয়েছে শুনলে তিনি বোধ হয় ওকে বাড়ি হতে বার করে দেবেন।

সুকুমারী। তা দিন-না। আর কি কোথাও বাড়ি নেই নাকি। ও বিধু, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে-না। আমার তো ছেলেপুলে নেই, আমি নাহয় ওকেই মানুষ করি। কী বল গো।

শশধর। সে তো ভালোই। কিন্তু, সতীশ যে বাঘের বাচ্ছা, ওকে টানতে গেলে তার মুখ থেকে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

সুকুমারী। বাঘমশায় তো বাচ্ছাটিকে জেলের পেয়াদার হাতেই সমর্পণ করে দিয়েছেন, আমরা যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাই এখন তিনি কোনো কথা বলতে পারবেন না।

শশধর। বাঘিনী কী বলেন, বাচ্ছাই বা কী বলে।

সুকুমারী। যা বলে সে আমি জানি, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তুমি এখন দেনাটা শোধ করে দাও।

বিধু। দিদি!

সুকুমারী। আর দিদি-দিদি করে কাঁদতে হবে না। চল্‌, তোর চুল বেঁধে দিই গে। এমন ছিরি করে তোর ভগ্নীপতির সামনে বার হতে লজ্জা করে না?

শশধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান। মন্মথের প্রবেশ

শশধর। মন্মথ, ভাই, তুমি একটু বিবেচনা করে দেখো—

মন্মথ। বিবেচনা না করে তো আমি কিছুই করি না।

শশধর। তবে দোহাই তোমার, বিবেচনা একটু খাটো করো। ছেলেটাকে কি জেলে দেবে। তাতে কি ওর ভালো হবে।

মন্মথ। ভালোমন্দর কথা কেউই শেষ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারে না। আমি মোটামুটি এই বুঝি যে, বার বার সাবধান ক'রে দেওয়ার পরও যদি কেউ অন্যায় করে তবে তার ফলভোগ হতে তাকে কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা কারও উচিত হয় না। আমরা যদি মাঝে প'ড়ে ব্যর্থ করে না দিতেম তবে প্রকৃতির কঠিন শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে পারত।

শশধর। প্রকৃতির কঠোর শিক্ষাই যদি একমাত্র শিক্ষা হত তবে বিধাতা বাপমায়ের মনে স্নেহটুকু দিতেন না। মন্মথ, তুমি যে দিনরাত কর্মফল-কর্মফল কর আমি তা সম্পূর্ণ মানি না। প্রকৃতি আমাদের কাছ হতে কর্মফল কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিতে চায় কিন্তু প্রকৃতির উপরে যিনি কর্তা আছেন তিনি মাঝে পড়ে তার অনেকটাই মহকুপ দিয়ে থাকেন, নইলে কর্মফলের দেনা শুধতে শুধতে আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিকিয়ে যেত। বিজ্ঞানের হিসাবে কর্মফল সত্য, কিন্তু বিজ্ঞানের উপরেও বিজ্ঞান আছে, সেখানে প্রেমের হিসাবে ফলাফল সমস্ত অন্যরকম। কর্মফল নৈসর্গিক, মার্জনাটা তার উপরের কথা।

মন্মথ। যিনি অনৈসর্গিক মানুষ তিনি যা-খুশি করবেন; আমি অতি সামান্য নৈসর্গিক, আমি কর্মফল শেষ পর্যন্তই মানি।

শশধর। আচ্ছা, আমি যদি সতীশের দেনা শোধ করে তাকে খালাস করি, তুমি কী করবে।

মন্মথ। আমি তাকে ত্যাগ করব। দেখো, সতীশকে আমি যে ভাবে মানুষ করতে চেয়েছিলেম প্রথম হতেই বাধা দিয়ে তোমরা তা ব্যর্থ করেছ। এক দিক হতে সংযম আর-এক দিক হতে প্রশ্রয় পেয়ে সে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ক্রমাগতই ভিক্ষা পেয়ে যদি তার সম্মানবোধ এবং দায়িত্ববোধ চলে যায়, যে কাজের যে পরিণাম তোমরা যদি মাঝে পড়ে কিছুতেই তাকে তা বুঝতে না দাও, তবে তার আশা আমি ত্যাগ করলেম। তোমাদের মতেই তাকে মানুষ করো—দুই নৌকায় পা দিয়েই তার বিপদ ঘটেছে।

শশধর। ও কী কথা বলছ, মন্মথ—তোমার ছেলে—

মন্মথ। দেখো শশধর, নিজের প্রকৃতি ও বিশ্বাস-মতেই নিজের ছেলেকে আমি মানুষ করতে পারি, অন্য কোনো উপায় তো জানি না। যখন নিশ্চয় দেখছি, তা কোনোমতেই হবার নয়, তখন পিতার দায়িত্ব আমি আর রাখব না। আমার যা সাধ্য

তার বেশি আমি করতে পারব না।

মন্মথর প্রস্থান

শশধর। কী করা যায়। ছেলেটাকে তো জেলে দেওয়া যায় না! অপরাধ মানুষের পক্ষে যত সর্বনেশেই হোক, জেলখানা তার চেয়ে ঢের বেশি।

দশম পরিচ্ছেদ

ভাদুড়িজায়া। শুনেছ? সতীশের বাপ হঠাৎ মারা গেছে।

মিস্টার ভাদুড়ি। হাঁ, সে তো শুনেছি।

জায়া। সে-যে সমস্ত সম্পত্তি হাসপাতালে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশের মার জন্য জীবিতকাল পর্যন্ত ৭৫ টাকা মাসহারা বরাদ্দ করে গেছে। এখন কী করা যায়।

ভাদুড়ি। এত ভাবনা কেন তোমার।

জায়া। বেশ লোক যা হোক তুমি! তোমার মেয়ে যে সতীশকে ভালোবাসে, সেটা বুঝি তুমি দুই চক্ষু মেলে দেখতে পাও না? তুমি তো ওদের বিবাহ দিতেও প্রস্তুত ছিলে। এখন উপায় কী করবে।

ভাদুড়ি। আমি তো মন্মথর টাকার উপর বিশেষ নির্ভর করি নি।

জায়া। তবে কি ছেলেটির চেহারার উপরেই নির্ভর করে বসে ছিলে। অন্নবস্ত্রটা বুঝি অনাবশ্যক?

ভাদুড়ি। সম্পূর্ণ আবশ্যক, যিনি যাই বলুন, ওর চেয়ে আবশ্যক আর-কিছুই নেই। সতীশের একটি মেসো আছে, বোধহয় জান।

জায়া। মেসো তো ঢের লোকেরই থাকে, তাতে ক্ষুধাশান্তি হয় না।

ভাদুড়ি। এই মেসোটি আমার মক্কেল— অগাধ টাকা— ছেলেপুলে কিছুই নেই— বয়সও নিতান্ত অল্প নয়। সে তো সতীশকেই পোষ্যপুত্র নিতে চায়।

জায়া। মেসোটি তো ভালো। তা চট্‌পট্ নিক-না। তুমি একটু তাড়া দাও-না।

ভাদুড়ি। তাড়া আমাকে দিতে হবে না, তার ঘরের মধ্যেই তাড়া দেবার লোক আছে। সবই প্রায় ঠিকঠাক, এখন কেবল একটা আইনের খটকা উঠেছে— এক ছেলেকে পোষ্যপুত্র লওয়া যায় কি না— তা ছাড়া সতীশের আবার বয়স হয়ে গেছে।

জায়া। আইন তো তোমাদেরই হাতে— তোমরা চোখ বুজে একটা বিধান দিয়ে দাও-না।

ভাদুড়ি। ব্যস্ত হোয়ো না— পোষ্যপুত্র না নিলেও অন্য উপায় আছে।

জায়া। আমাকে বাঁচালে। আমি ভাবছিলেম, সম্বন্ধ ভাঙি কী করে। আবার, আমাদের নেলি যেরকম জেদালো মেয়ে সে যে কী করে বসত বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে গরিবের হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না। ঐ দেখো, তোমার মেয়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। কাল যখন খেতে বসেছিল এমন সময় সতীশের বাপ-মরার খবর পেল, অমনি তখনি উঠে চলে গেল।

ভাদুড়ি। কিন্তু, নেলি যে সতীশকে ভালোবাসে সে তো দেখে মনে হয় না। ও তো সতীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে। আমি আরও মনে করতাম, নন্দীর উপরেই ওর বেশি টান।

জায়া। তোমার মেয়েটির ঐ স্বভাব—সে যাকে ভালোবাসে তাকেই জ্বালাতন করে। দেখো-না, বিড়ালছানাটাকে নিয়ে কী কাণ্ডটাই করে! কিন্তু, আশ্চর্য এই, তবু তো ওকে কেউ ছাড়তে চায় না।

নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। মা, একবার সতীশবাবুর বাড়ি যাবে না? তাঁর মা বোধহয় খুব কাতর হয়ে পড়েছেন।—বাবা, আমি একবার তাঁর কাছে যেতে চাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। মা, এখানে আমি যে কত সুখে আছি সে তো আমার কাপড়-চোপড় দেখেই বুঝতে পার। কিন্তু, মেসোমশায় যতক্ষণ না আমাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে। তুমি যে মাসহারা পাও আমার তো তাতে কোনো সাহায্য হবে না। অনেক দিন হতে নেব-নেব করেও আমাকে পোষ্যপুত্র নিচ্ছেন না—বোধহয় ওঁদের মনে মনে সন্তানলাভের আশা এখনো আছে।

বিধু। (হতাশভাবে) সে আশা সফল হয় বা, সতীশ।

সতীশ। অ্যাঁ! বলো কী মা!

বিধু। লক্ষণ দেখে তো তাই বোধ হয়।

সতীশ। লক্ষণ অমন অনেকসময় ভুলও তো হয়।

বিধু। না, ভুল নয় সতীশ, এবার তোর ভাই হবে।

সতীশ। কী যে বল মা, তার ঠিক নেই—ভাই হবেই কে বললে! বোন হতে পারে না বুঝি!

বিধু। দিদির চেহারা যেরকম হয়ে গেছে নিশ্চয় তাঁর মেয়ে হবে না, ছেলেই হবে। তা ছাড়া ছেলেই হোক, মেয়েই হোক, আমাদের পক্ষে সমানই।

সতীশ। এত বয়সের প্রথম ছেলে, ইতিমধ্যে অনেক বিঘ্ন ঘটতে পারে।

বিধু। সতীশ, তুই চাকরির চেষ্টা কর্।

সতীশ। অসম্ভব। পাস করতে পারি নি। তা ছাড়া চাকরি করবার অভ্যাস আমার একেবারে গেছে। কিন্তু, যাই বল মা, এ ভারি অন্যায়। আমি তো এতদিনে বাবার সম্পত্তি পেতেম, তার থেকে বঞ্চিত হলেম, তার পরে যদি আবার—

বিধু। অন্যায় নয় তো কী, সতীশ। এ দিকে তোকে ঘরে এনেছেন, ও দিকে আবার ডাক্তার ডাকিয়ে ওষুধও খাওয়া চলছে। নিজের বোনপোর সঙ্গে এ কী রকম ব্যবহার। শেষকালে দয়াল ডাক্তারের ওষুধ তো খেটে গেল। অস্থির হোস নে, সতীশ। একমনে ভগবানকে ডাক্; তাঁর কাছে কোনো ডাক্তারই লাগে না। তিনি যদি—

সতীশ। আহা, তিনি যদি এখনো—এখনো সময় আছে। মা, এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কিন্তু যেরকম অন্যায় হল সে ভাব রক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরের কাছে এঁদের একটা দুর্ঘটনা না প্রার্থনা করে থাকতে পারছি নে—তিনি দয়া করে যেন—

বিধু। আহা তাই হোক, নইলে তোর উপায় কী হবে সতীশ, আমি তাই ভাবি। হে ভগবান, তুমি যেন—

সতীশ। এ যদি না হয় তবে ঈশ্বরকে আমি আর মানব না। কাগজে নাস্তিকতা প্রচার করব।

বিধু। আরে চুপ চুপ, এখন এমন কথা মুখে আনতে নেই। তিনি দয়াময়, তাঁর দয়া হলে কী না ঘটতে পারে। সতীশ, তুই আজ এত ফিট্‌ফাট সাজ করে কোথায় চলেছিস। উঁচু কলার প'রে মাথা যে আকাশে গিয়ে ঠেকল! ঘাড় হেঁট করবি কী করে।

সতীশ। এমনি করে কলারের জোরে যতদিন মাথা তুলে চলতে পারি চলব, তার পরে ঘাড় হেঁট করবার দিন যখন আসবে তখন এগুলো ফেলে দিলেই চলবে। বিশেষ কাজ আছে মা, চললেম; কথাবার্তা পরে হবে।

প্রস্থান

বিধু। কাজ কোথায় আছে তা জানি। মা গো, ছেলের আর তর সয় না। এ বিবাহটা ঘটবেই। আমি জানি, আমার সতীশের অদৃষ্ট খারাপ নয়; প্রথমে বিঘ্ন যতই ঘটুক শেষকালটায় ওর ভালো হয়ই, এ আমি বরাবর দেখে আসছি। না হবেই বা কেন। আমি তো জ্ঞাতসারে কোনো পাপ করি নি—আমি তো সতী স্ত্রী ছিলাম, সেইজন্যে আমার খুব বিশ্বাস হচ্ছে, দিদির এবারে—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সুকুমারী। সতীশ!

সতীশ। কী, মাসিমা।

সুকুমারী। কাল যে তোমাকে খোকার কাপড় কিনে আনবার জন্য এত করে বললেম, অপমান বোধ হল বুঝি?

সতীশ। অপমান কিসের, মাসিমা। কাল ভাদুড়িসাহেবের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল তাই—

সুকুমারী। ভাদুড়িসাহেবের ওখানে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কী, তা তো ভেবে পাই নে। তারা সাহেবমানুষ, তোমার মতো অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সাজে। আমি তো শুনলেম, তোমাকে তারা আজকাল পোঁছে না, তবু বুঝি ঐ রঙিন টাইয়ের উপর টাইরিং প'রে বিলাতি কার্তিক সেজে তাদের ওখানে আনাগোনা করতেই হবে? তোমার কি একটুও সম্মানবোধ নেই। তাই যদি থাকবে তবে কি কাজকর্মের কোনো চেষ্টা না করে এখানে এমন করে পড়ে থাকতে। তার উপরে আবার একটা কাজ করতে বললে মনে মনে রাগ করা হয়, পাছে ওঁকে কেউ বাড়ির সরকার মনে ক'রে ভুল করে; কিন্তু, সরকারও তো ভালো—সে খেটে উপার্জন করে খায়।

সতীশ। মাসিমা, আমিও হয়তো তা পারতেম, কিন্তু তুমিই তো—

সুকুমারী। তাই বটে। জানি, শেষকালে আমারই দোষ হবে। এখন বুঝছি, তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিনতেন। তাই তোমাকে এমন করে শাসনে রেখেছিলেন। আমি আরও ছেলেমানুষ বলে দয়া করে তোমাকে ঘরে স্থান দিলেম, জেল থেকে বাঁচালেম, শেষকালে আমারই দোষ হল। একেই বলে কৃতজ্ঞতা! আচ্ছা, আমারই নাহয়

দোষ হল, তবু যে কদিন এখানে আমাদের অন্ন খাচ্ছ দরকার-মতো দুটো কাজই নাহয় করে দিলে। এমন কি কেউ করে না। এতে কি অত্যন্ত অপমান বোধ হয়।

সতীশ। কিছু না, কিছু না, কী করতে হবে বলো, আমি এখনি করছি।

সুকুমারী। খোকার জন্য সাড়ে সাত গজ রেন্‌বো সিল্ক চাই— আর একটা সেলার সুট—

সতীশের প্রস্থানোদ্যম

শোনো, শোনো, ওর মাপটা নিয়ে যেয়ো, জুতো চাই।

সতীশ প্রস্থানোন্মুখ

অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন— সবগুলো ভালো করে শুনেই যাও। আজও বুঝি ভাদুড়ি-সাহেবের রুটি বিস্কুট খেতে যাবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করছে। খোকার জন্যে স্ট্র-হ্যাট এনো— আর তার রুমালও এক ডজন চাই।

সতীশের প্রস্থান। তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া

শোনো সতীশ, আর-একটা কথা আছে। শুনলাম, তোমার মেসোর কাছ হতে তুমি নূতন সুট কেনবার জন্য আমাকে না বলে টাকা চেয়ে নিয়েছ। যখন নিজের সামর্থ্য হবে তখন যত খুশি সাহেবিয়ানা কোরো, কিন্তু পরের পয়সায় ভাদুড়ি-সাহেবদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর করে দিয়ো না। সে টাকাটা আমাকে ফেরত দিয়ো। আজকাল আমাদের বড়ো টানাটানির সময়।

সতীশ। আচ্ছা, এনে দিচ্ছি।

সুকুমারী। এখন তুমি দোকানে যাও, সেই টাকা দিয়ে কিনে বাকিটা ফেরত দিয়ো। একটা হিসাব রাখতে ভুলো না যেন।

সতীশের প্রস্থানোদ্যম

শোনো সতীশ— এই কটা জিনিস কিনতে আবার যেন আড়াই টাকা গাড়িভাড়া লাগিয়ে বোসো না। ঐজন্যে তোমাকে কিছু আনতে বলতে ভয় করে। দু পা হেঁটে চলতে হলেই অমনি তোমার মাথায় মাথায় ভাবনা পড়ে— পুরুষমানুষ এত বাবু হলে তো চলে না। তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হেঁটে গিয়ে নতুন বাজার হতে কই মাছ কিনে আনতেন— মনে আছে তো? মুটেকেও তিনি এক পয়সা দেন নি।

সতীশ। তোমার উপদেশ মনে থাকবে— আমিও দেব না। আজ হতে তোমার এখানে মুটেভাড়া, বেহারার মাইনে, যত অল্প লাগে সে দিকে আমার সর্বদাই দৃষ্টি থাকবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হরেন। দাদা, তুমি অনেকক্ষণ ধরে ও কী লিখছ, কাকে লিখছ বলো-না।

সতীশ। যা যা, তোর সে খবরে কাজ কী, তুই খেলা কর্‌ গে যা।

হরেন। দেখি-না কী লিখছ— আমি আজকাল পড়তে পারি।

সতীশ। হরেন, তুই আমাকে বিরক্ত করিস নে বলছি— যা তুই।

হরেন। ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা, সয়ে আকার সা, ভালোবাসা। দাদা, কী ভালোবাসার কথা লিখছ বলো-না। তুমি কাঁচা পেয়ারা ভালোবাস বুঝি?

আমিও বাসি।

সতীশ। আঃ হরেন, অত চেঁচাস নে, ভালোবাসার কথা আমি লিখি নি।

হরেন। অ্যাঁ! মিথ্যা কথা বলছ! আমি যে পড়লেম ভয়ে আকার, ভা, ল, বয়ে আকার সয়ে আকার ভালোবাসা। আচ্ছা, মাকে ডাকি, তাঁকে দেখাও।

সতীশ। না না, মাকে ডাকতে হবে না। লক্ষ্মীটি, তুই একটু খেলা করতে যা। আমি এইটে শেষ করি।

হরেন। এটা কী, দাদা। এ যে ফুলের তোড়া। আমি নেব।

সতীশ। ওতে হাত দিস নে, হাত দিস নে, ছিঁড়ে ফেলবি।

হরেন। না, আমি ছিঁড়ে ফেলব না, আমাকে দাও-না।

সতীশ। খোকা, কাল তোকে আমি অনেক তোড়া এনে দেব, এটা থাক্।

হরেন। দাদা, এটা বেশ, আমি এইটেই নেব।

সতীশ। না, এ আর-একজনের জিনিস, আমি তোকে দিতে পারব না।

হরেন। হ্যাঁ, মিথ্যে কথা! আমি তোমাকে লজঞ্জুস আনতে বলেছিলেম, তুমি সেই টাকায় তোড়া কিনে এনেছ—তাই বইকি, আর-একজনের জিনিস বইকি।

সতীশ। হরেন, লক্ষ্মী ভাই, তুই একটুখানি চুপ কর্, চিঠিখানা শেষ করে ফেলি। কাল তোকে আমি অনেক লজঞ্জুস কিনে এনে দেব।

হরেন। আচ্ছা, তুমি কী লিখছ আমাকে দেখাও।

সতীশ। আচ্ছা দেখাব, আগে লেখাটা শেষ করি।

হরেন। তবে আমিও লিখি।

স্লেট লইয়া চীৎকারস্বরে

ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা, সয়ে আকার সা, ভালোবাসা।

সতীশ। চুপ চুপ, অত চীৎকার করিস নে। আঃ, থাম্ থাম্।

হরেন। তবে আমাকে তোড়াটা দাও।

সতীশ। আচ্ছা নে, কিন্তু খবরদার ছিঁড়িস নে—ও কী করলি! যা বারণ করলেম তাই! ফুলটা ছিঁড়ে ফেললি! এমন বদ ছেলেও তো দেখি নি।

তোড়া কাড়িয়া লইয়া চপেটাঘাত করিয়া

লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! যা, এখান থেকে যা বলছি! যা!

হরেনের চীৎকারস্বরে ক্রন্দন, সতীশের সবেগে প্রস্থান

বিধুমুখীর ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ

বিধু। সতীশ বুঝি হরেনকে কাঁদিয়েছে, দিদি টের পেলে সর্বনাশ হবে। হরেন, বাপ আমার, কাঁদিস নে, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।

হরেন। (সরোদনে) দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধু। আচ্ছা আচ্ছা, চুপ কর্, চুপ কর্। আমি দাদাকে খুব করে মারব এখন।

হরেন। দাদা ফুলের তোড়া কেড়ে নিয়ে গেল।

বিধু। আচ্ছা, সে আমি তার কাছ থেকে নিয়ে আসছি।

হরেনের ক্রন্দন

এমন ছিচকাঁদুনে ছেলেও তো আমি কখনো দেখি নি। দিদি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্ছেন। যখন যেটি চায় তখনি সেটি তাকে দিতে হবে। দেখো-না, একবারে

দোকান ঝাঁটিয়ে কাপড়ই কেনা হচ্ছে। যেন নবাবপুত্র। ছি ছি, নিজের ছেলেকে কি এমনি করেই মাটি করতে হয়।

সতর্জনে

খোকা, চুপ কর্ বলছি। ঐ হামদোবুড়ো আসছে!

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। বিধু, ও কী ও। আমার ছেলেকে কি এমনি করেই ভূতের ভয় দেখাতে হয়। আমি চাকর-বাকরদের বারণ করে দিয়েছি, কেউ ওর কাছে ভূতের কথা বলতে সাহস করে না। আর, তুমি বুঝি মাসি হয়ে ওর এই উপকার করতে বসেছ! কেন বিধু, আমার বাছা তোমার কী অপরাধ করেছে। ওকে তুমি দুটি চক্ষে দেখতে পার না, তা আমি বেশ বুঝেছি। আমি বরাবর তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মতো মানুষ করলেম, আর তুমি বুঝি আজ তারই শোধ নিতে এসেছ!

বিধু। (সরোদনে) দিদি, এমন কথা বোলো না। আমার কাছে আমার সতীশ আর তোমার হরেনে প্রভেদ কী আছে।

হরেন। মা, দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধু। ছি ছি, খোকা, মিথ্যা বলতে নেই। দাদা তোর এখানে ছিলই না তা মারবে কী করে।

হরেন। বাঃ—দাদা যে এইখানে বসে চিঠি লিখছিল—তাতে ছিল ভয়ে আকার ভা. ল. ভাল, বয়ে আকার সয়ে আকার, ভালোবাসা। মা, তুমি আমার জন্যে দাদাকে লজঞ্জুস আনতে বলেছিলে, দাদা সেই টাকায় ফুলের তোড়া কিনে এনেছে—তাতেই আমি একটু হাত দিয়েছিলেম বলেই অমনি আমাকে মেরেছে।

সুকুমারী। তোমরা মায়ে পোয়ে মিলে আমার ছেলের সঙ্গে লেগেছ বুঝি? ওকে তোমাদের সহ্য হচ্ছে না। ও গেলেই তোমরা বাঁচ। আমি তাই বলি, খোকা রোজ ডাক্তার-ক'বরাজের বোতল-বোতল ওষুধ গিলছে, তবু দিন-দিন এমন রোগা হচ্ছে কেন। ব্যাপারখানা আজ বোঝা গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি, নেলি।

নলিনী। কেন, কোথায় যাবে।

সতীশ। জাহান্নমে।

নলিনী। সে জায়গায় যাবার জন্য কি বিদায় নেবার দরকার হয়। যে লোক সন্ধান জানে সে তো ঘরে বসেই সেখানে যেতে পারে। আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন। কলারটা বুঝি ঠিক হাল ফ্যাশানের হয় নি!

সতীশ। তুমি কি মনে কর আমি কেবল কলারের কথাই দিনরাত্রি চিন্তা করি।

নলিনী। তাই তো মনে হয়। সেইজন্যই তো হঠাৎ তোমাকে অত্যন্ত চিন্তশীলের মতো দেখায়।

সতীশ। ঠাট্টা কোরো না নেলি, তুমি যদি আজ আমার হৃদয়টা দেখতে পেতে—

নলিনী। তা হলে ডুমুরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পা'ও দেখতে পেতাম।

সতীশ। আবার ঠাট্টা! তুমি বড়ো নিষ্ঠুর। সত্যই বলছি নেলি, আজ বিদায় নিতে এসেছি।

নলিনী। দোকানে যেতে হবে?

সতীশ। মিনতি করছি নেলি, ঠাট্টা করে আমাকে দগ্ধ কোরো না। আজ আমি চিরদিনের মতো বিদায় নেব।

নলিনী। কেন, হঠাৎ সেজন্য তোমার এত বেশি আগ্রহ কেন।

সতীশ। সত্যকথা বলি, আমি যে কত দরিদ্র তা তুমি জান না।

নলিনী। সেজন্য তোমার ভয় কিসের। আমি তো তোমার কাছে টাকা ধার চাই নি।

সতীশ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল—

নলিনী। তাই পালাবে? বিবাহ না হতেই হৃৎকম্প!

সতীশ। আমার অবস্থা জানতে পেরে মিস্টার ভাদুড়ি আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

নলিনী। অমনি সেই অপমানেই কি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে হবে। এত বড়ো অভিমানী লোকের কারও সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখা শোভা পায় না। সাধে আমি তোমার মুখে ভালোবাসার কথা শুনলেই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দি।

সতীশ। নেলি, তবে কি এখনও আমাকে আশা রাখতে বল।

নলিনী। দোহাই সতীশ, অমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিয়ে বোলো না, আমার হাসি পায়। আমি তোমাকে আশা রাখতে বলব কেন। আশা যে রাখে সে নিজের গরজেই রাখে, লোকের পরামর্শ শুনে রাখে না।

সতীশ। সে তো ঠিক কথা। আমি জানতে চাই, তুমি দারিদ্র্যকে ঘৃণা কর কি না।

নলিনী। খুব করি, যদি সে দারিদ্র্য মিথ্যার দ্বারা নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করে।

সতীশ। নেলি, তুমি কি কখনো তোমার চিরকালের অভ্যস্ত আরাম ছেড়ে গরিবের ঘরের লক্ষ্মী হতে পারবে।

নলিনী। নভেলে যেরকম ব্যারামের কথা পড়া যায়, সেটা তেমন করে চেপে ধরলে আরাম আপনি ঘরছাড়া হয়।

সতীশ। সে ব্যারামের কোনো লক্ষণ কি তোমার—

নলিনী। সতীশ, তুমি কখনো কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারলে না। স্বয়ং নন্দীসাহেবও বোধ হয় অমন প্রশ্ন তুলতেন না। তোমাদের একচুলও প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

সতীশ। তোমাকে আমি আজও চিনতে পারলেম না, নেলি।

নলিনী। চিনবে কেমন করে। আমি তো তোমার হাল ফ্যাশানের টাই নই, কলার নই— দিনরাত যা নিয়ে ভাব তাই তুমি চেন।

সতীশ। আমি হাত জোড় করে বলছি নেলি, তুমি আজ আমাকে এমন কথা বোলো না। আমি যে কী নিয়ে ভাবি তা তুমি নিশ্চয় জান—

নলিনী। তোমার সম্বন্ধে আমার অন্তর্দৃষ্টি যে এত প্রখর তা এতটা নিঃসংশয়ে স্থির কোরো না। ঐ বাবা আসছেন। আমাকে এখানে দেখলে তিনি অনর্থক বিরক্ত হবেন, আমি যাই।

প্রস্থান

সতীশ। মিস্টার ভাদুড়ি, আমি বিদায় নিতে এসেছি।

ভাদুড়ি। আচ্ছা, তবে আজ—

সতীশ। যাবার আগে একটা কথা আছে।

ভাদুড়ি। কিন্তু সময় তো নেই, আমি এখন বেড়াতে বের হব।

সতীশ। কিছুক্ষণের জন্য কি সঙ্গে যেতে পারি।

ভাদুড়ি। তুমি যে পার তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি পারব না। সম্প্রতি আমি সংগীর অভাবে তত অধিক ব্যাকুল হয়ে পড়ি নি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শশধর। আঃ, কী বল। তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি।

সুকুমারী। আমি পাগল না তুমি চোখে দেখতে পাও না!

শশধর। কোনোটাই আশ্চর্য নয়, দুটোই সম্ভব। কিন্তু—

সুকুমারী। আমাদের হরেনের জন্ম হতেই দেখ নি ওদের মুখ কেমন হয়ে গেছে? সতীশের ভাবখানা দেখে বুঝতে পার না?

শশধর। আমার অত ভাব বুঝবার ক্ষমতা নেই. সে তো তুমি জানই। মন জিনিসটাকে অদৃশ্য পদার্থ বলেই শিশুকাল হতে আমার কেমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ঘটনা দেখলে তবু কতকটা বুঝতে পারি।

সুকুমারী। সতীশ যখনই আড়ালে পায় তোমার ছেলেকে মারে, আবার বিধুও তার পিছনে পিছনে এসে খোকাকে জুজুর ভয় দেখায়।

শশধর। ঐ দেখো. তোমরা ছোটো কথাকে বড়ো করে তোল। যদিই বা সতীশ খোকাকে কখনো—

সুকুমারী। সে তুমি সহ্য করতে পার, আমি পারব না—ছেলেকে তো তোমার গর্ভে ধরতে হয় নি।

শশধর। সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারব না। এখন তোমার অভিপ্রায় কী শুনি।

সুকুমারী। শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি তো বড়ো বড়ো কথা বল, একবার তুমি ভেবে দেখো-না আমরা হরেনকে যে ভাবে শিক্ষা দিতে চাই তার মাসি তাকে অন্যরূপ শেখায়—সতীশের দৃষ্টান্তটিই বা তার পক্ষে কিরূপ সেটাও তো ভেবে দেখতে হয়।

শশধর। তুমি যখন অত বেশি করে ভাবছ তখন তার উপরে আমার আর ভাববার দরকার কী আছে। এখন কর্তব্য কী বলো।

সুকুমারী। আমি বলি, সতীশকে তুমি বলো. তার মার কাছে থেকে সে এখন কাজকর্মের চেষ্টা দেখুক। পুরুষমানুষ পরের পয়সায় বাবুগিরি করে, সে কি ভালো দেখতে হয়।

শশধর। ওর মা যে টাকা পায় তাতে সতীশের চলবে কী করে।

সুকুমারী। কেন, ওদের বাড়িভাড়া লাগে না, মাসে পঁচাত্তর টাকা কম কী।

শশধর। সতীশের যেরূপ চাল দাঁড়িয়েছে, পঁচাত্তর টাকা তো সে চুরুটের ডগাতেই ফুঁকে দেবে। মার গহনাগাঁটি ছিল, সে তো অনেকদিন হল গেছে; এখন হবিষ্যান্ন

বাঁধা দিয়ে তো দেনা শোধ হবে না!

সুকুমারী। যার সামর্থ্য কম তার অত লম্বা চালেই বা দরকার কী।

শশধর। মন্মথ তো সেই কথাই বলত। আমরাই তো সতীশকে অন্যরূপ বুঝিয়েছিলেম। এখন ওকে দোষ দিই কী করে।

সুকুমারী। না—দোষ কি ওর হতে পারে। সব দোষ আমারই। তুমি তো আর কারও কোনো দোষ দেখতে পাও না—কেবল আমার বেলাতেই তোমার দর্শনশক্তি বেড়ে যায়।

শশধর। ওগো, রাগ কর কেন—আমিও তো দোষী।

সুকুমারী। তা হতে পারে। তোমার কথা তুমি জান। কিন্তু, আমি কখনো ওকে এমন কথা বলি নি যে, তুমি তোমার মেসোর ঘরে পায়ের উপর পা দিয়ে গোঁফে তা দাও, আর লম্বা কেদারায় বসে বসে আমার বাছার উপর বিষদৃষ্টি দিতে থাকো।

শশধর। না, ঠিক ঐ কথাগুলো তুমি তাকে মাথার দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নাও নি—অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারি নে। এখন কী করতে হবে বলো।

সুকুমারী। সে তুমি যা ভালো বোধ কর তাই করো। কিন্তু, আমি বলছি, সতীশ যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকবে, আমি খোকাকে কোনোমতে বাইরে যেতে দিতে পারব না। ডাক্তার খোকাকে হাওয়া খাওয়াতে বিশেষ করে বলে দিয়েছে—কিন্তু হাওয়া খেতে গিয়ে ও কখন একলা সতীশের নজরে পড়বে, সে কথা মনে করলে আমার মন স্থির থাকে না। ও তো আমারই আপন বোনের ছেলে, কিন্তু আমি ওকে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করি নে—এ আমি তোমাকে স্পষ্টই বললেম।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। কাকে বিশ্বাস কর না, মাসিমা। আমাকে? আমি তোমার খোকাকে সুযোগ পেলে গলা টিপে মারব, এই তোমার ভয়? যদি মারি, তবে তুমি তোমার বোনের ছেলের যে অনিষ্ট করেছ তার চেয়ে ওর কি বেশি অনিষ্ট করা হবে। কে আমাকে ছেলেবেলা হতে নবাবের মতো শৌখিন করে তুলেছে এবং আজ ভিক্ষুকের মতো পথে বের করলে। কে আমাকে পিতার শাসন হতে কেড়ে এনে বিশ্বের লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আনলে। কে আমাকে—

সুকুমারী। ওগো, শুনছ? তোমার সামনে আমাকে এমনি করে অপমান করে! নিজের মুখে বললে কিনা খোকাকে গলা টিপে মারবে! ওমা, কী হবে গো। আমি কালসাপকে নিজের হাতে দুধকলা দিয়ে পুষেছি।

সতীশ। দুধকলা আমারও ঘরে ছিল—সে দুধকলায় আমার রক্ত বিষ হয়ে উঠত না—তা হতে চিরকালের মতো বঞ্চিত করে তুমি যে দুধকলা আমাকে খাইয়েছ তাতে আমার বিষ জমে উঠেছে। সত্য কথাই বলছ, এখন আমাকে ভয় করাই চাই—এখন আমি দংশন করতে পারি।

বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধু। কী সতীশ, কী হয়েছে, তোকে দেখে যে ভয় হয়। অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন। আমাকে চিনতে পারছিস নে? আমি যে তোর মা, সতীশ!

সতীশ। মা, তোমাকে মা বলব কোন্ মুখে। মা হয়ে কেন তুমি আমার পিতার শাসন হতে আমাকে বঞ্চিত করলে। কেন তুমি আমাকে জেল হতে ফিরিয়ে আনলে।

সে কি মাসির ঘর হতে ভয়ানক। তোমরা ঈশ্বরকে মা বলে ডাক', তিনি যদি তোমাদের মতো মা হন তবে তাঁর আদর চাই নে, তিনি যেন আমাকে নরকে দেন।

শশধর। আঃ, সতীশ! চলো চলো— কী বকছ, থামো। এসো, বাইরে আমার ঘরে এসো।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শশধর। সতীশ, একটু ঠাণ্ডা হও। তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, সে কি আমি জানি নে। তোমার মাসি রাগের মুখে কী বলেছেন, সে কি অমন করে মনে নিতে আছে। দেখো, গোড়ায় যা ভুল হয়েছে তা এখন যতটা সম্ভব প্রতিকার করা যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সতীশ। মেসোমশাই, প্রতিকারের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। মাসিমার সঙ্গে আমার এখন যেরূপ সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে তাতে তোমার ঘরের অন্ন আমার গলা দিয়ে আর গলবে না। এতদিন তোমাদের যা খরচ করিয়েছি তা যদি শেষ কড়িটি পর্যন্ত শোধ করে না দিতে পারি, তবে আমার মরেও শান্তি নেই। প্রতিকার যদি কিছু থাকে তো সে আমার হাতে, তুমি কী প্রতিকার করবে।

শশধর। না, শোনো সতীশ, একটু স্থির হও। তোমার যা কর্তব্য সে তুমি পরে ভেবো— তোমার সম্বন্ধে আমরা যে অন্যায় করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত তো আমাকেই করতে হবে। দেখো, আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেব— সেটাকে তুমি দান মনে কোরো না, সে তোমার প্রাপ্য। আমি সমস্ত ঠিক করে রেখেছি— পরশু শুক্রবারে রেজেস্ট্রী করে দেব।

সতীশ। (শশধরের পায়ের ধুলা লইয়া) মেসোমশায়, কী আর বলব— তোমার এই স্নেহে—

শশধর। আচ্ছা, থাক্ থাক্। ও-সব স্নেহ-ফেহ আমি কিছু বুঝি নে, রসকষ আমার কিছুই নেই— যা কর্তব্য তা কোনো রকমে পালন করতেই হবে এই বুঝি। সাড়ে আটটা বাজল, তুমি আজ কোরিন্থিয়ানে যাবে বলেছিলে, যাও। সতীশ, একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, দানপত্রখানা আমি মিস্টার ভাদুড়িকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েছি। ভাবে বোধ হল, তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন— তোমার প্রতি যে তাঁর টান নেই এমন তো দেখা গেল না। এমন-কি, আমি চলে আসবার সময় তিনি আমাকে বললেন, সতীশ আজকাল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে না কেন।

সতীশের প্রস্থান

. ওরে রামচরণ, তোর মা-ঠাকুরানীকে একবার ডেকে দে তো।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। কী স্থির করলে।

শশধর। একটা চমৎকার প্ল্যান ঠাউরেছি।

সুকুমারী। তোমার প্ল্যান যত চমৎকার হবে সে আমি জানি। যা হোক, সতীশকে এ বাড়ি হতে বিদায় করেছ তো?

শশধর। তাই যদি না করব তবে আর প্ল্যান কিসের। আমি ঠিক করেছি, সতীশকে

আমাদের তরফ-মানিকপুর লিখে-পড়ে দেব— তা হলেই সে স্বচ্ছন্দে নিজের খরচ নিজে চালিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে। তোমাকে আর বিরক্ত করবে না।

সুকুমারী। আহা, কী সুন্দর প্ল্যানই ঠাউরেছ। সৌন্দর্যে আমি একেবারে মুগ্ধ! না না, তুমি অমন পাগলামি করতে পারবে না, আমি বলে দিলেম।

শশধর। দেখো, এক সময়ে তো ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবার কথা ছিল।

সুকুমারী। তখন তো আমার হরেন জন্মায় নি। তা ছাড়া তুমি কি ভাব, তোমার আর ছেলেপুলে হবে না।

শশধর। সুকু, ভেবে দেখো আমাদের অন্যায় হচ্ছে। মনেই কর-না কেন, তোমার দুই ছেলে।

সুকুমারী। সে আমি অতশত বুঝি নে। তুমি যদি এমন কাজ কর তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব, এই আমি বলে গেলেম।

সুকুমারীর প্রস্থান। সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ, থিয়েটারে গেলে না?

সতীশ। না মেসোমশাই, আজ আর থিয়েটার না। এই দেখো, দীর্ঘকাল পরে মিস্টার ভাদুড়ির কাছ হতে আমি নিমন্ত্রণ পেয়েছি। তোমার দানপত্রের ফল দেখো। সংসারের উপর আমার ধিক্কার জন্মে গেছে, মেসোমশায়। আমি তোমার সে তালুক নেব না।

শশধর। কেন, সতীশ।

সতীশ। আমি ছদ্মবেশে পৃথিবীর কোনো সুখভোগ করব না। আমার যদি নিজের কোনো মূল্য থাকে, তবে সেই মূল্য দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই ভোগ করব, তার চেয়ে এক কানাকড়িও আমি বেশি চাই না। তা ছাড়া, তুমি যে আমাকে তোমার সম্পত্তির অংশ দিতে চাও, মাসিমার সম্মতি নিয়েছ তো?

শশধর। না, সে তিনি— অর্থাৎ, সে এক রকম করে হবে। হঠাৎ তিনি রাজি না হতে পারেন, কিন্তু—

সতীশ। তুমি তাঁকে বলেছ?

শশধর। হাঁ, বলেছি বইকি! বিলক্ষণ! তাঁকে না বলেই কি আর—

সতীশ। তিনি রাজি হয়েছেন?

শশধর। তাকে ঠিক রাজি বলা যায় না বটে— কিন্তু ভালো করে বুঝিয়ে—

সতীশ। বৃথা চেষ্টা, মেসোমশায়। তাঁর নারাজিতে তোমার সম্পত্তি নিতে চাই নে। তুমি তাঁকে বোলো, আজ পর্যন্ত তিনি আমাকে যে অন্ন খাইয়েছেন তা উদ্গার না করে আমি বাঁচব না। তাঁর সমস্ত ঋণ সুদসুদ্ধ শোধ করে তবে আমি হাঁফ ছাড়ব।

শশধর। সে কিছুই দরকার নেই, সতীশ— তোমাকে বরঞ্চ কিছু নগদ টাকা গোপনে—

সতীশ। না মেসোমশায়, আর ঋণ বাড়াব না। তোমার কাছে এখন কেবল আমার একটি অনুরোধ আছে। তোমার যে সাহেব-বন্ধুর আপিসে আমাকে কাজ দিতে চেয়েছিলে, সেখানে আমার কাজ জুটিয়ে দিতে হবে।

শশধর। পারবে তো?

সতীশ। এর পরেও যদি না পারি তবে পুনর্বার মাসিমার অন্ন খাওয়াই আমার উপযুক্ত শাস্তি হবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সুকুমারী। দেখো দেখি, এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম করে কাজকর্ম করছে। দেখো, অতবড়ো সাহেব-বাবু আজকাল পুরানো কালো আল্‌পাকার চাপকানের উপরে কোঁচানো চাদর ঝুলিয়ে কেমন নিয়মিত আপিসে যায়!

শশধর। বড়োসাহেব সতীশের খুব প্রশংসা করেন।

সুকুমারী। দেখো দেখি, তুমি যদি তোমার জমিদারিটা তাকে দিয়ে বসতে তবে এতদিনে সে টাই-কলার-জুতা-ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে চড়িয়ে দিত। ভাগ্যে আমার পরামর্শ নিয়েছ, তাই তো সতীশ মানুষের মতো হয়েছে।

শশধর। বিধাতা আমাদের বুদ্ধি দেন নি কিন্তু স্ত্রী দিয়েছেন, আর তোমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নির্বোধ স্বামীগুলোকেও তোমাদের হাতে সমর্পণ করেছেন— আমাদেরই জিত।

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েছে, ঠাট্টা করতে হবে না। কিন্তু, সতীশের পিছনে এতদিন যে টাকাটা ঢেলেছ সে যদি আজ থাকত তবে—

শশধর। সতীশ তো বলেছে, কোনো-একদিন সে সমস্তই শোধ করে দেবে।

সুকুমারী। সে যত শোধ করবে আমার গায়ে রইল! সে তো বরাবরই ওইরকম লম্বাচোড়া কথা বলে থাকে। তুমি বুঝি সেই ভরসায় পথ চেয়ে বসে আছ!

শশধর। এতদিন তো ভরসা ছিল, তুমি যদি পরামর্শ দাও তো সেটা বিসর্জন দিই।

সুকুমারী। দিলে তোমার বেশি লোকসান হবে না, এই পর্যন্ত বলতে পারি। ওই-যে তোমার সতীশবাবু আসছেন। চাকরি হয়ে অবধি একদিনও তো আমাদের চৌকাঠ মাড়ান নি, এমনি তাঁর কৃতজ্ঞতা! আমি যাই।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। মাসিমা, পালাতে হবে না। এই দেখো, আমার হাতে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই— কেবল খানকয়েক নোট আছে।

শশধর। ইস্‌! এ যে একতাড়া নোট! যদি আপিসের টাকা হয় তো এমন করে সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো ভালো হচ্ছে না, সতীশ।

সতীশ। আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াব না। মাসিমার পায়ে বিসর্জন দিলাম। প্রণাম হই, মাসিমা। বিস্তর অনুগ্রহ করেছিলে— তখন তার হিসাব রাখতে হবে মনেও করি নি, সুতরাং পরিশোধের অঙ্কে কিছু ভুলচুক হতে পারে। এই পনেরো হাজার টাকা গুনে নাও। তোমার খোকার পোলাও-পরমান্নে একটি তণ্ডুলকণাও কম না পড়ুক।

শশধর। এ কী কাণ্ড, সতীশ। এত টাকা কোথায় পেলে।

সতীশ। আমি গুন্‌চট আজ ছয় মাস আগাম খরিদ করে রেখেছি— ইতিমধ্যে দর চড়েছে; তাই মুনফা পেয়েছি।

শশধর। সতীশ, এ যে জুয়াখেলা!

সতীশ। খেলা এইখানেই শেষ— আর দরকার হবে না।

শশধর। তোমার এ টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমি চাই না।

সতীশ। তোমাকে তো দিই নি, মেসোমশায়। এ মাসিমার ঋণশোধ। তোমার ঋণ কোনো কালে শোধ করতে পারব না।

শশধর। কী সুকু, এ টাকাগুলো—

সুকুমারী। গুনে খাতাঞ্চির হাতে দাও-না— ওইখানেই কি ছড়ানো পড়ে থাকবে।

শশধর। সতীশ, খেয়ে এসেছ তো?

সতীশ। বাড়ি গিয়ে খাব।

শশধর। অ্যাঁ, সে কী কথা। বেলা যে বিস্তর হয়েছে। আজ এইখানেই খেয়ে যাও।

সতীশ। আর খাওয়া নয়, মেসোমশায়। এক দফা শোধ করলেম, অন্ন-ঋণ আবার নূতন করে ফাঁদতে পারব না।

প্রস্থান

সুকুমারী। বাপের হাত হতে রক্ষা করে এতদিন ওকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করলেম, আজ হাতে দু-পয়সা আসতেই ভাবখানা দেখেছ! কৃতজ্ঞতা এমনিই বটে! ঘোর কলি কিনা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। বড়োসাহেব হিসাবের খাতাপত্র কাল দেখবেন। মনে করেছিলেম, ইতিমধ্যে 'গানি'র টাকাটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে, তহবিল পূরণ করে রাখব— কিন্তু বাজার নেমে গেল। এখন জেল ছাড়া গতি নেই। ছেলেবেলা হতে সেখানে যাবারই আয়োজন করা গেছে।

কিন্তু, অদৃষ্টকে ফাঁকি দেব। এই পিস্তলে দুটি গুলি পুরেছি— এই যথেষ্ট। নেলি— না না, ও নাম নয়, ও নাম নয়— আমি তা হলে মরতে পারব না। যদি বা সে আমাকে ভালোবেসে থাকে, সে ভালোবাসা আমি ধূলিসাৎ করে দিয়ে এসেছি। চিঠিতে আমি তার কাছে সমস্তই কবুল করে লিখেছি। এখন পৃথিবীতে আমার কপালে যার ভালোবাসা বাকি রইল সে আমার এই পিস্তল। আমার অন্তিমের প্রেয়সী, ললাটে তোমার চুম্বন নিয়ে চক্ষু মুদব।

মেসোমশায়ের এ বাগানটি আমারই তৈরি। যেখানে যত দুর্লভ গাছ পাওয়া যায় সব সংগ্রহ করে এনেছিলেম। ভেবেছিলেম, এ বাগান একদিন আমারই হবে। ভাগ্য কার জন্য আমাকে দিয়ে এই গাছগুলো রোপণ করে নিচ্ছিল, তা আমাকে তখন বলে নি— তা হোক, এই ঝিলের ধারে এই বিলাতি স্টিফানোটিস লতার কুঞ্জে আমার এ জন্মের হাওয়া-খাওয়া শেষ করব— মৃত্যুর দ্বারা আমি এ বাগান দখল করে নেব— এখানে হাওয়া খেতে আসতে আর কেউ সাহস করবে না।

মেসোমশায়কে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতে চাই। পৃথিবী হতে ওই ধুলোটুকু নিয়ে যেতে পারলে আমার মৃত্যু সার্থক হ'ত। কিন্তু, এখন সন্ধ্যার সময় তিনি মাসিমার কাছে আছেন— আমার এ অবস্থায় মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে আমি সাহস করি নে। বিশেষত পিস্তল ভরা আছে।

মরবার সময় সকলকে ক্ষমা করে শান্তিতে মরার উপদেশ শাস্ত্রে আছে। কিন্তু,

আমি ক্ষমা করতে পারলেম না। আমার এ মরবার সময় নয়। আমার অনেক সুখের কল্পনা, ভোগের আশা ছিল— অল্প কয়েক বৎসরের জীবনে তা একে একে সমস্তই টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙেছে। আমার চেয়ে অনেক অযোগ্য অনেক নির্বোধ লোকের ভাগ্যে অনেক অযাচিত সুখ জুটেছে, আমার জুটেও জুটল না— সেজন্য যারা দায়ী তাদের কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না— কিছুতেই না। আমার মৃত্যুকালের অভিশাপ যেন চিরজীবন তাদের পিছনে পিছনে ফেরে— তাদের সকল সুখকে কানা করে দেয়। তাদের তৃষ্ণার জলকে বাষ্প করে দেবার জন্য আমার দগ্ধ জীবনের সমস্ত দাহকে যেন আমি রেখে যেতে পারি।

হায়! প্রলাপ! সমস্তই প্রলাপ! অভিশাপের কোনো বলই নেই। আমার মৃত্যু কেবল আমাকেই শেষ করে দেবে— আর-কারও গায়ে হাত দিতে পারবে না। আঃ— তারা আমার জীবনটাকে একেবারে ছারখার করে দিলে, আর আমি মরেও তাদের কিছুই করতে পারলেম না। তাদের কোনো ক্ষতি হবে না— তারা সুখে থাকবে, তাদের দাঁত-মাজা হতে আরম্ভ ক'রে মশারি-ঝাড়া পর্যন্ত কোনো তুচ্ছ কাজটিও বন্ধ থাকবে না— অথচ আমার সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের সমস্ত আলোক এক ফুৎকারে নিবল— আমার নেলি— উঃ, ও নাম নয়।

ও কে ও! হরেন! সন্ধ্যার সময় বাগানে বার হয়েছে যে! বাপ-মাকে লুকিয়ে চুরি করে কাঁচা পেয়ারা পাড়তে এসেছে। ওর আকাঙ্ক্ষা ওই কাঁচা পেয়ারার চেয়ে আর অধিক ঊর্ধ্বে চড়ে নি— ওই গাছের নিচু ডালেই ওর অধিকাংশ সুখ ফলে আছে। পৃথিবীতে ওর জীবনের কী মূল্য। গাছের একটা কাঁচা পেয়ারা যেমন, এ সংসারে ওর কাঁচা জীবনটাই বা তার চেয়ে কী এমন বড়ো। এখনি যদি ছিন্ন করা যায়, তবে জীবনের কত নৈরাশ্য হতে ওকে বাঁচানো যায় তা কে বলতে পারে। আর মাসিমা— ইঃ! একেবারে লুটাপুটি করতে থাকবে। আঃ!

ঠিক সময়টি, ঠিক স্থানটি, ঠিক লোকটি। হাতকে আর সামলাতে পারছি নে। হাতটাকে নিয়ে কী করি। হাতটাকে নিয়ে কী করা যায়।

ছড়ি লইয়া সতীশ সবেগে চারাগাছগুলিকে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমশ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে নিজের হাতকে সে সবেগে আঘাত করিল; কিন্তু কোনো বেদনা বোধ করিল না। শেষে পকেটের ভিতর হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে হরেনের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হরেন। (চমকিয়া উঠিয়া) এ কী। দাদা নাকি। তোমার দুটি পায়ে পড়ি দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি— বাবাকে বলে দিয়ো না।

সতীশ। (চীৎকার করিয়া) মেসোমশায়— মেসোমশায়— এইবেলা রক্ষা করো— আর দেরি কোরো না— তোমার ছেলেকে এখনো রক্ষা করো।

শশধর। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হয়েছে, সতীশ। কী হয়েছে।

সুকুমারী। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হয়েছে, আমার বাছার কী হয়েছে।

হরেন। কিছুই হয় নি, মা— কিছুই না— দাদা তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।

সুকুমারী। এ কিরকম বিশ্রী ঠাট্টা। ছি ছি, সকলই অনাসৃষ্টি! দেখো দেখি। আমার বুক এখনো ধড়াস্-ধড়াস্ করছে। সতীশ মদ ধরেছে বুঝি!

সতীশ। পালাও—তোমার ছেলেকে নিয়ে এখনই পালাও। নইলে তোমাদের রক্ষা নেই।

হরেনকে লইয়া ত্রস্তপদে সুকুমারীর পলায়ন

শশধর। সতীশ, অমন উতলা হোয়ো না। ব্যাপারটা কী বলো। হরেনকে কার হাত হতে রক্ষা করবার জন্য ডেকেছিলে।

সতীশ। আমার হাত হতে। (পিস্তল দেখাইয়া) এই দেখো, মেসোমশায়।

দ্রুতপদে বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধু। সতীশ, তুই কোথায় কী সর্বনাশ করে এসেছিস বল্ দেখি। আপিসের সাহেব পুলিশ সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে খানাতল্লাসি করতে এসেছে। যদি পালাতে হয় তো এইবেলা পালা। হায় ভগবান! আমি তো কোনো পাপ করি নি. আমারই অদৃষ্টে এত দুঃখ ঘটে কেন।

সতীশ। ভয় নেই—পালাবার উপায় আমার হাতেই আছে।

শশধর। তবে কি তুমি—

সতীশ। তাই বটে মেসোমশায়—যা সন্দেহ করছ তাই। আমি চুরি করে মাসির ঋণ শোধ করেছি। আমি চোর। মা, শুনে খুশি হবে, আমি চোর, আমি খুনী! এখন আর কাঁদতে হবে না—যাও যাও, আমার সম্মুখ হতে যাও। আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।

শশধর। সতীশ, তুমি আমার কাছেও তো কিছু ঋণী আছ, তাই শোধ করে যাও।

সতীশ। বলো, কেমন করে শোধ করব। কী আমি দিতে পারি। কী চাও তুমি।

শশধর। ওই পিস্তলটা দাও।

সতীশ। এই দিলাম। আমি জেলেই যাব। না গেলে আমার পাপের ঋণশোধ হবে না।

শশধর। পাপের ঋণ শাস্তির দ্বারা শোধ হয় না সতীশ, কর্মের দ্বারাই শোধ হয়। তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি অনুরোধ করলে তোমার বড়োসাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না। এখন হতে জীবনকে সার্থক করে বেঁচে থাকো।

সতীশ। মেসোমশায়, এখন আমার পক্ষে বাঁচা যে কত কঠিন তা তুমি জান না—মরব নিশ্চয় জেনে পায়ের তলা হতে আমার শেষ সুখের অবলম্বনটা আমি পদাঘাতে ফেলে দিয়ে এসেছি—এখন কী নিয়ে বাঁচব।

শশধর। তবু বাঁচতে হবে, আমার ঋণের এই শোধ,—আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।

সতীশ। তবে তাই হবে।

শশধর। আমার একটা অনুরোধ শোনো। তোমার মাকে আর মাসিকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করো।

সতীশ। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পার, তবে এ সংসারে কে এমন থাকতে পারে যাকে আমি ক্ষমা করতে না পারি।

প্রণাম করিয়া

মা, আশীর্বাদ করো আমি সব যেন সহ্য করতে পারি—আমার সকল দোষগুণ

নিয়ে তোমরা আমাকে যেমন গ্রহণ করেছ সংসারকে আমি যেন তেমনি ক'রে গ্রহণ করি।

বিধু। বাবা, কী আর বলব। মা হয়ে আমি তোকে কেবল স্নেহই করেছি, তোর কোনো ভালো করতে পারি নি—ভগবান তোর ভালো করুন। দিদির কাছে আমি একবার তোর হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে নিই গে।

প্রস্থান

শশধর। তবে এসো সতীশ, আমার ঘরে আজ আহার করে যেতে হবে।

দ্রুতপদে নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। সতীশ!

সতীশ। কী, নলিনী।

নলিনী। এর মানে কী। এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেছ।

সতীশ। মানে যেমন বুঝেছিলে সেইটেই ঠিক। আমি তোমাকে প্রতারণা করে চিঠি লিখি নি। তবে আমার ভাগ্যক্রমে সকলই উল্‌টা হয়। তুমি মনে করতে পার, তোমার দয়া উদ্রেক করবার জন্যই আমি—কিন্তু মেসোমশায় সাক্ষী আছেন, আমি অভিনয় করছিলেম না—তবু যদি বিশ্বাস না হয় প্রতিজ্ঞারক্ষা করবার এখনো সময় আছে।

নলিনী। কী তুমি পাগলের মতো বকছ। আমি তোমার কী অপরাধ করেছি যে তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে—

সতীশ। যেজন্য আমি এই সংকল্প করেছি সে তুমি জান, নলিনী—আমি তো একবর্ণও গোপন করি নি, তবু কি আমার উপর তোমার শ্রদ্ধা আছে।

নলিনী। শ্রদ্ধা! সতীশ, তোমার উপর ওইজন্যই আমার রাগ ধরে। শ্রদ্ধা! ছি ছি, শ্রদ্ধা তো পৃথিবীতে অনেকেই অনেককে করে। তুমি যে কাজ করেছ আমিও তাই করেছি—তোমাতে আমাতে কোনো ভেদ রাখি নি। এই দেখো, আমার গহনাগুলি সব এনেছি—এগুলি এখনো আমার সম্পত্তি নয়—এগুলি আমার বাপ-মায়ের। আমি তাঁদিগকে না বলে এনেছি, এর কত দাম হতে পারে আমি কিছুই জানি নে; কিন্তু এ দিয়ে কি তোমার উদ্ধার হবে না।

শশধর। উদ্ধার হবে, এই গহনাগুলির সঙ্গে আরও অমূল্য যে ধনটি দিয়েছ তা দিয়েই সতীশের উদ্ধার হবে।

নলিনী। এই-যে শশধরবাবু, মাপ করবেন, তাড়াতাড়িতে আপনাকে আমি—

শশধর। মা, সেজন্য লজ্জা কী। দৃষ্টির দোষ কেবল আমাদের মতো বুড়োদেরই হয় না—তোমাদের বয়সে আমাদের মতো প্রবীণ লোক হঠাৎ চোখে ঠেকে না। সতীশ, তোমার আপিসের সাহেব এসেছেন দেখছি। আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে আসি, ততক্ষণ তুমি আমার হয়ে আতিথিসংকার করো।—মা, এই পিস্তলটা এখন তোমার জিম্মাতেই থাকতে পারে।

পৌষ ১৩১০

গুপ্তধন

অমাবস্যার নিশীথরাত্রি। মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিক মতে তাহাদের বহুকালের গৃহদেবতা জয়কালীর পূজায় বসিয়াছে। পূজা সমাধা করিয়া যখন উঠিল, তখন নিকটস্থ আমবাগান হইতে প্রত্যুষের প্রথম কাক ডাকিল।

মৃত্যুঞ্জয় পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। তখন সে একবার দেবীর চরণতলে মস্তক ঠেকাইয়া তাঁহার আসন সরাইয়া দিল। সেই আসনের নীচে হইতে একটি কাঁঠালকাঠের বাক্স বাহির হইল। পৈতায় চাবি বাঁধা ছিল। সেই চাবি লাগাইয়া মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিল। খুলিবামাত্রই চমকিয়া উঠিয়া মাথায় করাঘাত করিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের অন্দরের বাগান প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সেই বাগানের এক প্রান্তে বড়ো বড়ো গাছের ছায়ার অন্ধকারে এই ছোটো মন্দিরটি। মন্দিরে জয়কালীর মূর্তি ছাড়া আর-কিছুই নাই; তাহার প্রবেশদ্বার একটিমাত্র। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিবার পূর্বে তাহা বন্ধই ছিল— কেহ তাহা ভাঙে নাই। মৃত্যুঞ্জয় দশবার করিয়া প্রতিমার চারি দিকে ঘুরিয়া হাতড়াইয়া দেখিল— কিছুই পাইল না। পাগলের মতো হইয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া ফেলিল— তখন ভোরের আলো ফুটিতেছে। মন্দিরের চারি দিকে মৃত্যুঞ্জয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃথা আশ্বাসে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সকালবেলাকার আলোক যখন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, তখন সে বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার পর ক্লান্তশরীরে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিল, "জয় হোক বাবা।"

সম্মুখে প্রাঙ্গণে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। মৃত্যুঞ্জয় ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি মনের মধ্যে বৃথা শোক করিতেছ।"

শুনিয়া মৃত্যুঞ্জয় আশ্চর্য হইয়া উঠিল; কহিল, "আপনি অন্তর্যামী, নহিলে আমার শোক কেমন করিয়া বুঝিলেন। আমি তো কাহাকেও কিছু বলি নাই।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস, আমি বলিতেছি, তোমার যাহা হারাইয়াছে সেজন্য তুমি আনন্দ করো, শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আপনি তবে তো সমস্তই জানিয়াছেন— কেমন করিয়া হারাইয়াছে, কোথায় গেলে ফিরিয়া পাইব, তাহা না বলিলে আমি আপনার চরণ ছাড়িব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি যদি তোমার অমঙ্গল কামনা করিতাম তবে বলিতাম। কিন্তু, ভগবতী দয়া করিয়া যাহা হরণ করিয়াছেন সেজন্য শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জয় সন্ন্যাসীকে প্রসন্ন করিবার জন্য সমস্ত দিন বিবিধ উপচারে তাঁহার সেবা করিল। পরদিন প্রত্যুষে নিজের গোহাল হইতে লোটা ভরিয়া সফেন দুগ্ধ দুহিয়া লইয়া আসিয়া দেখিল, সন্ন্যাসী নাই।

মৃত্যুঞ্জয় যখন শিশু ছিল, যখন তাহার পিতামহ হরিহর একদিন এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তখন এমনি করিয়াই একটি সন্ন্যাসী 'জয় হোক বাবা' বলিয়া এই প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হরিহর সেই সন্ন্যাসীকে কয়েকদিন বাড়িতে রাখিয়া বিধিমতো সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করিল।

বিদায়কালে সন্ন্যাসী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস, তুমি কী চাও", হরিহর কহিল, "বাবা, যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমার অবস্থাটা একবার শুনুন। এক কালে এই গ্রামে আমরা সকলের চেয়ে বর্ধিষ্ণু ছিলাম। আমার প্রপিতামহ দূর হইতে কুলীন আনাইয়া তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দৌহিত্রবংশ আমাদিগকেই ফাঁকি দিয়া আজকাল এই গ্রামে বড়োলোক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এখন অবস্থা ভালো নয়, কাজেই ইহাদের অহংকার সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু, আর সহ্য হয় না। কী করিলে আবার আমাদের বংশ বড়ো হইয়া উঠিবে সেই উপায় বলিয়া দিন, সেই আশীর্বাদ করুন।"

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাবা, ছোটো হইয়া সুখে থাকো। বড়ো হইবার চেষ্টায় শ্রেয় দেখি না।"

কিন্তু, হরিহর তবু ছাড়িল না, বংশকে বড়ো করিবার জন্য সে সমস্ত স্বীকার করিতে রাজি আছে।

তখন সন্ন্যাসী তাঁহার ঝুলি হইতে কাপড়ে-মোড়া একটি তুলট কাগজের লিখন বাহির করিলেন। কাগজখানি দীর্ঘ, কোষ্ঠীপত্রের মতো গুটানো। সন্ন্যাসী সেটি মেজের উপরে খুলিয়া ধরিলেন। হরিহর দেখিল, তাহাতে নানাপ্রকার চক্রে নানা সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা, আর, সকলের নিম্নে একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে তাহার আরম্ভটা এইরূপ—

পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা॥
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা॥
তেঁতুল বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে॥
ঈশানকোণে ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী। ইত্যাদি।

হরিহর কহিল, "বাবা, কিছুই তো বুঝিলাম না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "কাছে রাখিয়া দাও, দেবীর পূজা করো। তাঁহার প্রসাদে তোমার বংশে কেহ না কেহ এই লিখন বুঝিতে পারিবে। তখন সে এমন ঐশ্বর্য পাইবে জগতে যাহার তুলনা নাই।"

হরিহর মিনতি করিয়া কহিল, "বাবা কি বুঝাইয়া দিবেন না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "না। সাধনা দ্বারা বুঝিতে হইবে।"

এমন সময় হরিহরের ছোটো ভাই শংকর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া হরিহর তাড়াতাড়ি লিখনটি লুকাইবার চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন,

"বড়ো হইবার পথের দুঃখ এখন হইতেই শুরু হইল। কিন্তু গোপন করিবার দরকার নাই। কারণ, ইহার রহস্য কেবল একজনমাত্রই ভেদ করিতে পারিবে, হাজার চেষ্টা করিলেও আর-কেহ তাহা পারিবে না। তোমাদের মধ্যে সেই লোকটি যে কে, তাহা কেহ জানে না। অতএব ইহা সকলের সম্মুখেই নির্ভয়ে খুলিয়া রাখিতে পার।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কিন্তু, হরিহর এ কাগজটি লুকাইয়া না রাখিয়া থাকিতে পারিল না। পাছে আর-কেহ ইহা হইতে লাভবান হয়, পাছে তাহার ছোটো ভাই শংকর ইহার ফলভোগ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় হরিহর এই কাগজটি একটি কাঁঠালকাঠের বাক্সে বন্ধ করিয়া তাহাদের গৃহদেবতা জয়কালীর আসনতলে লুকাইয়া রাখিল। প্রত্যেক অমাবস্যার নিশীথরাত্রে দেবীর পূজা সারিয়া সে একবার করিয়া সেই কাগজটি খুলিয়া দেখিত, যদি দেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অর্থ বুঝিবার শক্তি দেন।

শংকর কিছুদিন হইতে হরিহরকে মিনতি করিতে লাগিল, "দাদা, আমাকে সেই কাগজটা একবার ভালো করিয়া দেখিতে দাও-না।"

হরিহর কহিল, "দূর পাগল, সে কাগজ কি আছে। বেটা ভণ্ড সন্ন্যাসী কাগজে কতকগুলা হিজিবিজি কাটিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল— আমি সে পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।"

শংকর চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একদিন শংকরকে ঘরে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার পর হইতে সে নিরুদ্দেশ।

হরিহরের অন্য সমস্ত কাজকর্ম নষ্ট হইল— গুপ্ত ঐশ্বর্যের ধ্যান একমুহূর্ত সে ছাড়িতে পারিল না।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বড়ো ছেলে শ্যামাপদকে এই সন্ন্যাসীদত্ত কাগজখানি দিয়া গেল।

এই কাগজ পাইয়া শ্যামাপদ চাকরি ছাড়িয়া দিল। জয়কালীর পূজায় আর একান্তমনে এই লিখনপাঠের চর্চায় তাহার জীবনটা যে কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিল না।

মৃত্যুঞ্জয় শ্যামাপদর বড়ো ছেলে। পিতার মৃত্যুর পরে সে এই সন্ন্যাসীদত্ত গুপ্ত-লিখনের অধিকারী হইয়াছে। তাহার অবস্থা উত্তরোত্তর যতই হীন হইয়া আসিতে লাগিল, ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত ঐ কাগজখানির প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট হইল। এমন সময় গত অমাবস্যারাত্রে পূজার পর লিখনখানি আর দেখিতে পাইল না— সন্ন্যাসীও কোথায় অন্তর্ধান করিল।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "এই সন্ন্যাসীকে ছাড়া হইবে না। সমস্ত সন্ধান ইহার কাছ হইতেই মিলিবে।"

এই বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে বাহির হইল। এক বৎসর পথে পথে কাটিয়া গেল।

২

গ্রামের নাম ধারাগোল। সেখানে মৃত্যুঞ্জয় মুদির দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেছিল আর অন্যমনস্ক হইয়া নানা কথা ভাবিতেছিল। কিছু দূরে মাঠের ধার দিয়া একজন

সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। প্রথমটা মৃত্যুঞ্জয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। একটু পরে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যে লোকটা চলিয়া গেল এই তো সেই সন্ন্যাসী! তাড়াতাড়ি হুঁকাটা রাখিয়া মুদিকে সচকিত করিয়া এক দৌড়ে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু, সে সন্ন্যাসীকে দেখা গেল না।

তখন সন্ধ্যা অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। অপরিচিত স্থানে কোথায় যে সন্ন্যাসীর সন্ধান করিতে যাইবে, তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। দোকানে ফিরিয়া আসিয়া মুদিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ-যে মস্ত বন দেখা যাইতেছে ওখানে কী আছে।"

মুদি কহিল, "এককালে ঐ বন শহর ছিল, কিন্তু অগস্ত্য মুনির শাপে ওখানকার রাজা প্রজা সমস্তই মড়কে মরিয়াছে। লোকে বলে, ওখানে অনেক ধনরত্ন আজও খুঁজিলে পাওয়া যায়; কিন্তু দিনদুপুরেও ঐ বনে সাহস করিয়া কেহ যাইতে পারে না। যে গেছে সে আর ফেরে নাই।"

মৃত্যুঞ্জয়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি মুদির দোকানে মাদুরের উপর পড়িয়া মশার জ্বালায় সর্বাঙ্গ চাপড়াইতে লাগিল আর ঐ বনের কথা, সন্ন্যাসীর কথা, সেই হারানো লিখনের কথা ভাবিতে থাকিল। বার বার পড়িয়া সেই লিখনটি মৃত্যুঞ্জয়ের প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল, তাই এই অনিদ্রাবস্থায় কেবলই তাহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল—

পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা॥
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা॥

মাথা গরম হইয়া উঠিল—কোনোমতেই এই কটা ছত্র সে মন হইতে দূর করিতে পারিল না। অবশেষে ভোরের বেলায় যখন তাহার তন্দ্রা আসিল তখন স্বপ্নে এই চারি ছত্রের অর্থ অতি সহজে তাহার নিকট প্রকাশ হইল। 'রা নাহি দেয় রাধা' অতএব 'রাধা'র 'রা' না থাকিলে 'ধা' রহিল—'শেষে দিল রা' অতএব হইল 'ধারা'—'পাগোল ছাড়ো পা', 'পাগোল'-এর 'পা' ছাড়িলে 'গোল' বাকি রহিল—অতএব সমস্তটা মিলিয়া হইল 'ধারাগোল'—এ জায়গাটার নাম তো 'ধারাগোল'ই বটে।

স্বপ্ন ভাঙিয়া মৃত্যুঞ্জয় লাফাইয়া উঠিল।

৪

সমস্ত দিন বনের মধ্যে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় বহু কষ্টে পথ খুঁজিয়া অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় মৃত্যুঞ্জয় গ্রামে ফিরিল।

পরদিন চাদরে চিঁড়া বাঁধিয়া পুনর্বার সে বনের মধ্যে যাত্রা করিল। অপরাহ্নে একটা দিঘির ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিঘির মাঝখানটা পরিষ্কার জল, আর পাড়ের গায়ে গায়ে চারি দিকে পদ্ম আর কুমুদের বন। পাথরে বাঁধানো ঘাট ভাঙিয়া-চুরিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে জলে চিঁড়া ভিজাইয়া খাইয়া দিঘির চারি দিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

দিঘির পশ্চিম পাড়ির প্রান্তে হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, একটা

তেতুঁলগাছকে বেষ্টন করিয়া প্রকাণ্ড বটগাছ উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল—

তেতুঁল বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে॥

দক্ষিণে কিছু দূর যাইতেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সেখানে সে বেতঝাড় ভেদ করিয়া চলা একেবারে অসাধ্য। যাহা হউক, মৃত্যুঞ্জয় ঠিক করিল, এই গাছটাকে কোনোমতে হারাইলে চলিবে না।

এই গাছের কাছে ফিরিয়া আসিবার সময় গাছের অন্তরাল দিয়া অনতি দূরে একটা মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। সেই দিকের প্রতি লক্ষ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় এক ভাঙা মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, নিকটে একটা চুল্লি, পোড়া কাঠ আর ছাই পড়িয়া আছে। অতি সাবধানে মৃত্যুঞ্জয় ভগ্নদ্বার মন্দিরের মধ্যে উঁকি মারিল। সেখানে কোনো লোক নাই, প্রতিমা নাই, কেবল একটি কম্বল কমণ্ডলু আর গেরুয়া উত্তরীয় পড়িয়া আছে।

তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে; গ্রাম বহু দূরে, অন্ধকারে বনের মধ্যে পথ সন্ধান করিয়া যাইতে পারিবে কি না, তাই এই মন্দিরে মনুষ্যবসতির লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুশি হইল। মন্দির হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভাঙিয়া দ্বারের কাছে পড়িয়া ছিল; সেই পাথরের উপরে বসিয়া নতশিরে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ পাথরের গায়ে কী যেন লেখা দেখিতে পাইল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল একটি চক্র আঁকা, তাহার মধ্যে কতক স্পষ্ট কতক লুপ্তপ্রায়-ভাবে নিম্নলিখিত সাংকেতিক অক্ষর লেখা আছে—

এই চক্রটি মৃত্যুঞ্জয়ের সুপরিচিত। কত অমাবস্যারাত্রে পূজাগৃহে সুগন্ধ ধূপের ধূমে ঘৃতদীপালোকে তুলট কাগজে অঙ্কিত এই চক্রচিহ্নের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রহস্য ভেদ করিবার জন্য একাগ্রমনে সে দেবীর প্রসাদ যাচ্ঞা করিয়াছে। আজ অভীষ্ট-সিদ্ধির অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ যেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে তীরে আসিয়া তরী ডোবে, পাছে সামান্য একটা ভুলে তাহার সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, পাছে সেই সন্ন্যাসী পূর্বে আসিয়া সমস্ত উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়া থাকে, এই আশঙ্কায় তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এখন যে তাহার কী কর্তব্য তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মনে হইল, সে হয়তো তাহার ঐশ্বর্যভাণ্ডারের ঠিক উপরেই বসিয়া আছে, অথচ কিছুই জানিতে পাইতেছে না।

বসিয়া বসিয়া সে কালীনাম জপ করিতে লাগিল; সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল; ঝিল্লির ধ্বনিতে বনভূমি মুখর হইয়া উঠিল।

৫

এমন সময় কিছুদূরে ঘন বনের মধ্যে অগ্নির দীপ্তি দেখা গেল। মৃত্যুঞ্জয় তাহার প্রস্তরাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, আর সেই শিখা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

বহু কষ্টে কিছুদূর গিয়া একটা অশথ গাছের গুঁড়ির অন্তরাল হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার সেই পরিচিত সন্ন্যাসী অগ্নির আলোকে সেই তুলটের লিখন মেলিয়া একটা কাঠি দিয়া ছাইয়ের উপরে একমনে অঙ্ক কষিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরের সেই পৈতৃক তুলটের লিখন! আরে ভণ্ড, চোর! এইজন্যই সে মৃত্যুঞ্জয়কে শোক করিতে নিষেধ করিয়াছিল বটে!

সন্ন্যাসী একবার করিয়া অঙ্ক কষিতেছে, আর, একটা মাপকাঠি লইয়া জমি মাপিতেছে—কিয়দ্দূর মাপিয়া হতাশ হইয়া ঘাড় নাড়িয়া পুনর্বার আসিয়া অঙ্ক কষিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

এমনি করিয়া রাত্রি যখন অবসানপ্রায়, যখন নিশান্তের শীতবায়ুতে বনস্পতির অগ্রশাখার পল্লবগুলি মর্মরিত হইয়া উঠিল, তখন সন্ন্যাসী সেই লিখনপত্র গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। ইহা সে নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, সন্ন্যাসীর সাহায্য ব্যতীত এই লিখনের রহস্য ভেদ করা তাহার সাধ্য হইবে না। লুব্ধ সন্ন্যাসী যে মৃত্যুঞ্জয়কে সাহায্য করিবে না, তাহাও নিশ্চিত। অতএব গোপনে সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি রাখা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কিন্তু, দিনের বেলায় গ্রামে না গেলে তাহার আহার মিলিবে না; অতএব অন্তত কাল সকালে একবার গ্রামে যাওয়া আবশ্যক।

ভোরের দিকে অন্ধকার একটু ফিকা হইবামাত্র সে গাছ হইতে নামিয়া পড়িল। যেখানে সন্ন্যাসী ছাইয়ের মধ্যে আঁক কষিতেছিল সেখানে ভালো করিয়া দেখিল, কিছুই বুঝিল না। চতুর্দিকে ঘুরিয়া দেখিল, অন্য বনখণ্ডের সঙ্গে কোনো প্রভেদ নাই।

বনতলের অন্ধকার ক্রমে যখন ক্ষীণ হইয়া আসিল তখন মৃত্যুঞ্জয় অতি সাবধানে চারি দিক দেখিতে দেখিতে গ্রামের উদ্দেশে চলিল। তাহার ভয় ছিল পাছে সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিতে পায়।

যে দোকানে মৃত্যুঞ্জয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহার নিকটে একটি কায়স্থগৃহিণী ব্রত-উদ্‌যাপন করিয়া সেদিন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে প্রবৃত্ত ছিল। সেইখানে আজ মৃত্যুঞ্জয়ের আহার জুটিয়া গেল। কয়দিন আহারের কষ্টের পর আজ তাহার ভোজনটি গুরুতর হইয়া উঠিল। সেই গুরুভোজনের পর যেমন তামাকটি খাইয়া দোকানের মাদুরটিতে একবার গড়াইয়া লইবার ইচ্ছা করিল অমনি গত রাত্রির অনিদ্রাকাতর মৃত্যুঞ্জয় ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় স্থির করিয়াছিল, আজ সকাল-সকাল আহারাদি করিয়া যথেষ্ট বেলা থাকিতে বাহির হইবে। ঠিক তাহার উল্‌টা হইল। যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে। তবু মৃত্যুঞ্জয় দমিল না। অন্ধকারেই বনের মধ্যে সে প্রবেশ করিল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ঘনীভূত হইয়া আসিল। গাছের ছায়ার মধ্যে দৃষ্টি আর চলে না, জঙ্গলের মধ্যে পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয় যে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে তাহা কিছুই ঠাহর পাইল না। রাত্রি যখন অবসান হইল তখন দেখিল সমস্ত

রাত্রি সে বনের প্রান্তে একই জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

কাকের দল কা-কা শব্দে গ্রামের দিকে উড়িল। এই শব্দ মৃত্যুঞ্জয়ের কানে ব্যঙ্গপূর্ণ ধিক্কারবাক্যের মতো শুনাইল।

৬

গণনায় বারম্বার ভুল আর সেই ভুল সংশোধন করিতে করিতে অবশেষে সন্ন্যাসী সুরঙ্গের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। সুরঙ্গের মধ্যে মশাল লইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন। বাঁধানো ভিত্তির গায়ে স্যাঁৎলা পড়িয়াছে—মাঝে-মাঝে এক-এক জায়গায় জল চুঁইয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কতকগুলা ভেক গায়ে গায়ে স্তূপাকার হইয়া নিদ্রা দিতেছে। এই পিছল পথ দিয়া কিছুদূর যাইতেই সন্ন্যাসী দেখিলেন, সম্মুখে দেয়াল উঠিয়াছে, পথ অবরুদ্ধ। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেয়ালের সর্বত্র লৌহ-দণ্ড দিয়া সবলে আঘাত করিয়া দেখিলেন, কোথাও ফাঁকা আওয়াজ দিতেছে না, কোথাও রন্ধ্র নাই, এই পথটার যে এইখানেই শেষ তাহা নিঃসন্দেহ।

আবার সেই কাগজ খুলিয়া, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে রাত্রি এমনি করিয়া কাটিয়া গেল।

পরদিন পুনর্বার গণনা সারিয়া সুরঙ্গে প্রবেশ করিলেন। সেদিন গুপ্তসংকেত অনুসরণপূর্বক একটি বিশেষ স্থান হইতে পাথর খসাইয়া এক শাখাপথ আবিষ্কার করিলেন। সেই পথে চলিতে চলিতে আবার এক জায়গায় পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

অবশেষে পঞ্চম রাত্রে সুরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, "আজ আমি পথ পাইয়াছি, আজ আর আমার কোনোমতেই ভুল হইবে না।"

পথ অত্যন্ত জটিল; তাহার শাখাপ্রশাখার অন্ত নাই—কোথাও এত সংকীর্ণ যে গুঁড়ি মারিয়া যাইতে হয়। বহু যত্নে মশাল ধরিয়া চলিতে চলিতে সন্ন্যাসী একটা গোলাকার ঘরের মতো জায়গায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই ঘরের মাঝখানে একটা বৃহৎ ইঁদারা। মশালের আলোকে সন্ন্যাসী তাহার তল দেখিতে পাইলেন না। ঘরের ছাদ হইতে একটা মোটা প্রকাণ্ড লৌহশৃঙ্খল ইঁদারার মধ্যে নামিয়া গেছে। সন্ন্যাসী প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া এই শৃঙ্খলটাকে অল্প একটুখানি নাড়াইবামাত্র ঠং করিয়া একটা শব্দ ইঁদারার গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া ঘরময় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাইয়াছি।"

যেমন বলা অমনি সেই ঘরের ভাঙা ভিত্তি হইতে একটা পাথর গড়াইয়া পড়িল, আর সেই সঙ্গে আর-একটি কী সচেতন পদার্থ ধপ করিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী এই অকস্মাৎ শব্দে চমকিয়া উঠিতেই তাঁহার হাত হইতে মশাল পড়িয়া নিবিয়া গেল।

৭

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে।" কোনো উত্তর পাইলেন না। তখন অন্ধকারে হাৎড়াইতে গিয়া তাঁহার হাতে একটি মানুষের দেহ ঠেকিল। তাহাকে নাড়া দিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি।"

কোনো উত্তর পাইলেন না। লোকটা অচেতন হইয়া গেছে।

তখন চক্‌মকি ঠুকিয়া ঠুকিয়া সন্ন্যাসী অনেক কষ্টে মশাল ধরাইলেন। ইতিমধ্যে সেই লোকটাও সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল, আর উঠিবার চেষ্টা করিয়া বেদনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "এ কী, মৃত্যুঞ্জয় যে! তোমার এ মতি হইল কেন।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "বাবা, মাপ করো। ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। তোমাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে গিয়া সামলাইতে পারি নাই— পিছলে পাথরসুদ্ধ আমি পড়িয়া গেছি। পা'টা নিশ্চয় ভাঙিয়া গেছে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমাকে মারিয়া তোমার কী লাভ হইত।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "লাভের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ! তুমি কিসের লোভে আমার পূজাঘর হইতে লিখনখানি চুরি করিয়া এই সুরঙ্গের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তুমি চোর, তুমি ভণ্ড! আমার পিতামহকে যে সন্ন্যাসী ঐ লিখনখানি দিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদেরই বংশের কেহ এই লিখনের সংকেত বুঝিতে পারিবে। এই গুপ্ত ঐশ্বর্য আমাদেরই বংশের প্রাপ্য। তাই আমি এ কয়দিন না-খাইয়া না-ঘুমাইয়া ছায়ার মতো তোমার পশ্চাতে ফিরিয়াছি। আজ যখন তুমি বলিয়া উঠিলে 'পাইয়াছি' তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি তোমার পশ্চাতে আসিয়া ঐ গর্তটার ভিতরে লুকাইয়া বসিয়া ছিলাম। ওখান হইতে একটা পাথর খসাইয়া তোমাকে মারিতে গেলাম, কিন্তু শরীর দুর্বল, জায়গাটাও অত্যন্ত পিছল— তাই পড়িয়া গেছি— এখন তুমি আমাকে মারিয়া ফেলো সেও ভালো— আমি যক্ষ হইয়া এই ধন আগলাইব— কিন্তু তুমি ইহা লইতে পারিবে না— কোনোমতেই না। যদি লইতে চেষ্টা কর, আমি ব্রাহ্মণ, তোমাকে অভিশাপ দিয়া এই কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। এ ধন তোমার ব্রহ্মরক্ত গোরক্ত-তুল্য হইবে— এ ধন তুমি কোনোদিন সুখে ভোগ করিতে পারিবে না। আমাদের পিতা-পিতামহ এই ধনের উপরে সমস্ত মন রাখিয়া মরিয়াছেন— এই ধনের ধ্যান করিতে করিতে আমরা দরিদ্র হইয়াছি— এই ধনের সন্ধানে আমি বাড়িতে অনাথা স্ত্রী ও শিশুসন্তান ফেলিয়া আহারনিদ্রা ছাড়িয়া লক্ষ্মীছাড়া পাগলের মতো মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি— এ ধন তুমি আমার চোখের সম্মুখে কখনো লইতে পারিবে না।"

৮

সন্ন্যাসী কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, তবে শোনো। সমস্ত কথা তোমাকে বলি।— তুমি জান, তোমার পিতামহের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তার নাম ছিল শংকর।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "হাঁ, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি সেই শংকর।"

মৃত্যুঞ্জয় হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এতক্ষণ এই গুপ্ত ধনের উপর তাহার যে একমাত্র দাবি সে সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল, তাহারই বংশের আত্মীয় আসিয়া সে দাবি নষ্ট করিয়া দিল।

শংকর কহিলেন, "দাদা সন্ন্যাসীর নিকট হইতে লিখন পাইয়া অবধি আমার কাছে তাহা বিধিমতে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যতই গোপন করিতে লাগিলেন আমার ঔৎসুক্য ততই বাড়িয়া উঠিল। তিনি দেবীর আসনের নীচে বাক্সের মধ্যে ঐ লিখনখানি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহার সন্ধান পাইলাম, আর দ্বিতীয় চাবি বানাইয়া প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া সমস্ত কাগজখানা নকল করিতে লাগিলাম। যেদিন নকল শেষ হইল সেইদিনই আমি এই ধনের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। আমারও ঘরে অনাথা স্ত্রী এবং একটি শিশুসন্তান ছিল। আজ তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই।

"কত দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছি তাহা বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসীদত্ত এই লিখন নিশ্চয় কোনো সন্ন্যাসী আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন, এই মনে করিয়া অনেক সন্ন্যাসীর আমি সেবা করিয়াছি। অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী আমার ঐ কাগজের সন্ধান পাইয়া তাহা হরণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপে কত বৎসরের পর বৎসর কাটিয়াছে, আমার মনে এক মুহূর্তের জন্যও সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না।

"অবশেষে পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যের বলে কুমায়ুন পর্বতে বাবা স্বরূপানন্দ স্বামীর সঙ্গ পাইলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, 'বাবা, তৃষ্ণা দূর করো, তাহা হইলেই বিশ্বব্যাপী অক্ষয় সম্পদ আপনি তোমাকে ধরা দিবে।'

"তিনি আমার মনের দাহ জুড়াইয়া দিলেন। তাঁহার প্রসাদে আকাশের আলোক আর ধরণীর শ্যামলতা আমার কাছে রাজসম্পদ হইয়া উঠিল। একদিন পর্বতের শিলাতলে শীতের সায়াহ্নে পরমহংস-বাবার ধুনিতে আগুন জ্বলিতেছিল— সেই আগুনে আমার কাগজখানা সমর্পণ করিলাম। বাবা ঈষৎ একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ তখন বুঝি নাই, আজ বুঝিয়াছি। তিনি নিশ্চয় মনে-মনে বলিয়াছিলেন, কাগজখানা ছাই করিয়া ফেলা সহজ, কিন্তু বাসনা এত সহজে ভস্মসাৎ হয় না।

"কাগজখানার যখন কোনো চিহ্ন রহিল না তখন আমার মনের চারি দিক হইতে একটা নাগপাশ-বন্ধন যেন সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গেল। মুক্তির অপূর্ব আনন্দে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম, এখন হইতে আমার আর-কোনো ভয় নাই— আমি জগতে কিছুই চাহি না।

"ইহার অনতিকাল পরে পরমহংস-বাবার সঙ্গ হইতে চ্যুত হইলাম। তাঁহাকে অনেক খুঁজিলাম, কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না।

"আমি তখন সন্ন্যাসী হইয়া নিরাসক্তচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অনেক বৎসর কাটিয়া গেল— সেই লিখনের কথা প্রায় ভুলিয়াই গেলাম।

"এমন সময় একদিন এই ধারাগোলের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ভাঙা মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় লইলাম। দুই-একদিন থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মন্দিরের ভিতে স্থানে স্থানে নানাপ্রকার চিহ্ন আঁকা আছে। এই চিহ্নগুলি আমার পূর্বপরিচিত।

"এক কালে বহুদিন যাহার সন্ধানে ফিরিয়াছিলাম তাহার যে নাগাল পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না। আমি কহিলাম, 'এখানে আর থাকা হইবে না, এ বন ছাড়িয়া চলিলাম।'

"কিন্তু ছাড়িয়া যাওয়া ঘটিল না। মনে হইল, দেখাই যাক-না, কী আছে— কৌতূহল একেবারে নিবৃত্ত করিয়া যাওয়াই ভালো। চিহ্নগুলা লইয়া অনেক আলোচনা করিলাম;

কোনো ফল হইল না। বারবার মনে হইতে লাগিল, কেন সে কাগজখানা পুড়াইয়া ফেলিলাম—সেখানা রাখিলেই বা ক্ষতি কী ছিল।

"তখন আবার আমার সেই জন্মগ্রামে গেলাম। আমাদের পৈতৃক ভিটার নিতান্ত দুরবস্থা দেখিয়া মনে করিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমার ধনরত্নে কোনো প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই গরিবরা তো গৃহী, সেই গুপ্ত সম্পদ ইহাদের জন্য উদ্ধার করিয়া দিলে তাহাতে দোষ নাই।

"সেই লিখন কোথায় আছে জানিতাম, তাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইল না।

"তাহার পরে একটি বৎসর ধরিয়া এই কাগজখানা লইয়া এই নির্জন বনের মধ্যে গণনা করিয়াছি আর সন্ধান করিয়াছি। মনে আর-কোনো চিন্তা ছিল না। যত বারম্বার বাধা পাইতে লাগিলাম ততই উত্তরোত্তর আগ্রহ আরও বাড়িয়া চলিল—উন্মত্তের মতো অহোরাত্র এই এক অধ্যবসায়ে নিবিষ্ট রহিলাম।

"ইতিমধ্যে কখন তুমি আমার অনুসরণ করিতেছ তাহা জানিতে পারি নাই। আমি সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কখনোই নিজেকে আমার কাছে গোপন রাখিতে পারিতে না; কিন্তু আমি তন্ময় হইয়া ছিলাম, বাহিরের ঘটনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না।

"তাহার পরে, যাহা খুঁজিতেছিলাম আজ এইমাত্র তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। এখানে যাহা আছে পৃথিবীতে কোনো রাজরাজেশ্বরের ভান্ডারেও এত ধন নাই। আর একটিমাত্র সংকেত ভেদ করিলেই সেই ধন পাওয়া যাইবে।

"এই সংকেতটিই সর্বাপেক্ষা দুরূহ। কিন্তু এই সংকেতও আমি মনে-মনে ভেদ করিয়াছি। সেইজন্যই 'পাইয়াছি' বলিয়া মনের উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। যদি ইচ্ছা করি তবে আর এক দণ্ডের মধ্যে সেই স্বর্ণমাণিক্যের ভান্ডারের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারি।"

মৃত্যুঞ্জয় শংকরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি সন্ন্যাসী, তোমার তো ধনের কোনো প্রয়োজন নাই—আমাকে সেই ভান্ডারের মধ্যে লইয়া যাও। আমাকে বঞ্চিত করিয়ো না।"

শংকর কহিলেন, "আজ আমার শেষ বন্ধন মুক্ত হইয়াছে। তুমি ঐ যে পাথর ফেলিয়া আমাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলে তাহার আঘাত আমার শরীরে লাগে নাই, কিন্তু তাহা আমার মোহাবরণকে ভেদ করিয়াছে। তৃষ্ণার করালমূর্তি আজ আমি দেখিলাম। আমার গুরু পরমহংসদেবের নিগূঢ় প্রশান্ত হাস্য এত দিন পরে আমার অন্তরের কল্যাণদীপে অনির্বাণ আলোকশিখা জ্বালাইয়া তুলিল।"

মৃত্যুঞ্জয় শংকরের পা ধরিয়া পুনরায় কাতর স্বরে কহিল, "তুমি মুক্ত পুরুষ, আমি মুক্ত নহি, আমি মুক্তি চাহি না, আমাকে এই ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস, তবে তুমি তোমার এই লিখনটি লও। যদি ধন খুঁজিয়া লইতে পার তবে লইয়ো।"

এই বলিয়া তাঁহার যষ্টি ও লিখনপত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে রাখিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমাকে দয়া করো, আমাকে ফেলিয়া যাইয়ো না—আমাকে

দেখাইয়া দাও।"

কোনো উত্তর পাইল না।

তখন মৃত্যুঞ্জয় যষ্টির উপর ভর করিয়া হাৎড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু, পথ অত্যন্ত জটিল, গোলকধাঁধার মতো, বার বার বাধা পাইতে লাগিল। অবশেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া এক জায়গায় শুইয়া পড়িল এবং নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

ঘুম হইতে যখন জাগিল তখন রাত্রি কি দিন কি কত বেলা তাহা জানিবার কোনো উপায় ছিল না। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইলে মৃত্যুঞ্জয় চাদরের প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া খাইল। তাহার পর আর-একবার হাৎড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। নানা স্থানে বাধা পাইয়া বসিয়া পড়িল। তখন চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ওগো সন্ন্যাসী, তুমি কোথায়।"

তাহার সেই ডাক সুরঙ্গের সমস্ত শাখা প্রশাখা হইতে বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনতি দূর হইতে উত্তর আসিল, "আমি তোমার নিকটেই আছি—কী চাও বলো।"

মৃত্যুঞ্জয় কাতর স্বরে কহিল, "কোথায় ধন আছে আমাকে দয়া করিয়া দেখাইয়া দাও।"

তখন আর-কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। মৃত্যুঞ্জয় বারম্বার ডাকিল, কোনো সাড়া পাইল না।

দণ্ড প্রহরের দ্বারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাত্রির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় আর-একবার ঘুমাইয়া লইল। ঘুম হইতে আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ওগো, আছ কি।"

নিকট হইতেই উত্তর পাইল, "এইখানেই আছি। কী চাও।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমি আর-কিছু চাই না—আমাকে এই সুরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ধন চাও না?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, চাহি না।"

তখন চকমকি ঠোকার শব্দ উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বলিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তবে এসো মৃত্যুঞ্জয়, এই সুরঙ্গ হইতে বাহিরে যাই।"

মৃত্যুঞ্জয় কাতর স্বরে কহিল, "বাবা, নিতান্তই কি সমস্ত ব্যর্থ হইবে। এত কষ্টের পরেও ধন কি পাইব না।"

তৎক্ষণাৎ মশাল নিবিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "কি নিষ্ঠুর।" বলিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। সময়ের কোনো পরিমাণ নাই, অন্ধকারের কোনো অন্ত নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল, তাহার সমস্ত শরীর-মনের বলে এই অন্ধকারটাকে ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। আলোক আকাশ আর বিশ্বচ্ছবির বৈচিত্র্যের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কহিল, "ওগো সন্ন্যাসী, ওগো নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী, আমি ধন চাই না, আমাকে উদ্ধার করো।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "ধন চাও না? তবে আমার হাত ধরো। আমার সঙ্গে চলো।"

এবারে আর আলো জ্বলিল না। এক হাতে যষ্টি ও এক হাতে সন্ন্যাসীর উত্তরীয়

ধরিয়া মৃত্যুঞ্জয় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া অনেক আঁকাবাঁকা পথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া-ফিরিয়া এক জায়গায় আসিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "দাঁড়াও।"

মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইল। তাহার পরে একটা মরিচাপড়া লোহার দ্বার খোলার উৎকট শব্দ শোনা গেল। সন্ন্যাসী মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, "এসো।"

মৃত্যুঞ্জয় অগ্রসর হইয়া যেন একটা ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আবার চকমকি ঠোকার শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন মশাল জ্বলিয়া উঠিল তখন এ কী আশ্চর্য দৃশ্য! চারি দিকে দেয়ালের গায়ে মোটা মোটা সোনার পাত ভূগর্ভরুদ্ধ কঠিন সূর্যালোকপুঞ্জের মতো স্তরে স্তরে সজ্জিত। মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল। সে পাগলের মতো বলিয়া উঠিল, "এ সোনা আমার—এ আমি কোনোমতেই ফেলিয়া যাইতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আচ্ছা, ফেলিয়া যাইয়ো না; এই মশাল রহিল—আর এই ছাতু চিঁড়া আর বড়ো এক-ঘটি জল রাখিয়া গেলাম।"

দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী বাহির হইয়া আসিলেন, আর এই স্বর্ণভাণ্ডারের লৌহ-দ্বারে কপাট পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় বারবার করিয়া এই স্বর্ণপুঞ্জ স্পর্শ করিয়া ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোটো ছোটো স্বর্ণখণ্ড টানিয়া মেজের উপরে ফেলিতে লাগিল, কোলের উপর তুলিতে লাগিল, একটার উপরে আর-একটা আঘাত করিয়া শব্দ করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গের উপর বুলাইয়া তাহার স্পর্শ লইতে লাগিল। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সোনার পাত বিছাইয়া তাহার উপর শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, চারি দিকে সোনা ঝকঝক্ করিতেছে। সোনা ছাড়া আর-কিছুই নাই। মৃত্যুঞ্জয় ভাবিতে লাগিল, পৃথিবীর উপরে হয়তো এতক্ষণে প্রভাত হইয়াছে, সমস্ত জীবজন্তু আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে।—তাহাদের বাড়িতে পুকুরের ধারের বাগান হইতে প্রভাতে যে একটি স্নিগ্ধ গন্ধ উঠিত তাহাই কল্পনায় তাহার নাসিকায় যেন প্রবেশ করিতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট চোখে দেখিতে পাইল, পাতি-হাঁসগুলি দুলিতে দুলিতে কলরব করিতে করিতে সকালবেলায় পুকুরের জলের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, আর বাড়ির ঝি বামা কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঊর্ধ্বোত্থিত দক্ষিণ হস্তের উপর একরাশি পিতল-কাঁসার থালা বাটি লইয়া ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয় দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল, "ওগো সন্ন্যাসীঠাকুর, আছ কি।"

দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী কহিলেন, "কী চাও।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমি বাহিরে যাইতে চাই—কিন্তু সঙ্গে এই সোনার দুটো-একটা পাতও কি লইয়া যাইতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া নূতন মশাল জ্বালাইলেন—পূর্ণ কমণ্ডলু একটি রাখিলেন, আর উত্তরীয় হইতে কয়েক মুষ্টি চিঁড়া মেজের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় পাৎলা একটা সোনার পাত লইয়া তাহা দোমড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। সেই খণ্ড সোনাগুলাকে লইয়া ঘরের চারি দিকে লোষ্ট্রখণ্ডের মতো ছড়াইতে লাগিল। কখনো বা দাঁত দিয়া দংশন করিয়া সোনার পাতের উপর দাগ

করিয়া দিল। কখনো বা একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে বারম্বার পদাঘাত করিতে লাগিল। মনে-মনে বলিতে লাগিল, পৃথিবীতে এমন সম্রাট কয়জন আছে যাহারা সোনা লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে। মৃত্যুঞ্জয়ের যেন একটা প্রলয়ের রোখ চাপিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই রাশীকৃত সোনাকে চূর্ণ করিয়া ধূলির মতো সে ঝাঁটা দিয়া ঝাঁট দিয়া উড়াইয়া ফেলে— আর এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত সুবর্ণলুব্ধ রাজা-মহারাজকে সে অবজ্ঞা করিতে পারে।

এমনি করিয়া যতক্ষণ পারিল মৃত্যুঞ্জয় সোনাগুলাকে লইয়া টানাটানি করিয়া শ্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম হইতে উঠিয়া সে আবার তাহার চারি দিকে সেই সোনার স্তূপ দেখিতে লাগিল। সে তখন দ্বারে আঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওগো সন্ন্যাসী, আমি এ সোনা চাই না— সোনা চাই না!"

কিন্তু, দ্বার খুলিল না। ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুঞ্জয়ের গলা ভাঙিয়া গেল, কিন্তু দ্বার খুলিল না। এক-একটা সোনার পিণ্ড লইয়া দ্বারের উপর ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল, কোনো ফল হইল না। মৃত্যুঞ্জয়ের বুক দমিয়া গেল— তবে আর কি সন্ন্যাসী আসিবে না! এই স্বর্ণকারাগারের মধ্যে তিলে তিলে পলে পলে শুকাইয়া মরিতে হইবে!

তখন সোনাগুলাকে দেখিয়া তাহার আতঙ্ক হইতে লাগিল। বিভীষিকার নিঃশব্দ কঠিন হাস্যের মতো ঐ সোনার স্তূপ চারি দিকে স্থির হইয়া রহিয়াছে— তাহার মধ্যে স্পন্দন নাই, পরিবর্তন নাই— মৃত্যুঞ্জয়ের যে হৃদয় এখন কাঁপিতেছে, ব্যাকুল হইতেছে, তাহার সঙ্গে উহাদের কোনো সম্পর্ক নাই, বেদনার কোনো সম্বন্ধ নাই। এই সোনার পিণ্ডগুলা আলোক চায় না, আকাশ চায় না, বাতাস চায় না, প্রাণ চায় না, মুক্তি চায় না। ইহারা এই চির-অন্ধকারের মধ্যে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া, কঠিন হইয়া, স্থির হইয়া রহিয়াছে।

পৃথিবীতে এখন কি গোধূলি আসিয়াছে। আহা, সেই গোধূলির স্বর্ণ! যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়। তাহার পরে কুটিরের প্রাঙ্গণতলে সন্ধ্যাতারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গোষ্ঠে প্রদীপ জ্বালাইয়া বধূ ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।

গ্রামের ঘরের অতি ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম ব্যাপার আজ মৃত্যুঞ্জয়ের কল্পনাদৃষ্টির কাছে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের সেই যে ভোলা কুকুরটা লেজে মাথায় এক হইয়া উঠানের প্রান্তে সন্ধ্যার পর ঘুমাইতে থাকিত, সে কল্পনাও তাহাকে যেন ব্যথিত করিতে লাগিল। ধারাগোল গ্রামে কয়দিন সে যে-মুদির দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল সেই মুদি এতক্ষণ রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া, দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া, ধীরে ধীরে গ্রামে বাড়িমুখে আহার করিতে চলিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, মুদি কী সুখেই আছে। আজ কী বার কে জানে। যদি রবিবার হয় তবে এতক্ষণে হাটের লোক যে যার আপন আপন বাড়ি ফিরিতেছে, সঙ্গচ্যুত সাথিকে ঊর্ধ্বস্বরে ডাক পাড়িতেছে, দল বাঁধিয়া খেয়ানৌকায় পার হইতেছে; মেঠো রাস্তা ধরিয়া, শস্যক্ষেত্রের আল বাহিয়া, পল্লীর শুষ্কবংশপত্রখচিত অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া চাষি-লোক হাতে দুটো-একটা মাছ ঝুলাইয়া মাথায় একটা চুপড়ি লইয়া অন্ধকারে আকাশ-ভরা তারার ক্ষীণা-

লোকে গ্রামে গ্রামান্তরে চলিয়াছে।

ধরণীর উপরিতলে এই বিচিত্র বৃহৎ চিরচঞ্চল জীবনযাত্রার মধ্যে তুচ্ছতম দীনতম হইয়া নিজের জীবন মিশাইবার জন্য শতস্তর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহার কাছে লোকালয়ের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সেই জীবন, সেই আকাশ, সেই আলোক, পৃথিবীর সমস্ত মণিমাণিক্যের চেয়ে তাহার কাছে দুর্মূল্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, 'কেবল ক্ষণকালের জন্য একবার যদি আমার সেই শ্যামা জননী ধরিত্রীর ধূলিক্রোড়ে, সেই উন্মুক্ত আলোকিত নীলাম্বরের তলে, সেই তৃণপত্রের গন্ধ-বাসিত বাতাস বুক ভরিয়া একটিমাত্র শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মরিতে পারি তাহা হইলেও জীবন সার্থক হয়।'

এমন সময় দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, কী চাও।"

সে বলিয়া উঠিল, "আমি আর কিছুই চাই না—আমি এই সুরঙ্গ হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলকধাঁধা হইতে, এই সোনার গারদ হইতে বাহির হইতে চাই। আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মুক্তি চাই।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "এই সোনার ভাণ্ডারের চেয়ে মূল্যবান রত্নভাণ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, যাইব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "একবার দেখিয়া আসিবার কৌতূহলও নাই?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, আমি দেখিতেও চাই না। আমাকে যদি কৌপীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় তবু আমি এখানে এক মুহূর্তও কাটাইতে ইচ্ছা করি না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আচ্ছা, তবে এসো।"

মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে সেই গভীর কূপের সম্মুখে লইয়া গেলেন। তাহার হাতে সেই লিখনপত্র দিয়া কহিলেন, "এখানি লইয়া তুমি কী করিবে।"

মৃত্যুঞ্জয় সে পত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

কার্তিক ১৩১১

মাস্টারমশায়

ভূমিকা

রাত্রি তখন প্রায় দুটা। কলিকাতার নিস্তব্ধ শব্দসমুদ্রে একটুখানি ঢেউ তুলিয়া একটা বড়ো জুড়িগাড়ি ভবানীপুরের দিক হইতে আসিয়া বির্জিতলাও-এর মোড়ের কাছে থামিল। সেখানে একটা ঠিকাগাড়ি দেখিয়া আরোহী বাবু তাহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। তাঁহার পাশে একটি কোট-হ্যাট-পরা বাঙালি বিলাত-ফের্তা যুবা সম্মুখের আসনে দুই পা তুলিয়া দিয়া একটু মদমত্ত অবস্থায় ঘাড় নামাইয়া ঘুমাইতেছিল। এই যুবকটি নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছে। ইহারই অভ্যর্থনা-উপলক্ষে বন্ধুমহলে একটা খানা হইয়া গেছে। সেই খানা হইতে ফিরিবার পথে একজন বন্ধু তাহাকে কিছুদূর অগ্রসর করিবার জন্য নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহাকে দু-তিনবার ঠেলা দিয়া জাগাইয়া কহিলেন, "মজুমদার, গাড়ি পাওয়া গেছে, বাড়ি যাও।"

মজুমদার সচকিত হইয়া একটা বিলাতি দিব্য গালিয়া ভাড়াটে গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। তাহার গাড়োয়ানকে ভালো করিয়া ঠিকানা বাৎলাইয়া দিয়া ব্রুহাম গাড়ির আরোহী নিজের গম্য পথে চলিয়া গেলেন।

ঠিকা গাড়ি কিছুদূর সিধা গিয়া পার্ক-স্ট্রীটের সম্মুখে ময়দানের রাস্তায় মোড় লইল। মজুমদার আর-একবার ইংরেজি শপথ উচ্চারণ করিয়া আপন মনে কহিল, 'এ কী। এ তো আমার পথ নয়!' তার পরে নিদ্রাজড় অবস্থায় ভাবিল, 'হবেও বা, এইটিই হয়তো সোজা রাস্তা।'

ময়দানে প্রবেশ করিতেই মজুমদারের গা কেমন করিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল—কোনো লোক নাই তবু তাহার পাশের জায়গাটা যেন ভর্তি হইয়া উঠিতেছে; যেন তাহার আসনের শূন্য অংশের আকাশটা নিরেট হইয়া তাহাকে ঠাসিয়া ধরিতেছে। মজুমদার ভাবিল, 'এ কী ব্যাপার। গাড়িটা আমার সঙ্গে এ কিরকম ব্যবহার শুরু করিল।'

"এই গাড়োয়ান, গাড়োয়ান!"

গাড়োয়ান কোনো জবাব দিল না। পিছনের খড়খড়ি খুলিয়া ফেলিয়া সহিসটার হাত চাপিয়া ধরিল; কহিল, "তুম্ ভিতর আকে বৈঠো।"

সহিস ভীতকণ্ঠে কহিল, "নেহি, সা'ব, ভিতর নেহি যায়েগা!"

শুনিয়া মজুমদারের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল; সে জোর করিয়া সহিসের হাত চাপিয়া কহিল, "জল্‌দি ভিতর আও।"

সহিস সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া নামিয়া দৌড় দিল। তখন মজুমদার পাশের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল; কিছুই দেখিতে পাইল না, তবু মনে হইল, পাশে একটা অটল পদার্থ একেবারে চাপিয়া বসিয়া আছে। কোনোমতে গলায় আওয়াজ আনিয়া মজুমদার কহিল, "গাড়োয়ান, গাড়ি রোখো।" বোধ হইল, গাড়োয়ান যেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই হাতে রাশ টানিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা করিল—ঘোড়া কোনোমতেই থামিল না। না থামিয়া ঘোড়াদুটা রেড রোডের রাস্তা ধরিয়া পুনর্বার দক্ষিণের দিকে মোড় লইল। মজুমদার ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আরে, কাঁহা যাতা।"

কোনো উত্তর পাইল না। পাশের শূন্যতার দিকে রহিয়া রহিয়া কটাক্ষ করিতে করিতে মজুমদারের সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। কোনোমতে আড়ষ্ট হইয়া নিজের শরীরটাকে যতদূর সংকীর্ণ করিতে হয়, তাহা সে করিল, কিন্তু সে যতটুকু জায়গা ছাড়িয়া দিল ততটুকু জায়গা ভরিয়া উঠিল। মজুমদার মনে-মনে তর্ক করিতে লাগিল যে, 'কোন্ প্রাচীন য়ুরোপীয় জ্ঞানী বলিয়াছেন, Nature abhors vacuum—তাই তো দেখিতেছি। কিন্তু এটা কী রে! এটা কি Nature? যদি আমাকে কিছু না বলে তবে আমি এখনই ইহাকে সমস্ত জায়গাটা ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া পড়ি।' লাফ দিতে সাহস হইল না—পাছে পিছনের দিক হইতে অভাবিতপূর্ব একটা-কিছু ঘটে। 'পাহারাওয়ালা' বলিয়া ডাক দিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু বহুকষ্টে এমনি একটুখানি অদ্ভুত ক্ষীণ আওয়াজ বাহির হইল যে, অত্যন্ত ভয়ের মধ্যেও তাহার হাসি পাইল। অন্ধকারে ময়দানের গাছগুলো ভূতের নিস্তব্ধ পার্লামেন্টের মতো পরস্পর মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং গ্যাসের খুঁটিগুলো সমস্তই যেন জানে অথচ কিছুই যেন বলিবে না, এমনিভাবে খাড়া হইয়া মিট্‌মিটে আলোকশিখায় চোখ টিপিতে লাগিল। মজুমদার মনে করিল, চট্ করিয়া এক লম্ফে সামনের আসনে গিয়া বসিবে। যেমনি মনে করা অমনি অনুভব করিল সামনের আসন হইতে কেবলমাত্র একটা চাহনি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। চক্ষু নাই, কিছুই নাই, অথচ একটা চাহনি। সে চাহনি যে কাহার তাহা যেন মনে পড়িতেছে অথচ কোনোমতেই যেন মনে আনিতে পারিতেছে না। মজুমদার দুই চক্ষু জোর করিয়া বুজিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু ভয়ে বুজিতে পারিল না—সেই অনির্দেশ্য চাহনির দিকে দুই চোখ এমন শক্ত করিয়া মেলিয়া রহিল যে, নিমেষ ফেলিতে সময় পাইল না।

এ দিকে গাড়িটা কেবলই ময়দানের রাস্তায় উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে চক্রপথে ঘুরিতে লাগিল। ঘোড়া দুটো ক্রমেই যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল—তাহাদের বেগ কেবলই বাড়িয়া চলিল—গাড়ির খড়্খড়েগুলো থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া ঝর্‌ঝর্ শব্দ করিতে লাগিল।

এমন সময় গাড়িটা যেন কিসের উপর খুব একটা ধাক্কা খাইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। মজুমদার চকিত হইয়া দেখিল, তাহাদেরই রাস্তায় গাড়ি দাঁড়াইয়াছে ও গাড়োয়ান তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "সাহেব, কোথায় যাইতে হইবে বলো।"

মজুমদার রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে ময়দানের মধ্যে ঘুরাইলি কেন।"

গাড়োয়ান আশ্চর্য হইয়া কহিল, "কই, ময়দানের মধ্যে তো ঘুরাই নাই।"

মজুমদার বিশ্বাস না করিয়া কহিল, "তবে এ কি শুধু স্বপ্ন।"

গাড়োয়ান একটু ভাবিয়া ভীত হইয়া কহিল, "বাবুসাহেব, বুঝি শুধু স্বপ্ন নহে। আমার এই গাড়িতেই আজ তিন বছর হইল একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল।"

মজুমদারের তখন নেশা ও ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাওয়াতে গাড়োয়ানের গল্পে কর্ণপাত না করিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু, রাত্রে তাহার ভালো করিয়া ঘুম হইল না—কেবলই ভাবিতে লাগিল, সেই চাহনিটা কার।

১

অধর মজুমদারের বাপ সামান্য শিপ-সরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া একটা বড়ো হৌসের মুচ্ছুদ্দিগিরি পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন। অধরবাবু বাপের উপার্জিত নগদ টাকা সুদে খাটাইতেছেন, তাঁহাকে আর নিজে খাটিতে হয় না। বাপ মাথায় সাদা ফেটা বাঁধিয়া পাল্‌কিতে করিয়া আপিসে যাইতেন, এ দিকে তাঁহার ক্রিয়াকর্ম দানধ্যান যথেষ্ট ছিল। বিপদে-আপদে অভাবে-অনটনে সকল শ্রেণীর লোকেই যে তাঁহাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িত, ইহাই তিনি গর্বের বিষয় মনে করিতেন।

অধরবাবু বড়ো বাড়ি ও গাড়ি-জুড়ি করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে আর তাঁহার সম্পর্ক নাই; কেবল টাকা ধারের দালাল আসিয়া তাঁহার বাঁধানো হুঁকায় তামাক টানিয়া যায় এবং অ্যটর্নি-আপিসের বাবুদের সঙ্গে স্ট্যাম্প-দেওয়া দলিলের শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। তাঁহার সংসারের খরচপত্র সম্বন্ধে হিসাবের এমনি কষাকষি যে, পাড়ার ফুটবল ক্লাবের নাছোড়বান্দা ছেলেরাও বহু চেষ্টায় তাঁহার তহবিলে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই।

এমন সময় তাঁহার ঘরকন্নার মধ্যে একটি অতিথির আগমন হইল। ছেলে হল না, হল না, করিতে করিতে অনেকদিন পরে তাঁহার একটি ছেলে জন্মিল। ছেলেটির চেহারা তাহার মার ধরনের। বড়ো বড়ো চোখ, টিকলো নাক, রঙ রজনীগন্ধার পাপড়ির মতো—যে দেখিল সেই বলিল, "আহা ছেলে তো নয়, যেন কার্তিক!" অধরবাবুর অনুগত অনুচর রতিকান্ত বলিল, "বড়ো ঘরের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত তেমনই হইয়াছে।"

ছেলেটির নাম হইল বেণুগোপাল। ইতিপূর্বে অধরবাবুর স্ত্রী ননীবালা সংসার-খরচ লইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের মত তেমন জোর করিয়া কোনোদিন খাটান নাই। দুটো-একটা শখের ব্যাপার অথবা লৌকিকতার অত্যাবশ্যক আয়োজন লইয়া মাঝে মাঝে বচসা হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষকালে স্বামীর কৃপণতার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নিঃশব্দে হার মানিয়াছেন।

এবারে ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, বেণুগোপাল সম্বন্ধে তাঁহার হিসাব এক-এক পা করিয়া হঠিতে লাগিল। তাহার পায়ের মল, হাতের বালা, গলার হার, মাথার টুপি, তাহার দিশি বিলাতি নানা রকমের নানা রঙের সাজসজ্জা সম্বন্ধে ননীবালা যাহা-কিছু দাবি উত্থাপিত করিলেন, সব-কটাই তিনি কখনো নীরব অশ্রুপাতে কখনো সরব বাক্যবর্ষণে জিতিয়া লইলেন। বেণুগোপালের জন্য যাহা দরকার এবং যাহা দরকার নয় তাহা চাই'ই চাই—সেখানে শূন্য তহবিলের ওজর বা ভবিষ্যতের ফাঁকা আশ্বাস একদিনও খাটিল না।

২

বেণুগোপাল বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বেণুর জন্য খরচ করাটা অধরলালের অভ্যাস হইয়া আসিল। তাহার জন্য বেশি মাহিনা দিয়া অনেক-পাস-করা এক বুড়ো মাস্টার রাখিলেন। এই মাস্টার বেণুকে মিষ্টভাষায় ও শিষ্টাচারে বশ করিবার অনেক চেষ্টা

করিলেন— কিন্তু তিনি নাকি বরাবর ছাত্রদিগকে কড়া শাসনে চালাইয়া আজ পর্যন্ত মাস্টারি মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার ভাষার মিষ্টতা ও আচারের শিষ্টতায় কেবলই বেসুর লাগিল— সেই শুষ্ক সাধনায় ছেলে ভুলিল না।

ননীবালা অধরলালকে কহিলেন, "ও তোমার কেমন মাস্টার। ওকে দেখিলেই যে ছেলে অস্থির হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও।"

বুড়া মাস্টার বিদায় হইল। সেকালে মেয়ে যেমন স্বয়ম্বরা হইত তেমনি ননীবালার ছেলে স্বয়ম্মাস্টার হইতে বসিল— সে যাহাকে না বরিয়া লইবে তাহার সকল পাস ও সকল সার্টিফিকেট বৃথা।

এমনি সময়টিতে গায়ে একখানি ময়লা চাদর ও পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা পরিয়া মাস্টারির উমেদারিতে হরলাল আসিয়া জুটিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফস্বলের এন্‌ট্রেন্স্ স্কুলে কোনোমতে এন্‌ট্রেন্স্ পাস করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাতায় কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছে। অনাহারে তাহার মুখের নিম্ন অংশ শুকাইয়া ভারতবর্ষের 'কন্যাকুমারী'র মতো সরু হইয়া আসিয়াছে, কেবল মস্ত কপালটা হিমালয়ের মতো প্রশস্ত হইয়া অত্যন্ত চোখে পড়িতেছে। মরুভূমির বালু হইতে সূর্যের আলো যেমন ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি তাহার দুই চক্ষু হইতে দৈন্যের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছে।

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী চাও। কাহাকে চাও।" হরলাল ভয়ে ভয়ে বলিল, "বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।" দরোয়ান কহিল, "দেখা হইবে না।" তাহার উত্তরে হরলাল কী বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্তত করিতেছিল, এমন সময় সাত বছরের ছেলে বেণুগোপাল বাগানে খেলা সারিয়া দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দরোয়ান হরলালকে দ্বিধা করিতে দেখিয়া আবার কহিল, "বাবু, চলা যাও।"

বেণুর হঠাৎ জিদ্ চড়িল— সে কহিল, "নেহি যায় গা।" বলিয়া সে হরলালের হাত ধরিয়া তাহাকে দোতলার বারান্দায় তাহার বাপের কাছে লইয়া হাজির করিল।

বাবু তখন দিবানিদ্রা সারিয়া জড়ালসভাবে বারান্দায় বেতের কেদারায় চুপচাপ বসিয়া পা দোলাইতেছিলেন ও বৃদ্ধ রতিকান্ত একটা কাঠের চৌকিতে আসন হইয়া বসিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। সেদিন এই সময়ে এই অবস্থায় দৈবক্রমে হরলালের মাস্টারি বাহাল হইয়া গেল।

রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার পড়া কিপর্যন্ত।"

হরলাল একটুখানি মুখ নিচু করিয়া কহিল, "এন্‌ট্রেন্স্ পাস করিয়াছি।"

রতিকান্ত ভ্রূ তুলিয়া কহিল, "শুধু এন্‌ট্রেন্স্ পাস?" আমি বলি কলেজে পড়িয়াছেন। আপনার বয়সও তো নেহাত কম দেখি না।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। আশ্রিত ও আশ্রয়প্রত্যাশীদিগকে সকল রকমে পীড়ন করাই রতিকান্তের প্রধান আনন্দ ছিল।

রতিকান্ত আদর করিয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কত এম-এ বি-এ আসিল ও গেল, কাহাকেও পছন্দ হইল না— আর শেষকালে কি সোনাবাবু এন্‌ট্রেন্স্-পাস-করা মাস্টারের কাছে পড়িবেন!"

বেণু রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "যাও!" রতিকান্তকে বেণু কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু রতিও বেণুর এই অসহিষ্ণুতাকে তাহার বাল্যমাধুর্যের একটা লক্ষণ বলিয়া ইহাতে খুব আমোদ পাইবার চেষ্টা করিত, এবং তাহাকে সোনাবাবু চাঁদবাবু বলিয়া খেপাইয়া আগুন করিয়া তুলিত।

হরলালের উমেদারি সফল হওয়া শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সে মনে-মনে ভাবিতেছিল, এইবার কোনো সুযোগে চৌকি হইতে উঠিয়া বাহির হইতে পারিলে বাঁচা যায়। এমন সময়ে অধরলালের সহসা মনে হইল, এই ছোকরাটিকে নিতান্ত সামান্য মাহিনা দিলেও পাওয়া যাইবে। শেষকালে স্থির হইল, হরলাল বাড়িতে থাকিবে, খাইবে, ও পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইবে। বাড়িতে রাখিয়া যেটুকু অতিরিক্ত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা হইবে তাহার বদলে অতিরিক্ত কাজ আদায় করিয়া লইলেই এটুকু দয়া সার্থক হইতে পারিবে।

৩

এবারে মাস্টার টিঁকিয়া গেল। প্রথম হইতেই হরলালের সঙ্গে বেণুর এমনি জমিয়া গেল যেন তাহারা দুই ভাই। কলিকাতায় হরলালের আত্মীয়বন্ধু কেহই ছিল না— এই সুন্দর ছোটো ছেলেটি তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিল। অভাগা হরলালের এমন করিয়া কোনো মানুষকে ভালোবাসিবার সুযোগ ইতিপূর্বে কখনও ঘটে নাই। কী করিলে তাহার অবস্থা ভালো হইবে, এই আশায় সে বহু কষ্টে বই জোগাড় করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় দিনরাত শুধু পড়া করিয়াছে। মাকে পরাধীন থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছেলের শিশুবয়স কেবল সংকোচেই কাটিয়াছে— নিষেধের গণ্ডি পার হইয়া দুষ্টামির দ্বারা নিজের বাল্যপ্রতাপকে জয়শালী করিবার সুখ সে কোনোদিন পায় নাই। সে কাহারও দলে ছিল না, সে আপনার ছেঁড়া বই ও ভাঙা স্লেটের মাঝখানে একলাই ছিল। জগতে জন্মিয়া যে ছেলেকে শিশুকালেই নিস্তব্ধ ভালোমানুষ হইতে হয়, তখন হইতেই মাতার দুঃখ ও নিজের অবস্থা যাহাকে সাবধানে বুঝিয়া চলিতে হয়, সম্পূর্ণ অবিবেচক হইবার স্বাধীনতা যাহার ভাগ্যে কোনোদিন জোটে না, আমোদ করিয়া চঞ্চলতা করা বা দুঃখ পাইয়া কাঁদা, এ দুটোই যাহাকে অন্য লোকের অসুবিধা ও বিরক্তির ভয়ে সমস্ত শিশুশক্তি প্রয়োগ করিয়া চাপিয়া যাইতে হয়, তাহার মতো করুণার পাত্র অথচ করুণা হইতে বঞ্চিত জগতে কে আছে!

সেই পৃথিবীর সকল মানুষের নীচে চাপা-পড়া হরলাল নিজেও জানিত না, তাহার মনের মধ্যে এত স্নেহের রস অবসরের অপেক্ষায় এমন করিয়া জমা হইয়া ছিল। বেণুর সঙ্গে খেলা করিয়া, তাহাকে পড়াইয়া, অসুখের সময় তাহার সেবা করিয়া হরলাল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল নিজের অবস্থার উন্নতি করার চেয়েও মানুষের আর-একটা জিনিস আছে— সে যখন পাইয়া বসে তখন তাহার কাছে আর-কিছুই লাগে না।

বেণুও হরলালকে পাইয়া বাঁচিল। কারণ, ঘরে সে একটি ছেলে; একটি অতি ছোটো ও আর-একটি তিন বছরের বোন আছে— বেণু তাহাদিগকে সঙ্গদানের যোগ্যই মনে করে না। পাড়ার সমবয়সী ছেলের অভাব নাই, কিন্তু অধরলাল নিজের ঘরকে অত্যন্ত বড়ো ঘর বলিয়া নিজের মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখাতে মেলামেশা করিবার

উপযুক্ত ছেলে বেণুর ভাগ্যে জুটিল না। কাজেই হরলাল তাহার একমাত্র সঙ্গী হইয়া উঠিল। অনুকূল অবস্থায় বেণুর যে-সকল দৌরাত্ম্য দশ জনের মধ্যে ভাগ হইয়া একরকম সহনযোগ্য হইতে পারিত তাহা সমস্তই একা হরলালকে বহিতে হইত। এই-সমস্ত উপদ্রব প্রতিদিন সহ্য করিতে করিতে হরলালের স্নেহ আরও দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। রতিকান্ত বলিতে লাগিল, "আমাদের সোনাবাবুকে মাস্টারমশায় মাটি করিতে বসিয়াছেন।" অধরলালেরও মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল, মাস্টারের সঙ্গে ছাত্রের সম্বন্ধটি ঠিক যেন যথোচিত হইতেছে না। কিন্তু হরলালকে বেণুর কাছ হইতে তফাত করে এমন সাধ্য এখন কাহার আছে।

৪

বেণুর বয়স এখন এগারো। হরলাল এফ-এ পাস করিয়া জলপানি পাইয়া তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে কলেজে তাহার দুটি-একটি বন্ধু যে জোটে নাই তাহা নহে, কিন্তু ওই এগারো বছরের ছেলেটিই তাহার সকল বন্ধুর সেরা। কলেজ হইতে ফিরিয়া বেণুকে লইয়া সে গোলদিঘি এবং কোনো-কোনোদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত। তাহাকে গ্রীক ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বলিত, তাহাকে স্কট ও ভিক্টর হ্যুগোর গল্প একটু একটু করিয়া বাংলায় শুনাইত— উচ্চৈঃস্বরে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জমা করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহার কাছে শেক্স্‌পীয়ারের 'জুলিয়স্ সীজার' মানে করিয়া পড়িয়া তাহা হইতে অ্যাণ্টনির বক্তৃতা মুখস্থ করাইবার চেষ্টা করিত। ওই একটুখানি বালক হরলালের হৃদয়-উদ্‌বোধনের পক্ষে যেন সোনার কাঠির মতো হইয়া উঠিল। একলা বসিয়া যখন পড়া মুখস্থ করিত তখন ইংরেজি সাহিত্য সে এমন করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করে নাই, এখন সে ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য যাহা-কিছু পড়ে তাহার মধ্যে কিছু রস পাইলেই সেটা আগে বেণুকে দিবার জন্য আগ্রহ বোধ করে এবং বেণুর মনে সেই আনন্দ সঞ্চার করিবার চেষ্টাতেই তাহার নিজের বুঝিবার শক্তি ও আনন্দের অধিকার যেন দুইগুণ বাড়িয়া যায়।

বেণু ইস্কুল হইতে আসিয়াই কোনোমতে তাড়াতাড়ি জলপান সারিয়াই হরলালের কাছে যাইবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হইয়া উঠিত, তাহার মা তাহাকে কোনো ছুতায় কোনো প্রলোভনে অন্তঃপুরে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। ননীবালার ইহা ভালো লাগে নাই। তাহার মনে হইত, হরলাল নিজের চাকরি বজায় রাখিবার জন্যই ছেলেকে এত করিয়া বশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে একদিন হরলালকে ডাকিয়া পর্দার আড়াল হইতে বলিল, "তুমি মাস্টার, ছেলেকে কেবল সকালে এক ঘণ্টা, বিকালে এক ঘণ্টা পড়াইবে— দিনরাত্রি উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক কেন। আজকাল ও যে মা বাপ কাহাকেও মানে না। ও কেমন শিক্ষা পাইতেছে। আগে যে ছেলে মা বলিতে একেবারে নাচিয়া উঠিত আজ যে তাহাকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না! বেণু আমার বড়ো ঘরের ছেলে, উহার সঙ্গে তোমার অত মাখামাখি কিসের জন্য।"

সেদিন রতিকান্ত অধরবাবুর কাছে গল্প করিতেছিল যে, তাহার জানা তিন-চারজন লোক, বড়োমানুষের ছেলের মাস্টারি করিতে আসিয়া ছেলের মন এমন করিয়া

বশ করিয়া লইয়াছে যে, ছেলে বিষয়ের অধিকারী হইলে তাহারাই সর্বেসর্বা হইয়া ছেলেকে স্বেচ্ছামতো চালাইয়াছে। হরলালের প্রতিই ইশারা করিয়া যে এসকল কথা বলা হইতেছিল তাহা হরলালের বুঝিতে বাকি ছিল না। তবু সে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, আজ বেণুর মার কথা শুনিয়া তাহার বুক ভাঙিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল, বড়োমানুষের ঘরে মাস্টারের পদবীটা কী। গোয়ালঘরে ছেলেকে দুধ জোগাইবার যেমন গোরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাস্টারও রাখা হইয়াছে— ছাত্রের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধ-স্থাপন এতবড়ো একটা স্পর্ধা যে বাড়ির চাকর হইতে গৃহিণী পর্যন্ত কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না, এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থসাধনের একটা চাতুরী বলিয়াই জানে।

হরলাল কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মা, বেণুকে আমি কেবল পড়াইব, তাহার সঙ্গে আমার আর-কোনো সম্পর্ক থাকিবে না।"

সেদিন বিকালে বেণুর সঙ্গে তাহার খেলিবার সময়ে হরলাল কলেজ হইতে ফিরিলই না। কেমন করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া সে সময় কাটাইল তাহা সেই জানে। সন্ধ্যা হইলে যখন সে পড়াইতে আসিল তখন বেণু মুখ ভার করিয়া রহিল। হরলাল তাহার অনুপস্থিতির কোনো জবাবদিহি না করিয়া পড়াইয়া গেল— সেদিন পড়া সুবিধামতো হইলই না।

হরলাল প্রতিদিন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া তাহার ঘরে বসিয়া পড়া করিত। বেণু সকালে উঠিয়াই মুখ ধুইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া যাইত। বাগানে বাঁধানো চৌবাচ্ছায় মাছ ছিল। তাহাদিগকে মুড়ি খাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। বাগানের এক কোণে কতকগুলা পাথর সাজাইয়া, ছোটো ছোটো রাস্তা ও ছোটো গেট ও বেড়া তৈরি করিয়া বেণু বালখিল্য ঋষির আশ্রমের উপযুক্ত একটি অতি ছোটো বাগান বসাইয়াছিল। সে বাগানে মালির কোনো অধিকার ছিল না। সকালে এই বাগানের চর্চা করা তাহাদের দ্বিতীয় কাজ। তাহার পরে রৌদ্র বেশি হইলে বাড়ি ফিরিয়া বেণু হরলালের কাছে পড়িতে বসিত। কাল সায়াহ্নে যে গল্পের অংশ শোনা হয় নাই সেইটে শুনিবার জন্য আজ বেণু যথাসাধ্য ভোরে উঠিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, সকালে ওঠায় সে আজ মাস্টারমশায়কে বুঝি জিতিয়াছে। ঘরে আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায় নাই। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, মাস্টারমশায় বাহির হইয়া গিয়াছেন।

সেদিনও সকালে পড়ার সময় বেণু ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর বেদনা লইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। সকালবেলায় হরলাল কেন যে বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসাও করিল না। হরলাল বেণুর মুখের দিকে না চাহিয়া বইয়ের পাতার উপর চোখ রাখিয়া পড়াইয়া গেল। বেণু বাড়ির ভিতরে তাহার মার কাছে যখন খাইতে বসিল তখন তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল বিকাল হইতে তোর কী হইয়াছে বল্ দেখি। মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস কেন— ভালো করিয়া খাইতেছিস না— ব্যাপারখানা কী।"

বেণু কোনো উত্তর করিল না। আহারের পর মা তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদর করিয়া যখন তাহাকে বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তখন সে আর থাকিতে পারিল না, ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "মাস্টারমশায়—"

মা কহিলেন, "মাস্টারমশায় কী।"

বেণু বলিতে পারিল না মাস্টারমশায় কী করিয়াছেন। কী যে অভিযোগ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।

ননীবালা কহিলেন, "মাস্টারমশায় বুঝি তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন!"

সে কথার কোনো অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বেণু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

৫

ইতিমধ্যে বাড়িতে অধরবাবুর কতকগুলো কাপড়চোপড় চুরি হইয়া গেল। পুলিসকে খবর দেওয়া হইল। পুলিস খানাতল্লাসিতে হরলালেরও বাক্স সন্ধান করিতে ছাড়িল না। রতিকান্ত নিতান্তই নিরীহভাবে বলিল, "যে লোক লইয়াছে সে কি আর মাল বাক্সর মধ্যে রাখিয়াছে।"

মালের কোনো কিনারা হইল না। এরূপ লোকসান অধরলালের পক্ষে অসহ্য। তিনি পৃথিবীসুদ্ধ লোকের উপর চটিয়া উঠিলেন। রতিকান্ত কহিল, "বাড়িতে অনেক লোক রহিয়াছে, কাহাকেই বা দোষ দিবেন, কাহাকেই বা সন্দেহ করিবেন। যাহার যখন খুশি আসিতেছে যাইতেছে।"

অধরলাল মাস্টারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখো হরলাল, তোমাদের কাহাকেও বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে সুবিধা হইবে না। এখন হইতে তুমি আলাদা বাসায় থাকিয়া বেণুকে ঠিক সময়মতো পড়াইয়া যাইবে, এই হইলেই ভালো হয়—নাহয় আমি তোমার দুই টাকা মাইনে বৃদ্ধি করিয়া দিতে রাজি আছি।"

রতিকান্ত তামাক টানিতে টানিতে বলিল, "এ তো অতি ভালো কথা—উভয় পক্ষেই ভালো।"

হরলাল মুখ নিচু করিয়া শুনিল। তখন কিছু বলিতে পারিল না। ঘরে আসিয়া অধরবাবুকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, নানা কারণে বেণুকে পড়ানো তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না, অতএব আজই সে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সেদিন বেণু ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায়ের ঘর শূন্য। তাঁহার সেই ভগ্নপ্রায় টিনের পেঁট্‌রাটিও নাই। দড়ির উপর তাঁহার চাদর ও গামছা ঝুলিত, সে দড়িটা আছে কিন্তু চাদর ও গামছা নাই। টেবিলের উপর খাতাপত্র ও বই এলোমেলো ছড়ানো থাকিত, তাহার বদলে সেখানে একটা বড়ো বোতলের মধ্যে সোনালি মাছ ঝক্‌ঝক্ করিতে করিতে ওঠানামা করিতেছে। বোতলের গায়ের উপর মাস্টারমশায়ের হস্তাক্ষরে বেণুর নাম-লেখা একটা কাগজ আঁটা। আর-একটি নূতন ভালো বাঁধাই করা ইংরেজি ছবির বই, তাহার ভিতরকার পাতায় এক প্রান্তে বেণুর নাম ও তাহার নীচে আজকের তারিখ মাস ও সন দেওয়া আছে।

বেণু ছুটিয়া তাহার বাপের কাছে গিয়া কহিল, "বাবা, মাস্টারমশায় কোথায় গেছেন?"

বাপ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেছেন।"

বেণু বাপের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশের ঘরে বিছানার উপরে উপুড় হইয়া

পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অধরবাবু ব্যাকুল হইয়া কী করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় হরলাল একটা মেসের ঘরে তক্তপোশের উপর উন্মনা হইয়া বসিয়া কলেজে যাইবে কি না ভাবিতেছে, এমন সময় হঠাৎ দেখিল, প্রথমে অধরবাবুদের দরোয়ান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছনে বেণু ঘরে ঢুকিয়াই হরলালের গলা জড়াইয়া ধরিল। হরলালের গলার স্বর আটকাইয়া গেল; কথা কহিতে গেলেই তাহার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িবে, এই ভয়ে সে কোনো কথাই কহিতে পারিল না।

বেণু কহিল, "মাস্টারমশায়, আমাদের বাড়ি চলো।"

বেণু তাহাদের বৃদ্ধ দরোয়ান চন্দ্রভানকে ধরিয়া পড়িয়াছিল, যেমন করিয়া হউক, মাস্টারমশায়ের বাড়িতে তাহাকে লইয়া যাইতে হইবে। পাড়ার যে মুটে হরলালের পেঁটরা বহিয়া আনিয়াছিল তাহার কাছ হইতে সন্ধান লইয়া আজ ইস্কুলে যাইবার গাড়িতে চন্দ্রভান বেণুকে হরলালের মেসে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

কেন যে হরলালের পক্ষে বেণুদের বাড়ি যাওয়া একেবারেই অসম্ভব, তাহা সে বলিতেও পারিল না অথচ তাহাদের বাড়িতেও যাইতে পারিল না। বেণু যে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বলিয়াছিল 'আমাদের বাড়ি চলো', এই স্পর্শ ও এই কথাটার স্মৃতি কত দিনে কত রাত্রে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়াছে। কিন্তু ক্রমে এমনও দিন আসিল যখন দুই পক্ষেই সমস্ত চুকিয়া গেল, বক্ষের শিরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বেদনা নিশাচর বাদুড়ের মতো আর ঝুলিয়া রহিল না।

৬

হরলাল অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন করিয়া মনোযোগ করিতে পারিল না। সে কোনোমতেই স্থির হইয়া পড়িতে বসিতে পারিত না। খানিকটা পড়িবার চেষ্টা করিয়াই ধাঁ করিয়া বই বন্ধ করিয়া ফেলিত এবং অকারণে দ্রুতপদে রাস্তায় ঘুরিয়া আসিত। কলেজে লেক্‌চারের নোটের মাঝে মাঝে খুব বড়ো বড়ো ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে যে-সমস্ত আঁকজোক পড়িত তাহার সঙ্গে প্রাচীন ঈজিপ্টের চিত্রলিপি ছাড়া আর কোনো বর্ণমালার সাদৃশ্য ছিল না।

হরলাল বুঝিল, এ-সমস্ত ভালো লক্ষণ নয়। পরীক্ষায় সে যদি-বা পাস হয়, বৃত্তি পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বৃত্তি না পাইলে কলিকাতায় তাহার একদিনও চলিবে না। ও দিকে দেশে মাকেও দু-চার টাকা পাঠানো চাই। নানা চিন্তা করিয়া চাকরির চেষ্টায় বাহির হইল। চাকরি পাওয়া কঠিন, কিন্তু না-পাওয়া তাহার পক্ষে আরও কঠিন; এইজন্য আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িতে পারিল না।

হরলালের সৌভাগ্যক্রমে একটি বড়ো ইংরেজ সদাগরের আপিসে উমেদারি করিতে গিয়া হঠাৎ সে বড়ো সাহেবের নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল, তিনি মুখ দেখিয়া লোক চিনিতে পারেন। হরলালকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে দু-চার কথা কহিয়াই তিনি মনে-মনে বলিলেন, 'এ লোকটা চলিবে।' জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাজ জানা আছে?" হরলাল কহিল, "না।" "জামিন দিতে পারিবে?" তাহার উত্তরেও "না।" "কোনো

বড়োলোকের কাছ হইতে সার্টিফিকেট আনিতে পার?" কোনো বড়োলোককেই সে জানে না।

শুনিয়া সাহেব আরও যেন খুশি হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা বেশ, পঁচিশ টাকা বেতনে কাজ আরম্ভ করো, কাজ শিখিলে উন্নতি হইবে।" তার পরে সাহেব তাহার বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "পনেরো টাকা আগাম দিতেছি, আপিসের উপযুক্ত কাপড় তৈরি করাইয়া লইবে।"

কাপড় তৈরি হইল, হরলাল আপিসেও বাহির হইতে আরম্ভ করিল। বড়ো সাহেব তাহাকে ভূতের মতো খাটাইতে লাগিলেন। অন্য কেরানিরা বাড়ি গেলেও হরলালের ছুটি ছিল না। এক-একদিন সাহেবের বাড়ি গিয়াও তাঁহাকে কাজ বুঝাইয়া দিয়া আসিতে হইত।

এমনি করিয়া কাজ শিখিয়া লইতে হরলালের বিলম্ব হইল না। তাহার সহযোগী কেরানিরা তাহাকে ঠকাইবার অনেক চেষ্টা করিল, তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগিও করিল, কিন্তু এই নিঃশব্দ নিরীহ সামান্য হরলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না।

যখন তাহার চল্লিশ টাকা মাহিনা হইল, তখন হরলাল দেশ হইতে মাকে আনিয়া একটি ছোটোখাটো গলির মধ্যে ছোটোখাটো বাড়িতে বাসা করিল। এত দিন পরে তাহার মার দুঃখ ঘুচিল। মা বলিলেন, "বাবা, এইবার বউ ঘরে আনিব।"

হরলাল মাতার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, "মা, ওইটে মাপ করিতে হইবে।"

মাতার আর-একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিলেন, "তুই যে দিনরাত তোর ছাত্র বেণুগোপালের গল্প করিস, তাহাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়া। তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে।"

হরলাল কহিল, "মা, এ বাসায় তাহাকে কোথায় বসাইব। রোসো, একটা বড়ো বাসা করি, তাহার পরে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব।"

৭

হরলালের বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে ছোটো গলি হইতে বড়ো গলি ও ছোটো বাড়ি হইতে বড়ো বাড়িতে তাহার বাস-পরিবর্তন হইল। তবু সে কী জানি কী মনে করিয়া, অধরলালের বাড়ি যাইতে বা বেণুকে নিজের বাসায় ডাকিয়া আনিতে কোনোমতেই মন স্থির করিতে পারিল না।

হয়তো কোনোদিনই তাহার সংকোচ ঘুচিত না। এমন সময়ে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, বেণুর মা মারা গিয়াছেন। শুনিয়া মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া সে অধরলালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

এই দুই অসমবয়সী বন্ধুতে অনেক দিন পরে আবার একবার মিলন হইল। বেণুর অশৌচের সময় পার হইয়া গেল, তবু এ বাড়িতে হরলালের যাতায়াত চলিতে লাগিল। কিন্তু, ঠিক তেমনটি আর কিছুই নাই। বেণু এখন বড়ো হইয়া উঠিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী যোগে তাহার নূতন গোঁফের রেখার সাধ্যসাধনা করিতেছে। চাল-চলনে বাবুয়ানা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার উপযুক্ত বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নাই।

ফোনোগ্রাফে থিয়েটারের নটীদের ইতর গান বাজাইয়া সে বন্ধুমহলকে আমোদে রাখে। পড়িবার ঘরে সেই সাবেক ভাঙা চৌকি ও দাগি টেবিল কোথায় গেল। আয়নাতে, ছবিতে, আসবাবে ঘর যেন ছাতি ফুলাইয়া রহিয়াছে। বেণু এখন কলেজে যায় কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিকের সীমানা পার হইবার জন্য তাহার কোনো তাগিদ দেখা যায় না। বাপ স্থির করিয়া আছেন, দুই-একটা পাস করাইয়া লইয়া বিবাহের হাটে ছেলের বাজারদর বাড়াইয়া তুলিবেন। কিন্তু, ছেলের মা জানিতেন ও স্পষ্ট করিয়া বলিতেন, "আমার বেণুকে সামান্য লোকের ছেলের মতো গৌরব প্রমাণ করিবার জন্য পাসের হিসাব দিতে হইবে না—লোহার সিন্দুকে কোম্পানির কাগজ অক্ষয় হইয়া থাক্।" ছেলেও মাতার এ কথাটা বেশ করিয়া মনে-মনে বুঝিয়া লইয়াছিল।

যাহা হউক, বেণুর পক্ষে সে যে আজ নিতান্তই অনাবশ্যক তাহা হরলাল স্পষ্টই বুঝিতে পারিল এবং কেবলই থাকিয়া থাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল যেদিন বেণু হঠাৎ সকালবেলায় তাহার সেই মেসের বাসায় গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল 'মাস্টারমশায়, আমাদের বাড়ি চলো।' সে বেণু নাই, সে বাড়ি নাই, এখন মাস্টারমশায়কে কেই বা ডাকিবে।

হরলাল মনে করিয়াছিল, এইবার বেণুকে তাহাদের বাসায় মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আহ্বান করিবার জোর পাইল না। একবার ভাবিল 'উহাকে আসিতে বলিব', তাহার পরে ভাবিল 'বলিয়া লাভ কী—বেণু হয়তো নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে, কিন্তু থাক্'।

হরলালের মা ছাড়িলেন না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি নিজের হাতে রাঁধিয়া তাহাকে খাওয়াইবেন—'আহা, বাছার মা মারা গেছে!'

অবশেষে হরলাল একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। কহিল, "অধরবাবুর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া আসি।"

বেণু কহিল, "অনুমতি লইতে হইবে না, আপনি কি মনে করেন আমি এখনো সেই খোকাবাবু আছি।"

হরলালের বাসায় বেণু খাইতে আসিল। মা এই কার্তিকের মতো ছেলেটিকে তাঁহার দুই স্নিগ্ধ চক্ষুর আশীর্বাদে অভিষিক্ত করিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, 'আহা, এই বয়সের এমন ছেলেকে ফেলিয়া ইহার মা যখন মরিল তখন তাহার প্রাণ না জানি কেমন করিতেছিল।'

আহার সারিয়াই বেণু কহিল, "মাস্টারমশায়, আমাকে আজ একটু সকাল-সকাল যাইতে হইবে। আমার দুই-একজন বন্ধুর আসিবার কথা আছে।"

বলিয়া পকেট হইতে সোনার ঘড়ি খুলিয়া একবার সময় দেখিয়া লইল; তাহার পরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়িগাড়িতে চড়িয়া বসিল। হরলাল তাহার বাসার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কাঁপাইয়া দিয়া মুহূর্তের মধ্যেই চোখের বাহির হইয়া গেল।

মা কহিলেন, "হরলাল, উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়া আনিস। এই বয়সে উহার মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। এই মাতৃহীন ছেলেটিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে কোনো প্রয়োজন বোধ করিল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে-মনে কহিল, 'বাস্, এই

পর্যন্ত। আর-কখনও ডাকিব না। একদিন পাঁচ টাকা মাইনের মাস্টারি করিয়াছিলাম বটে— কিন্তু, আমি সামান্য হরলাল মাত্র।'

৮

একদিন সন্ধ্যার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার একতলার ঘরে অন্ধকারে কে একজন বসিয়া আছে। সেখানে যে কোনো লোক আছে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই সে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত, কিন্তু দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল এসেন্সের গন্ধে আকাশ পূর্ণ। ঘরে প্রবেশ করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কে, মশায়।"

বেণু বলিয়া উঠিল, "মাস্টারমশায়, আমি।"

হরলাল কহিল, "এ কী ব্যাপার। কখন আসিয়াছ।"

বেণু কহিল, "অনেকক্ষণ আসিয়াছি। আপনি যে এত দেরি করিয়া আপিস হইতে ফেরেন, তাহা তো আমি জানিতাম না।"

বহুকাল হইল সেই-যে নিমন্ত্রণ খাইয়া গেছে তাহার পরে আর একবারও বেণু এ বাসায় আসে নাই। বলা নাই, কহা নাই, আজ হঠাৎ এমন করিয়া সে যে সন্ধ্যার সময় এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে হরলালের মন উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল।

উপরের ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিয়া দুইজনে বসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "সব ভালো তো? কিছু বিশেষ খবর আছে?"

বেণু কহিল, পড়াশুনা ক্রমে তাহার পক্ষে বড়োই একঘেয়ে হইয়া আসিয়াছে। কাঁহাতক সে বৎসরের পর বৎসর ওই সেকেন্ড্‌ ইয়ারেই আটকা পড়িয়া থাকে! তাহার চেয়ে অনেক বয়সে ছোটো ছেলের সঙ্গে তাহাকে একসঙ্গে পড়িতে হয়, তাহার বড়ো লজ্জা করে। কিন্তু বাবা কিছুতেই বোঝেন না।

হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কী ইচ্ছা।"

বেণু কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যায়, বারিস্টার হইয়া আসে। তাহারই সঙ্গে একসঙ্গে পড়িত, এমন-কি, তাহার চেয়ে পড়াশুনায় অনেক কাঁচা, একটি ছেলে বিলাতে যাইবে স্থির হইয়া গেছে।

হরলাল কহিল, "তোমার বাবাকে তোমার ইচ্ছা জানাইয়াছ?"

বেণু কহিল, "জানাইয়াছি। বাবা বলেন, পাস না করিলে বিলাতে যাইবার প্রস্তাব তিনি কানে আনিবেন না। কিন্তু আমার মন খারাপ হইয়া গেছে— এখানে থাকিলে আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব না।"

হরলাল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বেণু কহিল, "আজ এই কথা লইয়া বাবা আমাকে যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছেন। তাই আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মা থাকিলে এমন কখনোই হইতে পারিত না।" বলিতে বলিতে সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।

হরলাল কহিল, "চলো, আমি-সুদ্ধ তোমার বাবার কাছে যাই, পরামর্শ করিয়া যাহা ভালো হয় স্থির করা যাইবে।"

বেণু কহিল, "না, আমি সেখানে যাইব না।"

বাপের সঙ্গে রাগারাগি করিয়া হরলালের বাড়িতে আসিয়া বেণু থাকিবে, এ কথাটা হরলালের মোটেই ভালো লাগিল না। অথচ 'আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না' এ কথা বলাও বড়ো শক্ত।

হরলাল ভাবিল, 'আর-একটু বাদে মনটা একটু ঠাণ্ডা হইলেই ইহাকে ভুলাইয়া বাড়ি লইয়া যাইব।' জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণু কহিল, "না, আমার ক্ষুধা নাই, আমি আজ খাইব না।"

হরলাল কহিল, "সে কি হয়।" তাড়াতাড়ি মাকে গিয়া কহিল, "মা, বেণু আসিয়াছে, তাহার জন্য কিছু খাবার চাই।"

শুনিয়া মা ভারি খুশি হইয়া খাবার তৈরি করিতে গেলেন। হরলাল আপিসের কাপড় ছাড়িয়া মুখ হাত ধুইয়া বেণুর কাছে আসিয়া বসিল। একটুখানি কাশিয়া, একটুখানি ইতস্তত করিয়া, সে বেণুর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কহিল, "বেণু, কাজটা ভালো হইতেছে না। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসা, এটা তোমার উপযুক্ত নয়।"

শুনিয়া তখনই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেণু কহিল, "আপনার এখানে যদি সুবিধা না হয়, আমি সতীশের বাড়ি যাইব।"

বলিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। হরলাল তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "রোসো, কিছু খাইয়া যাও।"

বেণু রাগ করিয়া কহিল, "না, আমি খাইতে পারিব না।" বলিয়া হাত ছাড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এমন সময়, হরলালের জন্য যে জলখাবার প্রস্তুত ছিল তাহাই বেণুর জন্য থালায় গুছাইয়া মা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, "কোথায় যাও, বাছা!"

বেণু কহিল, "আমার কাজ আছে, আমি চলিলাম।"

মা কহিলেন, "সে কি হয় বাছা, কিছু না খাইয়া যাইতে পারিবে না।" এই বলিয়া সেই বারান্দায় পাত পাড়িয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া খাইতে বসাইলেন।

বেণু রাগ করিয়া কিছু খাইতেছে না, খাবার লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিতেছে মাত্র, এমন সময় দরজার কাছে একটা গাড়ি আসিয়া থামিল। প্রথমে [illegible] ও তাহার পশ্চাতে স্বয়ং অধরবাবু মচ্‌মচ্‌ শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মা ঘরের মধ্যে সরিয়া গেলেন। অধর ছেলের সম্মুখে আসিয়া ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে হরলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই বুঝি! রতিকান্ত আমাকে তখনই বলিয়াছিল, কিন্তু তোমার পেটে যে এত মতলব ছিল তাহা আমি বিশ্বাস করি নাই। তুমি মনে করিয়াছ, বেণুকে বশ করিয়া উহার ঘাড় ভাঙিয়া খাইবে! কিন্তু, সে হইতে দিব না। ছেলে চুরি করিবে! তোমার নামে পুলিস-কেস করিব, তোমাকে জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব।"

এই বলিয়া বেণুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "চল্‌। ওঠ্‌।" বেণু কোনো কথাটি না কহিয়া তাহার বাপের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

সেদিন কেবল হরলালের মুখেই খাবার উঠিল না।

৯

এবারে হরলালের সদাগর-আপিস কী জানি কী কারণে মফস্বল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল ডাল খরিদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হরলালকে প্রতি সপ্তাহেই শনিবার ভোরের গাড়িতে সাত-আট হাজার টাকা লইয়া মফস্বলে যাইতে হইত। পাইকেরদিগকে হাতে হাতে দাম চুকাইয়া দিবার জন্য মফস্বলের একটা বিশেষ কেন্দ্রে তাহাদের যে আপিস আছে সেইখানে দশ ও পাঁচ টাকার নোট ও নগদ টাকা লইয়া সে যাইত, সেখানে রসিদ ও খাতা দেখিয়া গত সপ্তাহের মোটা হিসাব মিলাইয়া, বর্তমান সপ্তাহের কাজ চালাইবার জন্য টাকা রাখিয়া আসিত। সঙ্গে আপিসের দুইজন দরোয়ান যাইত। হরলালের জামিন নাই বলিয়া আপিসে একটা কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু বড়োসাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া বলিয়াছিলেন— হরলালের জামিনের প্রয়োজন নাই।

মাঘ মাস হইতে এইভাবে কাজ চলিতেছে, চৈত্র পর্যন্ত চলিবে এমন সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপার লইয়া হরলাল বিশেষ ব্যস্ত ছিল। প্রায়ই তাহাকে অনেক রাত্রে আপিস হইতে ফিরিতে হইত।

একদিন এইরূপ রাত্রে ফিরিয়া শুনিল, বেণু আসিয়াছিল, মা তাহাকে খাওয়াইয়া যত্ন করিয়া বসাইয়াছিলেন। সেদিন তাহার সঙ্গে কথাবার্তা গল্প করিয়া তাহার প্রতি তাঁহার মন আরও স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছে।

এমন আরও দুই-একদিন হইতে লাগিল। মা বলিলেন, "বাড়িতে মা নাই নাকি, সেইজন্য সেখানে তাহার মন টেঁকে না। আমি বেণুকে তোর ছোটো ভাইয়ের মতো, আপন ছেলের মতোই দেখি। সেই স্নেহ পাইয়া আমাকে কেবল মা বলিয়া ডাকিবার জন্য এখানে আসে।" এই বলিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।

হরলালের একদিন বেণুর সঙ্গে দেখা হইল। সেদিন সে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল। অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা হইল। বেণু বলিল, "বাবা আজকাল এমন হইয়া উঠিয়াছেন যে আমি কিছুতেই বাড়িতে টিঁকিতে পারিতেছি না। বিশেষত শুনিতে পাইতেছি তিনি বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রতিবাবু সম্বন্ধ লইয়া আসিতেছেন— তাঁহার সঙ্গে কেবলই পরামর্শ চলিতেছে। পূর্বে আমি কোথাও গিয়া দেরি করিলে বাবা অস্থির হইয়া উঠিতেন, এখন যদি আমি দুই-চারিদিন বাড়িতে না ফিরি তাহা হইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি থাকিলে বিবাহের আলোচনা সাবধানে করিতে হয় বলিয়া আমি না থাকিলে তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এ বিবাহ যদি হয় তবে আমি বাড়িতে থাকিতে পারিব না। আমাকে আপনি উদ্ধারের একটা পথ দেখাইয়া দিন— আমি স্বতন্ত্র হইতে চাই।"

স্নেহে ও বেদনায় হরলালের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সংকটের সময় আর সকলকে ফেলিয়া বেণু যে তাহার সেই মাস্টারমশায়ের কাছে আসিয়াছে, ইহাতে কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু মাস্টারমশায়ের কতটুকুই বা সাধ্য আছে!

বেণু কহিল, "যেমন করিয়া হোক, বিলাতে গিয়া ব্যারিস্টার হইয়া আসিলে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই।"

হরলাল কহিল, "অধরবাবু কি যাইতে দিবেন।"

বেণু কহিল, "আমি চলিয়া গেলে তিনি বাঁচেন। কিন্তু টাকার উপরে যেরকম মায়া, বিলাতের খরচ তাঁহার কাছ হইতে সহজে আদায় হইবে না। একটু কৌশল করিতে হইবে।"

হরলাল বেণুর বিজ্ঞতা দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "কী কৌশল।"

বেণু কহিল, "আমি হ্যান্ড্‌নোটে টাকা ধার করিব। পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাবা তখন দায়ে পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পালাইয়া বিলাত যাইব। সেখানে গেলে তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

হরলাল কহিল, "তোমাকে টাকা ধার দিবে কে।"

বেণু কহিল, "আপনি পারেন না?"

হরলাল আশ্চর্য হইয়া কহিল, "আমি!" তাহার মুখে আর কোনো কথা বাহির হইল না।

বেণু কহিল, "কেন, আপনার দরোয়ান তো তোড়ায় করিয়া অনেক টাকা ঘরে আনিল।"

হরলাল হাসিয়া কহিল, "সে দরোয়ানও যেমন আমার, টাকাও তেমনি।"

বলিয়া এই আপিসের টাকার ব্যবহারটা কী তাহা বেণুকে বুঝাইয়া দিল। এই টাকা কেবল একটি রাত্রের জন্যই দরিদ্রের ঘরে আশ্রয় লয়, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন করে।

বেণু কহিল, "আপনাদের সাহেব আমাকে ধার দিতে পারেন না? নাহয় আমি সুদ বেশি করিয়া দিব।"

হরলাল কহিল, "তোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন তাহা হইলে আমার অনুরোধে হয়তো দিতেও পারেন।"

বেণু কহিল, "বাবা যদি সিকিউরিটি দিবেন তো টাকা দিবেন না কেন।"

তর্কটা এইখানেই মিটিয়া গেল। হরলাল মনে-মনে ভাবিতে লাগিল, 'আমার যদি কিছু থাকিত, তবে বাড়িঘর জমিজমা সমস্ত বেচিয়া-কিনিয়া টাকা দিতাম।' কিন্তু একটিমাত্র অসুবিধা এই যে, বাড়িঘর জমিজমা কিছুই নাই।

১০

একদিন শুক্রবার রাত্রে হরলালের বাসার সম্মুখে জুড়িগাড়ি দাঁড়াইল। বেণু গাড়ি হইতে নামিবামাত্র হরলালের আপিসের দরোয়ান তাহাকে মস্ত একটা সেলাম করিয়া উপরে বাবুকে শশব্যস্ত হইয়া সংবাদ দিতে গেল। হরলাল তখন তাহার শোবার ঘরে মেজের উপর বসিয়া টাকা মিলাইয়া লইতেছিল। বেণু সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশ কিছু নূতন ধরনের। শৌখিন ধুতিচাদরের বদলে নধর শরীরে *পার্শি কোট ও প্যান্টলুন আঁটিয়া মাথায় ক্যাপ পরিয়া আসিয়াছে।* তাহার দুই হাতের আঙুলে মণিমুক্তার আংটি ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। গলা হইতে লম্বিত মোটা সোনার চেনে আবদ্ধ ঘড়ি বুকের পকেটে নিবিষ্ট। কোটের আস্তিনের ভিতর হইতে জামার হাতায় হীরার বোতাম দেখা যাইতেছে।

হরলাল টাকা গোনা বন্ধ করিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, "এ কী ব্যাপার। এত রাত্রে এ বেশে যে!"

বেণু কহিল, "পরশু বাবার বিবাহ। তিনি আমার কাছে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমি খবর পাইয়াছি। বাবাকে বলিলাম, আমি কিছুদিনের জন্য আমাদের বারাকপুরের বাগানে যাইব। শুনিয়া তিনি ভারি খুশি হইয়া রাজি হইয়াছেন। তাই বাগানে চলিয়াছি। ইচ্ছা হইতেছে, আর ফিরিব না। যদি সাহস থাকিত তবে গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতাম।"

বলিতে বলিতে বেণু কাঁদিয়া ফেলিল। হরলালের বুকে যেন ছুরি বিঁধিতে লাগিল। একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া বেণুর মার ঘর, মার খাট, মার স্থান অধিকার করিয়া লইলে, বেণুর স্নেহস্মৃতিজড়িত বাড়ি যে বেণুর পক্ষে কিরকম কণ্টকময় হইয়া উঠিবে তাহা হরলাল সমস্ত হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিল। মনে-মনে ভাবিল, পৃথিবীতে গরিব হইয়া না জন্মিলেও দুঃখের এবং অপমানের অন্ত নাই। বেণুকে কী বলিয়া যে সান্ত্বনা দিবে তাহা কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বেণুর হাতখানা নিজের হাতে লইল। লইবামাত্র একটা তর্ক তাহার মনে উদয় হইল। সে ভাবিল, এমন একটা বেদনার সময় বেণু কী করিয়া এত সাজ করিতে পারিল।

হরলাল তাহার আংটির দিকে চোখ রাখিয়াছে দেখিয়া বেণু যেন তাহার মনের প্রশ্নটা আঁচিয়া লইল। সে বলিল, "এই আংটিগুলি আমার মায়ের।"

শুনিয়া হরলাল বহু কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "বেণু, খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণু কহিল, "হাঁ— আপনার খাওয়া হয় নাই?"

হরলাল কহিল, "টাকাগুলি গুনিয়া আয়রন-চেস্টে না তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না।"

বেণু কহিল, "আপনি খাইয়া আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি ঘরে রহিলাম; মা আপনার খাবার লইয়া বসিয়া আছেন।"

হরলাল একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "আমি চট্ করিয়া খাইয়া আসিতেছি।"

হরলাল তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া মাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বেণু তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি বেণুর চিবুকের স্পর্শ লইয়া চুম্বন করিলেন। হরলালের কাছে সমস্ত খবর পাইয়া তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নিজের সমস্ত স্নেহ দিয়াও বেণুর অভাব তিনি পূরণ করিতে পারিবেন না, এই তাঁহার দুঃখ।

চারি দিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে তিনজনে বসিয়া বেণুর ছেলেবেলাকার গল্প হইতে লাগিল। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে জড়িত তাহার কত দিনের কত ঘটনা। তাহার মাঝে মাঝে সেই অসংযতস্নেহশালিনী মার কথাও আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এমনি করিয়া রাত অনেক হইয়া গেল। হঠাৎ একসময়ে ঘড়ি খুলিয়া বেণু কহিল, "আর নয়, দেরি করিলে গাড়ি ফেল করিব।"

হরলালের মা কহিলেন, "বাবা, আজ রাত্রে এইখানেই থাকো-না, কাল সকালে হরলালের সঙ্গে একসঙ্গেই বাহির হইবে।"

বেণু মিনতি করিয়া কহিল, "না মা, এ অনুরোধ করিবেন না, আজ রাত্রে যে করিয়া হউক আমাকে যাইতেই হইবে।"

হরলালকে কহিল, "মাস্টারমশায়, এই আংটিঘড়িগুলো বাগানে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনার কাছেই রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইব। আপনার দরোয়ানকে বলিয়া দিন, আমার গাড়ি হইতে চামড়ার হ্যান্ডব্যাগটা আনিয়া দিক। সেইটের মধ্যে এগুলো রাখিয়া দিই।"

আপিসের দরোয়ান গাড়ি হইতে ব্যাগ লইয়া আসিল। বেণু তাহার চেন ঘড়ি আংটি বোতাম সমস্ত খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া দিল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লইয়া তখনই আয়রন-সেফের মধ্যে রাখিল।

বেণু হরলালের মার পায়ের ধুলা লইল। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন, "মা জগদম্বা তোমার মা হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন।"

তাহার পরে বেণু হরলালের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। আর-কোনো দিন সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম করে নাই। হরলাল কোনো কথা না বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিল। গাড়ির লণ্ঠনে আলো জ্বলিল, ঘোড়া দুটা অধীর হইয়া উঠিল। কলিকাতার গ্যাসালোকখচিত নিশীথের মধ্যে বেণুকে লইয়া গাড়ি অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরলাল তাহার ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া টাকা গনিতে গনিতে ভাগ করিয়া এক-একটা থলিতে ভরতি করিতে লাগিল। নোটগুলো পূর্বেই গনা হইয়া থলিবন্দি হইয়া লোহার সিন্দুকে উঠিয়াছিল।

১১

লোহার সিন্দুকের চাবি মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া সেই টাকার ঘরেই হরলাল অনেক রাত্রে শয়ন করিল। ভালো ঘুম হইল না। স্বপ্নে দেখিল— বেণুর মা পর্দার আড়াল হইতে তাহাকে উচ্চস্বরে তিরস্কার করিতেছেন; কথা কিছুই স্পষ্ট শুনা যাইতেছে না, কেবল সেই অনির্দিষ্ট কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে বেণুর মার চুনি-পান্না-হীরার অলংকার হইতে লাল সবুজ শুভ্র রশ্মির সূচিগুলি কালো পর্দাটাকে ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। হরলাল প্রাণপণে বেণুকে ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে কী একটা ভাঙিয়া পর্দা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল— চমকিয়া চোখ মেলিয়া হরলাল দেখিল একটা স্তূপাকার অন্ধকার। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া সশব্দে জানলায় ঠেলা দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়াছে। হরলালের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই দিয়া আলো জ্বালিল। ঘড়িতে দেখিল চারটে বাজিয়াছে। আর ঘুমাইবার সময় নাই— টাকা লইয়া মফস্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হরলাল মুখ ধুইয়া ফিরিবার সময় মা তাঁহার ঘর হইতে কহিলেন, "কী বাবা, উঠিয়াছিস?"

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মঙ্গলমুখ দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। মা তাহার প্রণাম লইয়া মনে-মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি এইমাত্র

স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তুই যেন বউ আনিতে চলিয়াছিস। ভোরের স্বপন কি মিথ্যা হইবে!"

হরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাকা ও নোটের থলেগুলো লোহার সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া প্যাকবাক্সয় বন্ধ করিবার জন্য উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বুকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল—দুই-তিনটা নোটের থলি শূন্য! মনে হইল স্বপন দেখিতেছে। থলেগুলো লইয়া সিন্দুকের গায়ে জোরে আছাড় দিল—তাহাতে শূন্য থলের শূন্যতা অপ্রমাণ হইল না। তবু বৃথা আশায় থলের বন্ধনগুলো খুলিয়া খুব করিয়া ঝাড়া দিল, একটি থলের ভিতর হইতে দুইখানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। বেণুর হাতের লেখা—একটি চিঠি তাহার বাপের নামে, আর একটি হরলালের।

তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িতে গেল। চোখে যেন দেখিতে পাইল না। মনে হইল, যেন আলো যথেষ্ট নাই। কেবলই বাতি উসকাইয়া দিতে লাগিল। যাহা পড়ে তাহা ভালো বোঝে না, বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া গেছে।

কথাটা এই যে, বেণু তিন হাজার টাকার পরিমাণ দশটাকাওয়ালা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিয়াছে, আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবার কথা। হরলাল যে-সময় খাইতে গিয়াছিল সেই সময় বেণু এই কাণ্ড করিয়াছে। লিখিয়াছে যে, "বাবাকে চিঠি দিলাম, তিনি আমার এই ঋণ শোধ করিয়া দিবেন। তা ছাড়া ব্যাগ খুলিয়া দেখিবেন তাহার মধ্যে মায়ের যে গহনা আছে তাহার দাম কত ঠিক জানি না, বোধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হইবে। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বাবা আমাকে বিলাতে যাইবার টাকা না দিলেও এই গহনা দিয়াই নিশ্চয় মা আমাকে খরচ জোগাড় করিয়া দিতেন। আমার মায়ের গহনা বাবা যে আর-কাহাকেও দিবেন তাহা আমি সহ্য করিতে পারি না। সেইজন্য যেমন করিয়া পারি আমিই তাহা লইয়াছি। বাবা যদি টাকা দিতে দেরি করেন তবে আপনি অনায়াসে এই গহনা বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া টাকা লইতে পারিবেন। এ আমার মায়ের জিনিস—এ আমারই জিনিস।" এ ছাড়া আরো অনেক কথা—সে কোনো কাজের কথা নহে।

হরলাল ঘরে তালা দিয়া তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি লইয়া গঙ্গার ঘাটে ছুটিল। কোন্ জাহাজে বেণু যাত্রা করিয়াছে তাহার নামও সে জানে না। মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত ছুটিয়া হরলাল খবর পাইল দুইখানা জাহাজ ভোরে রওনা হইয়া গেছে। দুখানাই ইংলণ্ডে যাইবে। কোন্ জাহাজে বেণু আছে তাহাও তাহার অনুমানের অতীত এবং সে জাহাজ ধরিবার যে কী উপায় তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।

মেটিয়াবুরুজ হইতে তাহার বাসার দিকে যখন গাড়ি ফিরিল তখন সকালের রৌদ্রে কলিকাতা শহর জাগিয়া উঠিয়াছে। হরলালের চোখে কিছুই পড়িল না। তাহার সমস্ত হতবুদ্ধি অন্তঃকরণ একটা কলেবরহীন নিদারুণ প্রতিকূলতাকে যেন কেবলই প্রাণপণে ঠেলা মারিতেছিল—কিন্তু কোথাও এক তিলও তাহাকে টলাইতে পারিতেছিল না। যে বাসায় তাহার মা থাকেন, এতদিন যে বাসায় পা দিবামাত্র কর্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্লান্তি ও সংঘাতের বেদনা মুহূর্তের মধ্যেই তাহার দূর হইয়া গিয়াছে, সেই বাসার সম্মুখে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল—গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সেই বাসার মধ্যে সে অপরিমেয় নৈরাশ্য ও ভয় লইয়া প্রবেশ করিল।

মা উদ্‌বিগ্ন হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কোথায় গিয়াছিলে।"

হরলাল বলিয়া উঠিল "মা, তোমার জন্য বউ আনিতে গিয়াছিলাম।" বলিয়া শুষ্ককণ্ঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

"ও মা, কী হইল গো" বলিয়া মা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হরলাল চোখ খুলিয়া, শূন্যদৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া, উঠিয়া বসিল। হরলাল কহিল, "মা, তোমরা ব্যস্ত হইয়ো না। আমাকে একটু একলা থাকিতে দাও।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মা দরজার বাহিরে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন—ফাল্গুনের রৌদ্র তাঁহার সর্বাঙ্গে আসিয়া পড়িল। তিনি রুদ্ধ দরজার উপর মাথা রাখিয়া, থাকিয়া থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "হরলাল, বাবা হরলাল।"

হরলাল কহিল, "মা. একটু পরেই আমি বাহির হইব, এখন তুমি যাও।"

মা রৌদ্রে সেইখানেই বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন।

আপিসের দরোয়ান আসিয়া দরজায় ঘা দিয়া কহিল, "বাবু, এখনই না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না।"

হরলাল ভিতর হইতে কহিল, "আজ সাতটার গাড়িতে যাওয়া হইবে না।"

দরোয়ান কহিল, "তবে কখন যাইবেন।"

হরলাল কহিল, "সে আমি তোমাকে পরে বলিব।"

দরোয়ান মাথা নাড়িয়া হাত উল্টাইয়া নীচে চলিয়া গেল।

হরলাল ভাবিতে লাগিল, 'এ কথা বলি কাহাকে। এ যে চুরি! বেণুকে কি জেলে দিব।'

হঠাৎ সেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। মনে হইল, যেন কিনারা পাওয়া গেল। ব্যাগ খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে শুধু আংটি, ঘড়ি, বোতাম, হার নহে—ব্রেস্‌লেট, চিক, সিঁথি, মুক্তার মালা প্রভৃতি আরও অনেক দামি গহনা আছে। তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্তু এও তো চুরি। এও তো বেণুর নয়। এ ব্যাগ যতক্ষণ তাহার ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহার বিপদ।

তখন আর দেরি না করিয়া অধরলালের সেই চিঠি ও ব্যাগ লইয়া হরলাল ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাও, বাবা।"

হরলাল কহিল, "অধরবাবুর বাড়িতে।"

মার বুক হইতে হঠাৎ অনির্দিষ্ট ভয়ের একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন, ঐ-যে হরলাল কাল শুনিয়াছে বেণুর বাপের বিয়ে, তাই শুনিয়া অবধি বাছার মনে শান্তি নাই। আহা, বেণুকে কত ভালোই বাসে!

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তবে তোমার আর মফস্বলে যাওয়া হইবে না?"

হরলাল কহিল, "না।" বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অধরবাবুর বাড়ি পৌঁছিবার পূর্বেই দূর হইতে শোনা গেল রসনচৌকি আলেয়া রাগিণীতে করুণস্বরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু হরলাল দরজায় ঢুকিয়াই

দেখিল, বিবাহবাড়ির উৎসবের সঙ্গে একটা যেন অশান্তির লক্ষণ মিশিয়াছে। দরোয়ানের পাহারা কড়াক্কড়, বাড়ি হইতে চাকরবাকর কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না—সকলেরই মুখে ভয় ও চিন্তার ভাব। হরলাল খবর পাইল, কাল রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হইয়া গেছে। দুই-তিনজন চাকরকে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়া পুলিসের হাতে সমর্পণ করিবার উদ্‌যোগ হইতেছে।

হরলাল দোতালায় বারান্দায় গিয়া দেখিল, অধরবাবু আগুন হইয়া বসিয়া আছেন ও রতিকান্ত তামাক খাইতেছে। হরলাল কহিল, "আপনার সঙ্গে গোপনে আমার একটু কথা আছে।"

অধরবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোমার সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবার এখন আমার সময় নয়—যাহা কথা থাকে এইখানেই বলিয়া ফেল।"

তিনি ভাবিলেন, হরলাল বুঝি এই সময়ে তাঁহার কাছে সাহায্য বা ধার চাহিতে আসিয়াছে। রতিকান্ত কহিল, "আমার সামনে বাবুকে কিছু জানাইতে যদি লজ্জা করেন, আমি নাহয় উঠি।"

অধর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আঃ, বোসো-না।"

হরলাল কহিল, "কাল রাত্রে বেণু আমার বাড়িতে এই ব্যাগ রাখিয়া গেছে।"

অধর। ব্যাগে কী আছে।

হরলাল ব্যাগ খুলিয়া অধরবাবুর হাতে দিল।

অধর। মাস্টারে ছাত্রে মিলিয়া বেশ কারবার খুলিয়াছ তো! জানিতে, এ চোরাই মাল বিক্রি করিলে ধরা পড়িবে, তাই আনিয়া দিয়াছ—মনে করিতেছ, সাধুতার জন্য বকশিশ পাইবে?

তখন হরলাল অধরের পত্রখানা তাঁহার হাতে দিল। পড়িয়া তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমি পুলিসে খবর দিব। আমার ছেলে এখনো সাবালক হয় নাই—তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছ। হয়তো পাঁচশো টাকা ধার দিয়া তিন হাজার টাকা লিখাইয়া লইয়াছ। এ ধার আমি শুধিব না।"

হরলাল কহিল, "আমি ধার দিই নাই।"

অধর কহিলেন, "তবে সে টাকা পাইল কোথা হইতে। তোমার বাক্স ভাঙিয়া চুরি করিয়াছে?"

হরলাল সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। রতিকান্ত টিপিয়া টিপিয়া কহিল, "ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন-না, তিন হাজার টাকা কেন, পাঁচশো টাকাও উনি কি কখনো চক্ষে দেখিয়াছেন।"

যাহা হউক, গহনা চুরির মীমাংসা হওয়ার পরেই বেণুর বিলাত-পালানো লইয়া বাড়িতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। হরলাল সমস্ত অপরাধের ভার মাথায় করিয়া লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় যখন বাহির হইল তখন তাহার মন যেন অসাড় হইয়া গেছে। ভয় করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি তখন ছিল না। এই ব্যাপারের পরিণাম যে কী হইতে পারে মন তাহা চিন্তা করিতেও চাহিল না।

গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার বাড়ির সম্মুখে একটা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ আশা হইল, বেণু ফিরিয়া আসিয়াছে। নিশ্চয়ই বেণু!

তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নিরুপায়রূপে চূড়ান্ত হইয়া উঠিবে, এ কথা সে কোনো-মতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, গাড়ির ভিতরে তাহাদের আপিসের একজন সাহেব বসিয়া আছে। সাহেব হরলালকে দেখিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মফস্বলে গেলে না কেন।"

আপিসের দরোয়ান সন্দেহ করিয়া বড়োসাহেবকে গিয়া জানাইয়াছে— তিনি ইহাকে পাঠাইয়াছেন।

হরলাল বলিল, "তিন হাজার টাকার নোট পাওয়া যাইতেছে না।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেল?"

হরলাল 'জানি না' এমন উত্তরও দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কহিল, "টাকা কোথায় আছে দেখিব চলো।"

হরলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেল। সাহেব সমস্ত গনিয়া চারি দিক খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখিল। বাড়ির সমস্ত ঘর তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই-সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না— তিনি সাহেবের সামনেই বাহির হইয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে হরলাল, কী হইল রে।"

হরলাল কহিল, "মা, টাকা চুরি গেছে।"

মা কহিলেন, "চুরি কেমন করিয়া যাইবে। হরলাল, এমন সর্বনাশ কে করিল!"

হরলাল কহিল, "মা, চুপ করো।"

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরে রাত্রে কে ছিল।"

হরলাল কহিল, "দ্বার বন্ধ করিয়া আমি একলা শুইয়াছিলাম— আর-কেহ ছিল না।"

সাহেব টাকাগুলো গাড়িতে তুলিয়া হরলালকে কহিল, "আচ্ছা, বড়োসাহেবের কাছে চলো।"

হরলালকে সাহেবের সঙ্গে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মা তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল, "সাহেব, আমার ছেলেকে কোথায় লইয়া যাইবে। আমি না খাইয়া এ ছেলে মানুষ করিয়াছি— আমার ছেলে কখনোই পরের টাকায় হাত দিবে না।"

সাহেব বাংলা কথা কিছু না বুঝিয়া কহিল, "আচ্ছা, আচ্ছা।"

হরলাল কহিল, "মা, তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ। বড়োসাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া আমি এখনই আসিতেছি।"

মা উদ্‌বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "তুই যে সকাল থেকে কিছুই খাস নাই।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল। মা মেজের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

বড়োসাহেব হরলালকে কহিলেন, "সত্য করিয়া বলো ব্যাপারখানা কী।"

হরলাল কহিল, "আমি টাকা লই নাই।"

বড়োসাহেব। সে কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জান কে লইয়াছে।

হরলাল কোনো উত্তর না দিয়া মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সাহেব। তোমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইয়াছে?

হরলাল কহিল, "আমার প্রাণ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইতে পারিত না।"

বড়োসাহেব কহিলেন, "দেখো হরলাল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কোনো জামিন না লইয়া এই দায়িত্বের কাজ দিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন হাজার টাকা কিছুই বেশি নয়। কিন্তু তুমি আমাকে বড়ো লজ্জাতেই ফেলিবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় দিলাম— যেমন করিয়া পার টাকা সংগ্রহ করিয়া আনো— তাহা হইলে এ লইয়া কোনো কথা তুলিব না, তুমি যেমন কাজ করিতেছ তেমনি করিবে।"

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। তখন বেলা এগারোটা হইয়া গেছে। হরলাল যখন মাথা নিচু করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন আপিসের বাবুরা অত্যন্ত খুশি হইয়া হরলালের পতন লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

হরলাল এক দিন সময় পাইল। আরও একটা দীর্ঘ দিন নৈরাশ্যের শেষতলের পঙ্ক আলোড়ন করিয়া তুলিবার মেয়াদ বাড়িল।

উপায় কী, উপায় কী, উপায় কী— এই ভাবিতে ভাবিতে সেই রৌদ্রে হরলাল রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। শেষে উপায় আছে কি না সে ভাবনা বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু বিনা কারণে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো থামিল না। যে কলিকাতা হাজার হাজার লোকের আশ্রয়স্থান তাহাই এক মুহূর্তে হরলালের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড ফাঁসকলের মতো হইয়া উঠিল। ইহার কোনো দিকে বাহির হইবার কোনো পথ নাই। সমস্ত জনসমাজ এই অতিক্ষুদ্র হরলালকে চারি দিকে আটক করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ তাহাকে জানেও না, এবং তাহার প্রতি কাহারও মনে কোনো বিদ্বেষও নাই, কিন্তু প্রত্যেক লোকেই তাহার শত্রু। অথচ, রাস্তার লোক তাহার গা ঘেঁষিয়া তাহার পাশ দিয়া চলিয়াছে; আপিসের বাবুরা বাহিরে আসিয়া ঠোঙায় করিয়া জল খাইতেছেন, তাহার দিকে কেহ তাকাইতেছেন না; ময়দানের ধারে অলস পথিক মাথার নীচে হাত রাখিয়া একটা পায়ের উপর আর-একটা পা তুলিয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে; স্যাকরাগাড়ি ভরতি করিয়া হিন্দুস্থানী মেয়েরা কালীঘাটে চলিয়াছে; একজন চাপরাসি একখানা চিঠি লইয়া হরলালের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "বাবু, ঠিকানা পড়িয়া দাও"— যেন তাহার সঙ্গে অন্য পথিকের কোনো প্রভেদ নাই; সেও ঠিকানা পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল। ক্রমে আপিস বন্ধ হইবার সময় আসিল। বাড়িমুখো গাড়িগুলো আপিস-মহলের নানা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিসের বাবুরা ট্রাম ভরতি করিয়া থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে বাসায় ফিরিয়া চলিল। আজ হইতে হরলালের আপিস নাই, আপিসের ছুটি নাই, বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ট্রাম ধরিবার কোনো তাড়া নাই। শহরের সমস্ত কাজকর্ম, বাড়িঘর, গাড়িজুড়ি, আনাগোনা হরলালের কাছে কখনো-বা অত্যন্ত উৎকট সত্যের মতো দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে, কখনো-বা একেবারে বস্তুহীন স্বপ্নের মতো ছায়া হইয়া আসিতেছে। আহার নাই, বিশ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, কেমন করিয়া যে হরলালের দিন কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলিল— যেন একটা সতর্ক

অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র ক্রূর চক্ষু মেলিয়া শিকারলুব্ধ দানবের মতো চুপ করিয়া রহিল। রাত্রি কত হইল সে কথা হরলাল চিন্তাও করিল না। তাহার কপালের শিরা দব্ দব্ করিতেছে; মাথা যেন ফাটিয়া যাইতেছে; সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলিতেছে; পা আর চলে না। সমস্ত দিন পর্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাড়তার মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে যাতায়াত করিয়াছে—কলিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণীর মধ্যে কেবল ঐ একটিমাত্র নামই শুষ্ককণ্ঠ ভেদ করিয়া মুখে উঠিয়াছে—মা, মা, মা। আর-কাহাকেও ডাকিবার নাই। মনে করিল, রাত্রি যখন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোনো লোকই যখন এই অতিসামান্য হরলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে না, তখন সে চুপ করিয়া তাহার মায়ের কোলের কাছে গিয়া শুইয়া পড়িবে—তাহার পরে ঘুম যেন আর না ভাঙে! পাছে তার মার সম্মুখে পুলিসের লোক বা আর-কেহ তাহাকে অপমান করিতে আসে এই ভয়ে সে বাসায় যাইতে পারিতেছিল না। শরীরের ভার যখন আর বহিতে পারে না এমন সময় হরলাল একটা ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়া তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে।"

হরলাল কহিল, "কোথাও না। এই ময়দানের রাস্তায় খানিকক্ষণ হাওয়া খাইয়া বেড়াইব।"

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হরলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একটা টাকা দিল। সে গাড়ি তখন হরলালকে লইয়া ময়দানের রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তখন শ্রান্ত হরলাল তাহার তপ্ত মাথা খোলা জানালার উপর রাখিয়া চোখ বুজিল। একটু একটু করিয়া তাহার সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া আসিল। শরীর শীতল হইল। মনের মধ্যে একটি সুগভীর সুনিবিড় আনন্দপূর্ণ শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একটা যেন পরম পরিত্রাণ তাহাকে চারি দিক হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। সে যে সমস্ত দিন মনে করিয়াছিল, কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই, দুঃখের অবধি নাই, সে কথাটা যেন এক মুহূর্তেই মিথ্যা হইয়া গেল। এখন মনে হইল, সে তো একটা ভয় মাত্র, সে তো সত্য নয়। যাহা তাহার জীবনকে লোহার মুঠিতে আঁটিয়া পিষিয়া ধরিয়াছিল, হরলাল তাহাকে আর কিছুমাত্র স্বীকার করিল না—মুক্তি অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই। এই অতিসামান্য হরলালকে বেদনার মধ্যে, অপমানের মধ্যে, অন্যায়ের মধ্যে, বন্দী করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো রাজা-মহারাজারও নাই। যে আতঙ্কে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল। তখন হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারি দিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটরূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বসিতেছেন। তাঁহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তাঘাট বাড়িঘর দোকানবাজার একটু একটু করিয়া তাঁহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে—বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাঁহার মধ্যে মিলাইয়া গেল—হরলালের শরীর-মনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা, তাঁহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া

নিঃশেষ হইয়া গেল—ঐ গেল, তপ্ত বাষ্পের বুদ্‌বুদ একেবারে ফাটিয়া গেল—এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।

গির্জার ঘড়িতে একটা বাজিল। গাড়োয়ান অন্ধকার ময়দানের মধ্যে গাড়ি লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বিরক্ত হইয়া কহিল, "বাবু, ঘোড়া তো আর চলিতে পারে না—কোথায় যাইতে হইবে বলো।"

কোনো উত্তর পাইল না। কোচবাক্স হইতে নামিয়া হরলালকে নাড়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর নাই। তখন ভয় পাইয়া গাড়োয়ান পরীক্ষা করিয়া দেখিল, হরলালের শরীর আড়ষ্ট, তাহার নিশ্বাস বহিতেছে না।

'কোথায় যাইতে হইবে' হরলালের কাছ হইতে এই প্রশ্নের আর উত্তর পাওয়া গেল না।

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৪

রাসমণির ছেলে

কালীপদর মা ছিলেন রাসমণি— কিন্তু তাঁহাকে দায়ে পড়িয়া বাপের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কারণ, বাপ মা উভয়েই মা হইয়া উঠিলে ছেলের পক্ষে সুবিধা হয় না। তাঁহার স্বামী ভবানীচরণ ছেলেকে একেবারেই শাসন করিতে পারেন না।

তিনি কেন এত বেশি আদর দেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর দিয়া থাকেন তাহা বুঝিতে হইলে পূর্ব-ইতিহাস জানা চাই।

ব্যাপারখানা এই— শানিয়াড়ির বিখ্যাত বনিয়াদী ধনীর বংশে ভবানীচরণের জন্ম। ভবানীচরণের পিতা অভয়াচরণের প্রথম পক্ষের পুত্র শ্যামাচরণ। অধিক বয়সে স্ত্রী-বিয়োগের পর দ্বিতীয়বার যখন অভয়াচরণ বিবাহ করেন তখন তাঁহার শ্বশুর আলন্দি তালুকটি বিশেষ করিয়া তাঁহার কন্যার নামে লিখাইয়া লইয়াছিলেন। জামাতার বয়স হিসাব করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, কন্যার বৈধব্য যদি ঘটে তবে খাওয়া-পরার জন্য যেন সপত্নীপুত্রের অধীন তাঁহাকে না হইতে হয়।

তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার প্রথম অংশ ফলিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার দৌহিত্র ভবানীচরণের জন্মের অনতিকাল পরেই তাঁহার জামাতার মৃত্যু হইল। তাঁহার কন্যা নিজের বিশেষ সম্পত্তিটির অধিকার লাভ করিলেন ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া তিনিও পরলোকযাত্রার সময় কন্যার ইহলোক সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন।

শ্যামাচরণ তখন বয়ঃপ্রাপ্ত। এমন-কি, তাঁহার বড়ো ছেলেটি তখনই ভবানীর চেয়ে এক বছরের বড়ো। শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের সঙ্গে একত্রেই ভবানীকে মানুষ করিতে লাগিলেন। ভবানীচরণের মাতার সম্পত্তি হইতে কখনো তিনি নিজে এক পয়সা লন নাই এবং বৎসরে বৎসরে তাহার পরিষ্কার হিসাবটি তিনি বিমাতার নিকট দাখিল করিয়া তাহার রসিদ লইয়াছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই তাঁহার সাধুতায় মুগ্ধ হইয়াছে।

বস্তুত প্রায় সকলেই মনে করিয়াছিল, এতটা সাধুতা অনাবশ্যক, এমন-কি ইহা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর। অখণ্ড পৈতৃক সম্পত্তির একটা অংশ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর হাতে পড়ে, ইহা গ্রামের লোকের কাহারও ভালো লাগে নাই। যদি শ্যামাচরণ ছল করিয়া এই দলিলটি কোনো কৌশলে বাতিল করিয়া দিতেন তবে প্রতিবেশীরা তাঁহার পৌরুষের প্রশংসাই করিত, এবং যে উপায়ে তাহা সুচারুরূপে সাধিত হইতে পারে তাহার পরামর্শদাতা প্রবীণ ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। কিন্তু, শ্যামাচরণ তাঁহাদের চিরকালীন পারিবারিক স্বত্বকে অঙ্গহীন করিয়াও তাঁহার বিমাতার সম্পত্তিটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন।

এই কারণে এবং স্বভাবসিদ্ধ স্নেহশীলতাবশত বিমাতা ব্রজসুন্দরী শ্যামাচরণকে আপনার পুত্রের মতোই স্নেহ এবং বিশ্বাস করিতেন। এবং তাঁহার সম্পত্তিটিকে শ্যামা-চরণ অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখিতেন বলিয়া তিনি অনেকবার তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন; বলিয়াছেন, "বাবা, এ তো সমস্তই তোমাদের, এ সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া আমি তো স্বর্গে যাইব না, এ তোমাদেরই থাকিবে; আমার এত হিসাবপত্র দেখিবার দরকার কী।"

শ্যামাচরণ সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না।

শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের কঠোর শাসনে রাখিতেন। কিন্তু ভবানীচরণের 'পরে তাঁহার কোনো শাসনই ছিল না। ইহা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিত, নিজের ছেলেদের চেয়ে ভবানীর প্রতিই তাঁহার বেশি স্নেহ। এমনি করিয়া ভবানীর পড়াশুনা কিছুই হইল না। এবং বিষয়বুদ্ধি সম্বন্ধে চিরদিন শিশুর মতো থাকিয়া দাদার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি বয়স কাটাইতে লাগিলেন। বিষয়কর্মে তাঁহাকে কোনো-দিন চিন্তা করিতে হইত না— কেবল মাঝে মাঝে এক-একদিন সই করিতে হইত। কেন সই করিতেছেন তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেন না; কারণ, চেষ্টা করিলে কৃতকার্য হইতে পারিতেন না।

এ দিকে শ্যামাচরণের বড়ো ছেলে তারাপদ সকল কাজে পিতার সহকারীরূপে থাকিয়া কাজে কর্মে পাকা হইয়া উঠিল। শ্যামাচরণের মৃত্যু হইলে পর তারাপদ ভবানীচরণকে কহিল, "খুড়ামহাশয়, আমাদের আর একত্র থাকা চলিবে না। কী জানি কোন্‌দিন সামান্য কারণে মনান্তর ঘটিতে পারে, তখন সংসার ছারখার হইয়া যাইবে।"

পৃথক হইয়া কোনোদিন নিজের বিষয় নিজেকে দেখিতে হইবে, এ কথা ভবানী স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। যে সংসারে শিশুকাল হইতে তিনি মানুষ হইয়াছেন সেটাকে তিনি সম্পূর্ণ অখণ্ড বলিয়াই জানিতেন— তাহার যে কোনো-একটা জায়গায় জোড় আছে এবং সেই জোড়ের মুখে তাহাকে দুইখানা করা যায়, সহসা সে সংবাদ পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

বংশের সম্মানহানি এবং আত্মীয়দের মনোবেদনায় তারাপদকে যখন কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না, তখন কেমন করিয়া বিষয় বিভাগ হইতে পারে সেই অসাধ্য চিন্তায় ভবানীকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তারাপদ তাঁহার চিন্তা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "খুড়ামহাশয়, কাণ্ড কী। আপনি এত ভাবিতেছেন কেন। বিষয় ভাগ তো হইয়াই আছে। ঠাকুরদাদা বাঁচিয়া থাকিতেই তো ভাগ করিয়া দিয়া গেছেন।"

ভবানী হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন, "সত্য নাকি! আমি তো তাহার কিছুই জানি না।"

তারাপদ কহিলেন, "বিলক্ষণ! জানেন না তো কী! দেশসুদ্ধ লোক জানে, পাছে আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিবাদ ঘটে এইজন্য আলন্দি তালুক আপনাদের অংশে লিখিয়া দিয়া ঠাকুরদাদা প্রথম হইতে আপনাদিগকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন— সেই ভাবেই তে এ-পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।"

ভবানীচরণ ভাবিলেন, সকলই সম্ভব। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাড়ি?"

তারাপদ কহিলেন, "ইচ্ছা করেন তো বাড়ি আপনারাই রাখিতে পারেন। সদর মহকুমায় যে কুঠি আছে সেইটে পাইলেই আমাদের কোনোরকম করিয়া চলিয়া যাইবে।"

তারাপদ এত অনায়াসে পৈতৃক বাড়ি ছাড়িতে প্রস্তুত হইলেন দেখিয়া, তাঁহার ঔদার্যে তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহাদের সদর মহকুমার বাড়ি তিনি কোনোদিন দেখেন নাই এবং তাহার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র মমতা ছিল না।

ভবানী যখন তাঁহার মাতা ব্রজসুন্দরীকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন তিনি কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "ওমা, সে কী কথা! আলন্দি তালুক তো আমার খোর-পোষের জন্য আমি স্ত্রীধনস্বরূপে পাইয়াছিলাম— তাহার আয়ও তো তেমন বেশি নয়।

পৈতৃক সম্পত্তিতে তোমার যে অংশ সে তুমি পাইবে না কেন।"

ভবানী কহিলেন, "তারাপদ বলে, পিতা আমাদিগকে ঐ তালুক ছাড়া আর-কিছু দেন নাই।"

ব্রজসুন্দরী কহিলেন, "সে কথা বলিলে আমি শুনিব কেন। কর্তা নিজের হাতে তাঁহার উইল দুই প্রস্থ লিখিয়াছিলেন— তাহার এক প্রস্থ আমার কাছে রাখিয়াছেন; সে আমার সিন্দুকেই আছে।"

সিন্দুক খোলা হইল। সেখানে আলন্দি তালুকের দানপত্র আছে, কিন্তু উইল নাই। উইল চুরি গিয়াছে।

পরামর্শদাতাকে ডাকা হইল। লোকটি তাঁহাদের গুরুঠাকুরের ছেলে, নাম বগলাচরণ। সকলেই বলে, তাহার ভারি পাকা বুদ্ধি। তাহার বাপ গ্রামের মন্ত্রদাতা, আর ছেলেটি মন্ত্রণাদাতা। পিতাপুত্রে গ্রামের পরকাল ইহকাল ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। অন্যের পক্ষে তাহার ফলাফল যেমনই হউক, তাহাদের নিজেদের পক্ষে কোনো অসুবিধা ঘটে নাই।

বগলাচরণ কহিল, "উইল না'ই পাওয়া গেল। পিতার সম্পত্তিতে দুই ভায়ের তো সমান অংশ থাকিবেই।"

এমন সময় অপর পক্ষ হইতে একটা উইল বাহির হইল। তাহাতে ভবানীচরণের অংশে কিছুই লেখে না। সমস্ত সম্পত্তি পৌত্রদিগকে দেওয়া হইয়াছে। তখন অভয়াচরণের পুত্র জন্মে নাই।

বগলাকে কাণ্ডারী করিয়া ভবানী মকদ্দমার মহাসমুদ্রে পাড়ি দিলেন। বন্দরে আসিয়া লোহার সিন্দুকটি যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, লক্ষ্মীপেঁচার বাসাটি একেবারে শূন্য— সামান্য দুটো-একটা সোনার পালক খসিয়া পড়িয়া আছে। পৈতৃক সম্পত্তি অপর পক্ষের হাতে গেল। আর, আলন্দি তালুকের যে ডগাটুকু মকদ্দমা-খরচার বিনাশতল হইতে জাগিয়া রহিল কোনোমতে তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকা চলে মাত্র, কিন্তু বংশমর্যাদা রক্ষা করা চলে না। পুরাতন বাড়িটা ভবানীচরণ পাইয়া মনে করিলেন, ভারি জিতিয়াছি। তারাপদর দল সদরে চলিয়া গেল। উভয় পক্ষের মধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ রহিল না।

২

শ্যামাচরণের বিশ্বাসঘাতকতা ব্রজসুন্দরীকে শেলের মতো বাজিল। শ্যামাচরণ অন্যায় করিয়া কর্তার উইল চুরি করিয়া ভাইকে বঞ্চিত করিল এবং পিতার বিশ্বাসভঙ্গ করিল, ইহা তিনি কোনোমতেই ভুলিতে পারিলেন না। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন প্রতিদিনই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বারবার করিয়া বলিতেন, "ধর্মে ইহা কখনোই সহিবে না।" ভবানীচরণকে প্রায়ই প্রতিদিন তিনি এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, "আমি আইন-আদালত কিছুই বুঝি না; আমি তোমাকে বলিতেছি, কর্তার সে উইল কখনোই চিরদিন চাপা থাকিবে না। সে তুমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া পাইবে।"

বরাবর মাতার কাছে এই কথা শুনিয়া ভবানীচরণ মনে অত্যন্ত একটা ভরসা পাইলেন। তিনি নিজে অক্ষম বলিয়া এইরূপ আশ্বাসবাক্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত

সান্ত্বনার জিনিস। সতীসাধ্বীর বাক্য ফলিবেই, যাহা তাঁহারই তাহা আপনিই তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিবে, এ কথা তিনি নিশ্চয় স্থির করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাতার মৃত্যুর পরে এ বিশ্বাস তাঁহার আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল— কারণ মৃত্যুর বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া মাতার পুণ্যতেজ তাঁহার কাছে আরও অনেক বড়ো করিয়া প্রতিভাত হইল। দারিদ্র্যের সমস্ত অভাবপীড়ন যেন তাঁহার গায়েই বাজিত না। মনে হইত, এই-যে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, এই-যে পূর্বেকার চালচলনের ব্যত্যয়, এ যেন দু দিনের একটা অভিনয়মাত্র— এ কিছুই সত্য নহে। এইজন্য সাবেক ঢাকাই ধুতি ছিঁড়িয়া গেলে যখন কম দামের মোটা ধুতি তাঁহাকে কিনিয়া পরিতে হইল তখন তাঁহার হাসি পাইল। পুজার সময় সাবেক কালের ধুমধাম চলিল না, নমোনম করিয়া কাজ সারিতে হইল; অভ্যাগতজন এই দরিদ্র আয়োজন দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সাবেক কালের কথা পাড়িল। ভবানীচরণ মনে মনে হাসিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'ইহারা জানে না, এ-সমস্তই কেবল কিছুদিনের জন্য— তাহার পর এমন ধুম করিয়া একদিন পুজা হইবে যে, ইহাদের চক্ষুস্থির হইয়া যাইবে।' সেই ভবিষ্যতের নিশ্চিত সমারোহ তিনি এমনি প্রত্যক্ষের মতো দেখিতে পাইতেন যে, বর্তমান দৈন্য তাঁহার চোখেই পড়িত না।

এ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা করিবার প্রধান মানুষটি ছিল নোটো চাকর। কতবার পুজোৎসবের দারিদ্র্যের মাঝখানে বসিয়া প্রভু-ভৃত্যে ভাবী সুদিনে কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে তাহারই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন-কি কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে না-হইবে এবং কলিকাতা হইতে যাত্রার দল আনিবার প্রয়োজন আছে কি না, তাহা লইয়া উভয় পক্ষে ঘোরতর মতান্তর ও তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। স্বভাবসিদ্ধ অনৌদার্যবশত নটবিহারী সেই ভাবীকালের ফর্দ-রচনায় কৃপণতা প্রকাশ করায় ভবানীচরণের নিকট হইতে তীব্র ভর্ৎসনা লাভ করিয়াছে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

মোটের উপর বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে ভবানীচরণের মনে কোনোপ্রকার দুশ্চিন্তা ছিল না। কেবল তাঁহার একটিমাত্র উদ্‌বেগের কারণ ছিল, কে তাঁহার বিষয় ভোগ করিবে। আজ পর্যন্ত তাঁহার সন্তান হইল না। কন্যাদায়গ্রস্ত হিতৈষীরা যখন তাঁহাকে আর-একটি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিত তখন তাঁহার মন এক-একবার চঞ্চল হইত; তাহার কারণ এ নয় যে, নববধূ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ শখ ছিল— বরঞ্চ সেবক ও অন্নের ন্যায় স্ত্রীকেও পুরাতনভাবেই তিনি প্রশস্ত বলিয়া গণ্য করিতেন— কিন্তু যাহার ঐশ্বর্যসম্ভাবনা আছে তাহার সন্তানসম্ভাবনা না থাকা বিষম বিড়ম্বনা বলিয়াই তিনি জানিতেন।

এমন সময় যখন তাঁহার পুত্র জন্মিল তখন সকলেই বলিল, এইবার এই ঘরের ভাগ্য ফিরিবে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে— স্বয়ং স্বর্গীয় কর্তা অভয়াচরণ আবার এ ঘরে জন্মিয়াছেন, ঠিক সেই রকমেরই টানা চোখ। ছেলের কোষ্ঠীতেও দেখা গেল, গ্রহে নক্ষত্রে এমনিভাবে যোগাযোগ ঘটিয়াছে যে, হৃতসম্পত্তি উদ্ধার না হইয়া যায় না।

ছেলে হওয়ার পর হইতে ভবানীচরণের ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এতদিন পর্যন্ত দারিদ্র্যকে তিনি নিতান্তই একটা খেলার মতো সকৌতুকে অতি অনায়াসেই বহন করিয়াছিলেন, কিন্তু ছেলের সম্বন্ধে সে ভাবটি তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। শানিয়াড়ির বিখ্যাত চৌধুরীদের ঘরে নির্বাণপ্রায় কুলপ্রদীপকে উজ্জ্বল

করিবার জন্য সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের আকাশব্যাপী আনুকূল্যের ফলে যে শিশু ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি তো একটা কর্তব্য আছে। আজ পর্যন্ত ধারাবাহিক কাল ধরিয়া এই পরিবারে পুত্রসন্তানমাত্রই আজন্মকাল যে সমাদর লাভ করিয়াছে ভবানীচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রথম তাহা হইতে বঞ্চিত হইল, এ বেদনা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। 'এ বংশের চিরপ্রাপ্য আমি যাহা পাইয়াছি আমার পুত্রকে তাহা দিতে পারিলাম না' ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, 'আমিই ইহাকে ঠকাইলাম।' তাই কালীপদর জন্য অর্থব্যয় যাহা করিতে পারিলেন না, প্রচুর আদর দিয়া তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

ভবানীর স্ত্রী রাসমণি ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ। তিনি শানিয়াড়ির চৌধুরীদের বংশগৌরব সম্বন্ধে কোনোদিন উদ্‌বেগ অনুভব করেন নাই। ভবানী তাহা জানিতেন এবং ইহা লইয়া মনে মনে তিনি হাসিতেন; ভাবিতেন, যেরূপ সামান্য দরিদ্র বৈষ্ণববংশে তাঁহার স্ত্রীর জন্ম তাহাতে তাঁহার এ ত্রুটি ক্ষমা করাই উচিত— চৌধুরীদের মানমর্যাদা সম্বন্ধে ঠিকমতো ধারণা করাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

রাসমণি নিজেই তাহা স্বীকার করিতেন; বলিতেন, "আমি গরিবের মেয়ে, মানসম্ভ্রমের ধার ধারি না; কালীপদ আমার বাঁচিয়া থাক্, সেই আমার সকলের চেয়ে বড়ো ঐশ্বর্য।" উইল আবার পাওয়া যাইবে এবং কালীপদর কল্যাণে এ বংশে লুপ্ত সম্পদের শূন্য নদীপথে আবার বান ডাকিবে, এ-সব কথায় তিনি একেবারে কানই দিতেন না। এমন মানুষই ছিল না যাহার সঙ্গে তাঁহার স্বামী হারানো উইল লইয়া আলোচনা না করিতেন। কেবল, এই সকলের চেয়ে বড়ো মনের কথাটি তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে হইত না। দুই-একবার তাঁহার সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনো রস পাইলেন না। অতীত মহিমা এবং ভাবী মহিমা, এই দুইয়ের প্রতিই তাঁহার স্ত্রী মনোযোগমাত্র করিতেন না; উপস্থিত প্রয়োজনই তাঁহার সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল।

সে প্রয়োজনও বড়ো অল্প ছিল না। অনেক চেষ্টায় সংসার চালাইতে হইত। কেননা, লক্ষ্মী চলিয়া গেলেও তাঁহার বোঝা কিছু কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া যান, তখন উপায় থাকে না বটে কিন্তু অপায় থাকিয়া যায়। এ পরিবারে আশ্রয় প্রায় ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু আশ্রিত দল এখনও তাঁহাদিগকে ছুটি দিতে চায় না। ভবানীচরণও তেমন লোক নহেন যে, অভাবের ভয়ে কাহাকেও বিদায় করিয়া দিবেন।

এই ভারগ্রস্ত ভাঙা সংসারটিকে চালাইবার ভার রাসমণির উপরে। কাহারও কাছে তিনি বিশেষ কিছু সাহায্যও পান না। কারণ, এ সংসারের সচ্ছল অবস্থার দিনে আশ্রিতেরা সকলেই আরামে ও আলস্যেই দিন কাটাইয়াছে। চৌধুরীবংশের মহাবৃক্ষের তলে ইহাদের সুখশয্যার উপরে ছায়া আপনিই আসিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছে এবং ইহাদের মুখের কাছে পাকা ফল আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে— সেজন্য ইহাঁদের কাহাকেও কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হয় নাই। আজ ইহাদিগকে কোনোপ্রকার কাজ করিতে বলিলে, ইহারা ভারি অপমান বোধ করে— এবং রান্নাঘরের ধোঁয়া লাগিলেই ইহাদের মাথা ধরে; আর হাঁটাহাঁটি করিতে গেলেই কোথা হইতে এমন পোড়া বাতের ব্যামো আসিয়া অভিভূত করিয়া তোলে যে, কবিরাজের বহুমূল্য তৈলেও রোগ উপশম হইতে চায় না। তা ছাড়া, ভবানীচরণ বলিয়া থাকেন, আশ্রয়ের পরিবর্তে যদি

আশ্রিতের কাছ হইতে কাজ আদায় করা হয় তবে সে তো চাকরি করাইয়া লওয়া—তাহাতে আশ্রয়দানের মূল্যই চলিয়া যায়—চৌধুরীদের ঘরে এমন নিয়মই নহে।

অতএব সমস্ত দায় রাসমণিরই উপর। দিনরাত্রি নানা কৌশলে ও পরিশ্রমে এই পরিবারের সমস্ত অভাব তাঁহাকে গোপনে মিটাইয়া চলিতে হয়। এমন করিয়া দিনরাত্রি দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, টানাটানি করিয়া, দরদস্তুর করিয়া চলিতে থাকিলে মানুষকে বড়ো কঠিন করিয়া তুলে—তাহার কমনীয়তা চলিয়া যায়। যাহাদের জন্য সে পদে পদে খাটিয়া মরে তাহারাই তাহাকে সহ্য করিতে পারে না। রাসমণি যে কেবল পাকশালায় অন্ন পাক করেন তাহা নহে, অন্নের সংস্থানভারও অনেকটা তাঁহার উপর—অথচ সেই অন্ন সেবন করিয়া মধ্যাহ্নে যাঁহারা নিদ্রা দেন তাঁহারা প্রতিদিন সেই অন্নেরও নিন্দা করেন, অন্নদাতারও সুখ্যাতি করেন না।

কেবল ঘরের কাজ নহে, তালুক ব্রহ্মত্র অল্পস্বল্প যা-কিছু এখনও বাকি আছে তাহার হিসাবপত্র দেখা, খাজনা-আদায়ের ব্যবস্থা করা, সমস্ত রাসমণিকে করিতে হয়। তহশিল প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্বে এত কষাকষি কোনোদিন ছিল না—ভবানীচরণের টাকা অভিমন্যুর ঠিক উল্টা, সে বাহির হইতেই জানে, প্রবেশ করিবার বিদ্যা তাহার জানা নাই। কোনোদিন টাকার জন্য কাহাকেও তাগিদ করিতে তিনি একেবারেই অক্ষম। রাসমণি নিজের প্রাপ্য সম্বন্ধে কাহাকেও সিকি পয়সা রেয়াত করেন না। ইহাতে প্রজারা তাঁহাকে নিন্দা করে, গোমস্তাগুলো পর্যন্ত তাঁহার সতর্কতার জ্বালায় অস্থির হইয়া তাঁহার বংশোচিত ক্ষুদ্রাশয়তার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে গালি দিতে ছাড়ে না। এমন-কি, তাঁহার স্বামীও তাঁহার কৃপণতা ও তাঁহার কর্কশতাকে তাঁহাদের বিশ্ব-বিখ্যাত পরিবারের পক্ষে মানহানিজনক বলিয়া কখনো কখনো মৃদুস্বরে আপত্তি করিয়া থাকেন। এ-সমস্ত নিন্দা ও ভর্ৎসনা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিজের নিয়মে কাজ করিয়া চলেন, দোষ সমস্তই নিজের ঘাড়ে লন; তিনি গরিবের ঘরের মেয়ে, তিনি বড়োমানুষিয়ানার কিছুই বোঝেন না, এই কথা বারবার স্বীকার করিয়া, ঘরে বাহিরে সকল লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া, আঁচলের প্রান্তটা কষিয়া কোমরে জড়াইয়া, ঝড়ের বেগে কাজ করিতে থাকেন; কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

স্বামীকে কোনোদিন তিনি কোনো কাজে ডাকা দূরে থাক্‌, তাঁহার মনে মনে এই ভয় সর্বদা ছিল পাছে ভবানীচরণ সহসা কর্তৃত্ব করিয়া কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া বসেন। 'তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না, এ-সব কিছুতে তোমার থাকার প্রয়োজন নাই' এই বলিয়া সকল বিষয়েই স্বামীকে নিরুদ্যম করিয়া রাখাই তাঁহার একটা প্রধান চেষ্টা ছিল। স্বামীরও আজন্মকাল সেটা সুন্দররূপে অভ্যস্ত থাকাতে, সে বিষয়ে স্ত্রীকে অধিক দুঃখ পাইতে হয় নাই। রাসমণির অনেক বয়স পর্যন্ত সন্তান হয় নাই—এই তাঁহার অকর্মণ্য সরলপ্রকৃতি পরমুখাপেক্ষী স্বামীটিকে লইয়া তাঁহার পত্নীপ্রেম ও মাতৃস্নেহ দুই মিটিয়াছিল। ভবানীকে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বলিয়াই দেখিতেন। কাজেই শাশুড়ির মৃত্যুর পর হইতে বাড়ির কর্তা এবং গৃহিণী উভয়েরই কাজ তাঁহাকে একলাই সম্পন্ন করিতে হইত। গুরুঠাকুরের ছেলে এবং অন্যান্য বিপদ হইতে স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি এমনি কঠোরভাবে চলিতেন যে, তাঁহার স্বামীর সঙ্গীরা তাঁহাকে ভারি ভয় করিত। প্রখরতা গোপন করিয়া রাখিবেন, স্পষ্ট কথাগুলার ধারটুকু একটু নরম করিয়া দিবেন, এবং পুরুষমণ্ডলীর সঙ্গে যথোচিত

সংকোচ রক্ষা করিয়া চলিবেন, সেই নারীজনোচিত সুযোগ তাঁহার ঘটিল না।

এ-পর্যন্ত ভবানীচরণ তাঁহার বাধ্যভাবেই চলিতেছিলেন। কিন্তু, কালীপদর সম্বন্ধে রাসমণিকে মানিয়া চলা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

তাহার কারণ এই, রাসমণি ভবানীর পুত্রটিকে ভবানীচরণের নজরে দেখিতেন না। তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে তিনি ভাবিতেন, 'বেচারা করিবে কী, উহার দোষ কী, ও বড়োমানুষের ঘরে জন্মিয়াছে—ওর তো উপায় নাই।' এইজন্য, তাঁহার স্বামী যে কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করিবেন, ইহা তিনি আশাই করিতে পারিতেন না। তাই সহস্র অভাবসত্ত্বেও প্রাণপণ শক্তিতে তিনি স্বামীর সমস্ত অভ্যস্ত প্রয়োজন যথাসম্ভব জোগাইয়া দিতেন। তাঁহার ঘরে বাহিরের লোকের সম্বন্ধে হিসাব খুবই কষা ছিল, কিন্তু ভবানীচরণের আহারে ব্যবহারে পারতপক্ষে সাবেক নিয়মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইতে পারিত না। নিতান্ত টানাটানির দিনে যদি কোনো বিষয়ে কিছু ত্রুটি ঘটিত তবে সেটা যে অভাববশত ঘটিয়াছে সে কথা তিনি কোনোমতেই স্বামীকে জানিতে দিতেন না—হয়তো বলিতেন, "ঐ রে, হতভাগা কুকুর খাবারে মুখ দিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে!" বলিয়া নিজের কল্পিত অসতর্কতাকে ধিক্‌কার দিতেন। নয়তো লক্ষ্মীছাড়া নোটোর দোষেই নূতন-কেনা কাপড়টা খোওয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার বুদ্ধির প্রতি প্রচুর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন—ভবানীচরণ তখন তাঁহার প্রিয় ভৃত্যটির পক্ষাবলম্বন করিয়া গৃহিণীর ক্রোধ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। এমন-কি, কখনো এমনও ঘটিয়াছে, যে কাপড় গৃহিণী কেনেন নাই, এবং ভবানীচরণ চক্ষেও দেখেন নাই এবং যে কাল্পনিক কাপড়খানা হারাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া নটবিহারী অভিযুক্ত—ভবানীচরণ অম্লানমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, সেই কাপড় নোটো তাঁহাকে কোঁচাইয়া দিয়াছে, তিনি তাহা পরিয়াছেন এবং তাহার পর—তাহার পর কী হইল সেটা হঠাৎ তাঁহার কল্পনাশক্তিতে জোগাইয়া উঠে নাই—রাসমণি নিজেই সেটুকু পূরণ করিয়া বলিয়াছেন—"নিশ্চয়ই তুমি তোমার বাহিরের বৈঠকখানার ঘরে ছাড়িয়া রাখিয়াছিলে, সেখানে যে খুশি আসে যায়, কে চুরি করিয়া লইয়াছে।"

ভবানীচরণের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু, নিজের ছেলেকে তিনি কোনো অংশেই স্বামীর সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতেন না। সে তো তাঁহারই গর্ভের সন্তান—তাহার আবার কিসের বাবুয়ানা! সে হইবে শক্তসমর্থ কাজের লোক—অনায়াসে দুঃখ সহিবে ও খাটিয়া খাইবে। তাহার এটা নহিলে চলে না, ওটা নহিলে অপমান বোধ হয়, এমন কথা কোনোমতেই শোভা পাইবে না। কালীপদ সম্বন্ধে রাসমণি খাওয়া-পরায় খুব মোটারকমই বরাদ্দ করিয়া দিলেন। মুড়িগুড় দিয়াই তাহার জলখাবার সারিলেন এবং মাথা-কান ঢাকিয়া দোলাই পরাইয়া তাহার শীতনিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। গুরুমশায়কে স্বয়ং ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, ছেলে যেন পড়াশুনায় কিছুমাত্র শৈথিল্য করিতে না পারে, তাহাকে যেন বিশেষরূপে শাসনে সংযত রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

এইখানে বড়ো মুশকিল বাধিল। নিরীহস্বভাব ভবানীচরণ মাঝে মাঝে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাসমণি যেন তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। ভবানী প্রবল পক্ষের কাছে চিরদিনই হার মানিয়াছেন, এবারেও তাঁহাকে অগত্যা

হার মানিতে হইল, কিন্তু মন হইতে তাঁহার বিরুদ্ধতা ঘুচিল না। এ ঘরের ছেলে দোলাই মুড়ি দিয়া গুড়মুড়ি খায়, এমন বিসদৃশ দৃশ্য দিনের পর দিন কি দেখা যায়।

পূজার সময় তাঁহার মনে পড়ে, কর্তাদের আমলে নূতন সাজসজ্জা পরিয়া তাঁহারা কিরূপ উৎসাহ বোধ করিয়াছেন। পূজার দিনে রাসমণি কালীপদর জন্য যে সস্তা কাপড়-জামার ব্যবস্থা করিয়াছেন সাবেক কালে তাঁহাদের বাড়ির ভৃত্যেরাও তাহাতে আপত্তি করিত। রাসমণি স্বামীকে অনেক করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, "কালীপদকে যাহা দেওয়া যায় তাহাতেই সে খুশি হয়, সে তো সাবেক দস্তুরের কথা কিছু জানে না—তুমি কেন মিছামিছি মন ভার করিয়া থাক।" কিন্তু, ভবানী-চরণ কিছুতেই ভুলিতে পারেন না যে, বেচারা কালীপদ আপন বংশের গৌরব জানে না বলিয়া তাহাকে ঠকানো হইতেছে। বস্তুত সামান্য উপহার পাইয়া সে যখন গর্বে ও আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাকে ছুটিয়া দেখাইতে আসে তখন তাহাতেই ভবানীচরণকে যেন আরও আঘাত করিতে থাকে। তিনি সে কিছুতেই দেখিতে পারেন না। তাঁহাকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে হয়।

ভবানীচরণের মকদ্দমা চালাইবার পর হইতে তাঁহাদের গুরুঠাকুরের ঘরে বেশ কিঞ্চিৎ অর্থসমাগম হইয়াছে। তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া গুরুপুত্রটি প্রতি বৎসর পূজার কিছু পূর্বে কলিকাতা হইতে নানাপ্রকার চোখ-ভোলানো সস্তা শৌখিন জিনিস আনাইয়া কয়েক মাসের জন্য ব্যাবসা চালাইয়া থাকেন। অদৃশ্য কালি, ছিপ ছড়ি ছাতার একত্র সমবায়, ছবি-আঁকা চিঠির কাগজ, নিলামে-কেনা নানা রঙের পচা রেশম ও সাটিনের থান, কবিতা-লেখা-পাড়-ওয়ালা শাড়ি প্রভৃতি লইয়া তিনি গ্রামের নরনারীর মন উতলা করিয়া দেন। কলিকাতার বাবুমহলে আজকাল এই-সমস্ত উপকরণ না হইলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না শুনিয়া গ্রামের উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রই আপনার গ্রাম্যতা ঘুচাইবার জন্য সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিতে ছাড়েন না।

একবার বগলাচরণ একটা অত্যাশ্চর্য মেমের মূর্তি আনিয়াছিলেন। তার কোন্-এক জায়গায় দম দিলে মেম চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবল বেগে নিজেকে পাখা করিতে থাকে।

এই বীজনপরায়ণ গ্রীষ্মকাতর মেমমূর্তিটির প্রতি কালীপদর অত্যন্ত লোভ জন্মিল। কালীপদ তাহার মাকে বেশ চেনে, এইজন্য মার কাছে কিছু না বলিয়া ভবানীচরণের কাছে করুণকণ্ঠে আবেদন উপস্থিত করিল। ভবানীচরণ তখনই উদারভাবে তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন, কিন্তু তাহার দাম শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল।

টাকাকড়ি আদায়ও করেন রাসমণি, তহবিলও তাঁহার কাছে, খরচও তাঁহার হাত দিয়াই হয়। ভবানীচরণ ভিখারির মতো তাঁহার অন্নপূর্ণার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথা আলোচনা করিয়া অবশেষে এক সময়ে ধাঁ করিয়া আপনার মনের ইচ্ছাটা বলিয়া ফেলিলেন।

রাসমণি অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিলেন, "পাগল হইয়াছ!"

ভবানীচরণ চুপ করিয়া খানিকক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা দেখো, ভাতের সঙ্গে তুমি যে রোজ আমাকে ঘি আর পায়স দাও, সেটার তো প্রয়োজন নাই!"

রাসমণি বলিলেন, "প্রয়োজন নাই তো কী।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "কবিরাজ বলে, উহাতে পিত্তবৃদ্ধি হয়।"

রাসমণি তীক্ষ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "তোমার কবিরাজ তো সব জানে!"

ভবানীচরণ কহিলেন, "আমি তো বলি, রাত্রে আমার লুচি বন্ধ করিয়া ভাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলে ভালো হয়। উহাতে পেট ভার করে।"

রাসমণি কহিলেন, "পেট ভার করিয়া আজ পর্যন্ত তোমার তো কোনো অনিষ্ট হইতে দেখিলাম না। জন্মকাল হইতে লুচি খাইয়াই তো তুমি মানুষ।"

ভবানীচরণ সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার করিতেই প্রস্তুত— কিন্তু, সে দিকে ভারি কড়াক্কড়। ঘিয়ের দর বাড়িতেছে তবু লুচির সংখ্যা ঠিক সমানই আছে। মধ্যাহ্ন-ভোজনে পায়সটা যখন আছেই তখন দইটা না দিলে কোনো ক্ষতিই হয় না— কিন্তু, বাহুল্য হইলেও এ বাড়িতে বাবুরা বরাবর দই পায়স খাইয়া আসিয়াছেন। কোনোদিন ভবানীচরণের ভোগে সেই চিরন্তন দধির অনটন দেখিলে রাসমণি কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। অতএব গায়ে-হাওয়া-লাগানো সেই মেমমূর্তিটি ভবানীচরণের দই পায়স ঘি লুচির কোনো ছিদ্রপথ দিয়া যে প্রবেশ করিবে এমন উপায় দেখা গেল না।

ভবানীচরণ তাঁহার গুরুপুত্রের বাসায় একদিন যেন নিতান্ত অকারণেই গেলেন এবং বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথার পর সেই মেমের খবরটা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার বর্তমান আর্থিক দুর্গতির কথা বগলাচরণের কাছে গোপন থাকিবার কোনো কারণ নাই তাহা তিনি জানেন; তবু আজ তাঁহার টাকা নাই বলিয়া ঐ একটা সামান্য খেলনা তিনি তাঁহার ছেলের জন্য কিনিতে পারিতেছেন না, এ কথার আভাস দিতেও তাঁহার যেন মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। তবু দুঃসহ সংকোচকেও অধঃকৃত করিয়া তিনি তাঁহার চাদরের ভিতর হইতে কাপড়ে-মোড়া একটি দামি পুরাতন জামিয়ার বাহির করিলেন। রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিলেন, "সময়টা কিছু খারাপ পড়িয়াছে, নগদ টাকা হাতে বেশি নাই— তাই মনে করিয়াছি, এই জামিয়ারটি তোমার কাছে বন্ধক রাখিয়া সেই পুতুলটা কালীপদর জন্য লইয়া যাইব।"

জামিয়ারের চেয়ে অল্প দামের কোনো জিনিস যদি হইত তবে বগলাচরণের বাধিত না— কিন্তু সে জানিত, এটা হজম করিয়া উঠিতে পারিবে না— গ্রামের লোকেরা তো নিন্দা করিবেই, তাহার উপরে রাসমণির রসনা হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা সরস হইবে না। জামিয়ারটাকে পুনরায় চাদরের মধ্যে গোপন করিয়া হতাশ হইয়া ভবানীচরণকে ফিরিতে হইল।

কালীপদ পিতাকে রোজ জিজ্ঞাসা করে, "বাবা, আমার সেই মেমের কী হইল।"

ভবানীচরণ রোজই হাসিমুখে বলেন, "রোস্— এখনই কী। সপ্তমী পূজার দিন আগে আসুক।"

প্রতিদিনই মুখে হাসি টানিয়া আনা দুঃসাধ্যতর হইতে লাগিল।

আজ চতুর্থী। ভবানীচরণ অসময়ে অন্তঃপুরে কী-একটা ছুতা করিয়া গেলেন। যেন হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে রাসমণিকে বলিয়া উঠিলেন, "দেখো, আমি কয়দিন হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কালীপদর শরীরটা যেন দিনে দিনে খারাপ হইয়া যাইতেছে।"

রাসমণি কহিলেন, "বালাই! খারাপ হইতে যাইবে কেন। ওর তো আমি কোনো অসুখ দেখি না।"

পৃথিবীতে মূল্য না দিয়া যে কিছুই পাওয়া যায় না এবং সে মূল্য যে দুঃখের মূল্য, মাতার অন্তরঙ্গ হইয়া সে কথা কালীপদ প্রতিদিন যতই বুঝিতে পারিল ততই দেখিতে দেখিতে সে যেন ভিতরের দিক হইতে বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। সকল কাজেই এখন সে তার মাতার দক্ষিণপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সংসারের ভার বহিতে হইবে, সংসারের ভার বাড়াইতে হইবে না, এ কথা বিনা উপদেশবাক্যেই তাহার রক্তের সঙ্গেই মিশিয়া গেল।

জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে, এই কথা স্মরণ রাখিয়া কালীপদ প্রাণপণে পড়িতে লাগিল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন সে ছাত্রবৃত্তি পাইল তখন ভবানীচরণ মনে করিলেন, আর বেশি পড়াশুনার দরকার নাই, এখন কালীপদ তাঁহাদের বিষয়কর্ম দেখায় প্রবৃত্ত হউক।

কালীপদ মাকে আসিয়া কহিল, "কলিকাতায় গিয়া পড়াশুনা না করিতে পারিলে আমি তো মানুষ হইতে পারিব না।"

মা বলিলেন, "সে তো ঠিক কথা, বাবা। কলিকাতায় তো যাইতেই হইবে।"

কালীপদ কহিল, "আমার জন্য কোনো খরচ করিতে হইবে না। এই বৃত্তি হইতেই চালাইয়া দিব—এবং কিছু কাজকর্মেরও জোগাড় করিয়া লইব।"

ভবানীচরণকে রাজি করাইতে অনেক কষ্ট পাইতে হইল। দেখিবার মতো বিষয়-সম্পত্তি যে কিছুই নাই, সে কথা বলিলে ভবানীচরণ অত্যন্ত দুঃখবোধ করেন, তাই রাসমণিকে সে যুক্তিটা চাপিয়া যাইতে হইল। তিনি বলিলেন, "কালীপদকে তো মানুষ হইতে হইবে।" কিন্তু, পুরুষানুক্রমে কোনোদিন শানিয়াড়ির বাহিরে না গিয়াই তো চৌধুরীরা এতকাল মানুষ হইয়াছে। বিদেশকে তাঁহারা যমপুরীর মতো ভয় করেন। কালীপদর মতো বালককে একলা কলিকাতায় পাঠাইবার প্রস্তাবমাত্র কী করিয়া কাহারও মাথায় আসিতে পারে, তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে গ্রামের সর্বপ্রধান বুদ্ধিমান ব্যক্তি বগলাচরণ পর্যন্ত রাসমণির মতে মত দিল। সে বলিল, "কালীপদ একদিন উকিল হইয়া সেই উইল-চুরি ফাঁকির শোধ দিবে, নিশ্চয়ই এ তাহার ভাগ্যের লিখন—অতএব কলিকাতায় যাওয়া হইতে কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না।"

এ কথা শুনিয়া ভবানীচরণ অনেকটা সান্ত্বনা পাইলেন। গামছায় বাঁধা পুরানো সমস্ত নথি বাহির করিয়া উইল-চুরি লইয়া কালীপদর সঙ্গে বারবার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি মাতার মন্ত্রীর কাজটা কালীপদ বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই চালাইতেছিল, কিন্তু পিতার মন্ত্রণাসভায় সে জোর পাইল না। কেননা, তাহাদের পরিবারের এই প্রাচীন অন্যায়টা সম্বন্ধে তাহার মনে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল না। তবু সে পিতার কথায় সায় দিয়া গেল। সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য বীরশ্রেষ্ঠ রাম যেমন লঙ্কায় যাত্রা করিয়াছিলেন, কালীপদর কলিকাতায় যাত্রাকেও ভবানীচরণ তেমনি খুব বড়ো করিয়া দেখিলেন—সে কেবল সামান্য পাস করার ব্যাপার নয়—ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবার আয়োজন।

কলিকাতায় যাইবার আগের দিন রাসমণি কালীপদর গলায় একটি রক্ষাকবচ ঝুলাইয়া দিলেন; এবং তাহার হাতে একটি পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়া বলিয়া দিলেন, "এই নোটটি রাখিয়ো, আপদে বিপদে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগিবে।" সংসার-খরচ

হইতে অনেক কষ্টে জমানো এই নোটটিকেই কালীপদ যথার্থ পবিত্র কবচের ন্যায় জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিল—এই নোটটিকে মাতার আশীর্বাদের মতো সে চিরদিন রক্ষা করিবে, কোনোদিন খরচ করিবে না, এই সে মনে মনে সংকল্প করিল।

৩

ভবানীচরণের মুখে উইল-চুরির কথাটা এখন আর তেমন শোনা যায় না। এখন তাঁহার একমাত্র আলোচনার বিষয় কালীপদ। তাহারই কথা বলিবার জন্য তিনি এখন সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাহার চিঠি পাইলে ঘরে ঘরে তাহা পড়িয়া শুনাইবার উপলক্ষে নাক হইতে চশমা আর নামিতে চায় না। কোনোদিন এবং কোনো পুরুষে কলিকাতায় যান নাই বলিয়াই কলিকাতার গৌরববোধে তাঁহার কল্পনা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমাদের কালীপদ কলিকাতায় পড়ে এবং কলিকাতার কোনো সংবাদই তাহার অগোচর নাই—এমন-কি, হুগলির কাছে গঙ্গার উপর দ্বিতীয় আর-একটি পুল বাঁধা হইতেছে, এ-সমস্ত বড়ো বড়ো খবর তাহার কাছে নিতান্ত ঘরের কথা মাত্র। "শুনেছ, ভায়া? গঙ্গার উপর আর-একটা যে পুল বাঁধা হচ্ছে—আজই কালীপদর চিঠি পেয়েছি, তাতে সমস্ত খবর লিখেছে।"—বলিয়া চশমা খুলিয়া তাহার কাঁচ ভালো করিয়া মুছিয়া চিঠিখানি অতি ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত প্রতিবেশীকে পড়িয়া শুনাইলেন। "দেখছ ভায়া! কালে কালে কতই যে কী হবে তার ঠিকানা নেই। শেষকালে ধুলোপায়ে গঙ্গার উপর দিয়ে কুকুর-শেয়ালগুলোও পার হয়ে যাবে, কলিতে এও ঘটল হে!" গঙ্গার এইরূপ মাহাত্ম্যখর্ব নিঃসন্দেহই শোচনীয় ব্যাপার, কিন্তু কালীপদ যে কলিকালের এতবড়ো একটা জয়বার্তা তাঁহাকে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছে এবং গ্রামের নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরা এ খব[illegible]হারই কল্যাণে জানিতে পারিয়াছে, সেই আনন্দে তিনি বর্তমান যুগে জীবের অসীম দুর্গতির দুশ্চিন্তাও অনায়াসে ভুলিতে পারিলেন। যাহার দেখা পাইলেন তাহারই কাছে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আমি বলে দিচ্ছি, গঙ্গা আর বেশি দিন নাই।" মনে মনে এই আশা করিয়া রহিলেন, গঙ্গা যখনই যাইবার উপক্রম করিবেন তখনই সে খবরটা সর্বপ্রথমে কালীপদর চিঠি হইতেই পাওয়া যাইবে।

এ দিকে কলিকাতায় কালীপদ বহু কষ্টে পরের বাসায় থাকিয়া ছেলে পড়াইয়া, রাত্রে হিসাবের খাতা নকল করিয়া, পড়াশুনা চালাইতে লাগিল। কোনোমতে এন্‌ট্রেন্স্‌ পরীক্ষা পার হইয়া পুনরায় সে বৃত্তি পাইল। এই আশ্চর্য ঘটনা-উপলক্ষে সমস্ত গ্রামের লোককে প্রকাণ্ড একটা ভোজ দিবার জন্য ভবানীচরণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, তরী তো প্রায় কূলে আসিয়া ভিড়িল—সেই সাহসে এখন হইতে মন খুলিয়া খরচ করা যাইতে পারে। রাসমণির কাছে কোনো উৎসাহ না পাওয়াতে ভোজটা বন্ধ রহিল।

কালীপদ এবার কলেজের কাছে একটি মেসে আশ্রয় পাইল। মেসের যিনি অধিকারী তিনি তাহাকে নীচের তলার একটি অব্যবহার্য ঘরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। কালীপদ বাড়িতে তাঁহার ছেলেকে পড়াইয়া দুইবেলা খাইতে পায় এবং মেসের সেই স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার ঘরে তাহার বাসা। ঘরটার একটা মস্ত সুবিধা এই

যে, সেখানে কালীপদর ভাগী কেহ ছিল না। সুতরাং, যদিচ সেখানে বাতাস চলিত না তবু পড়াশুনা অবাধে চলিত। যেমনই হউক, সুবিধা-অসুবিধা বিচার করিবার অবস্থা কালীপদর নহে।

এ মেসে যাহারা ভাড়া দিয়া বাস করে, বিশেষত যাহারা দ্বিতীয় তলের উচ্চলোকে থাকে, তাহাদের সঙ্গে কালীপদর কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু, সম্পর্ক না থাকিলেও সংঘাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। উচ্চের বজ্রাঘাত নিম্নের পক্ষে কতদূর প্রাণান্তিক, কালীপদর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

এই মেসের উচ্চলোকে ইন্দ্রের সিংহাসন যাহার, তাহার পরিচয় আবশ্যক। তাহার নাম শৈলেন্দ্র। সে বড়োমানুষের ছেলে; কলেজে পড়িবার সময় মেসে থাকা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক— তবু সে মেসে থাকিতেই ভালোবাসিত।

তাহাঁদের বৃহৎ পরিবার হইতে কয়েকজন স্ত্রী ও পুরুষ-জাতীয় আত্মীয়কে আনাইয়া কলিকাতায় একটি বাসা ভাড়া করিয়া থাকিবার জন্য বাড়ি হইতে অনুরোধ আসিয়াছিল— সে তাহাতে কোনোমতেই রাজি হয় নাই।

সে কারণ দেখাইয়াছিল যে, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে থাকিলে তাহার পড়াশুনা কিছুই হইবে না। কিন্তু, আসল কারণটা তাহা নহে। শৈলেন্দ্র লোকজনের সঙ্গ খুবই ভালোবাসে; কিন্তু আত্মীয়দের মুশকিল এই যে, কেবলমাত্র তাহাদের সঙ্গটি লইয়া খালাস পাওয়া যায় না, তাহাদের নানা দায় স্বীকার করিতে হয়— কাহারও সম্বন্ধে এটা করিতে নাই, কাহারও সম্বন্ধে ওটা না করিলে অত্যন্ত নিন্দার কথা। এইজন্য শৈলেন্দ্রের পক্ষে সকলের চেয়ে সুবিধার জায়গা মেস। সেখানে লোক যথেষ্ট আছে, অথচ তাহার উপর তাহাদের কোনো ভার নাই। তাহারা আসে যায়, হাসে, কথা কয়; তাহারা নদীর জলের মতো, কেবলই বহিয়া চলিয়া যায় অথচ কোথাও লেশমাত্র ছিদ্র রাখে না।

শৈলেন্দ্রের ধারণা ছিল, সে লোক ভালো, যাহাকে বলে সহৃদয়। সকলেই জানেন, এই ধারণাটির মস্ত সুবিধা এই যে, নিজের কাছে ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য ভালো-লোক হইবার কোনো দরকার করে না। অহংকার জিনিসটা হাতি-ঘোড়ার মতো নয়; তাহাকে নিতান্তই অল্প খরচে ও বিনা খোরাকে বেশ মোটা করিয়া রাখা যায়। কিন্তু, শৈলেন্দ্রের ব্যয় করিবার সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি ছিল— এইজন্য আপনার অহংকারটাকে সে সম্পূর্ণ বিনা খরচে চরিয়া খাইতে দিত না; দামি খোরাক দিয়া তাহাকে সুন্দর সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল।

বস্তুত শৈলেন্দ্রের মনে দয়া যথেষ্ট ছিল। লোকের দুঃখ দূর করিতে সে সত্যই ভালোবাসিত। কিন্তু, এত ভালোবাসিত যে, যদি কেহ দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহার শরণাপন্ন না হইত তাহাকে সে বিধিমতে দুঃখ না দিয়া ছাড়িত না। তাহার দয়া যখন নির্দয় হইয়া উঠিত তখন বড়ো ভীষণ আকার ধারণ করিত।

মেসের লোকদিগকে থিয়েটার-দেখানো, পাঁঠা-খাওয়ানো, টাকা ধার দিয়া সে কথাটাকে সর্বদা মনে করিয়া না রাখা— তাহার দ্বারা প্রায়ই ঘটিত। নবপরিণীত মুগ্ধ যুবক পুজার ছুটিতে বাড়ি যাইবার সময় কলিকাতার বাসাখরচ সমস্ত শোধ করিয়া যখন নিঃস্ব হইয়া পড়িত তখন বধূর মনোহরণের উপযোগী শৌখিন সাবান এবং এসেন্স্, আর তারই সঙ্গে এক-আধখানি হালের আমদানি বিলাতি ছিটের

জ্যাকেট সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে অত্যন্ত বেশি দুশ্চিন্তায় পড়িতে হইত না। শৈলেনের সুরুচির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সে বলিত, "তোমাকেই কিন্তু ভাই, পছন্দ করিয়া দিতে হইবে।" দোকানে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া নিজে নিতান্ত সস্তা এবং বাজে জিনিস বাছিয়া তুলিত; তখন শৈলেন তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিত, "আরে ছি ছি, তোমার কিরকম পছন্দ।" বলিয়া সব-চেয়ে শৌখিন জিনিসটি টানিয়া তুলিত। দোকানদার আসিয়া বলিত, "হাঁ, ইনি জিনিস চেনেন বটে।" খরিদ্‌দার দামের কথা আলোচনা করিয়া মুখ বিমর্ষ করিতেই শৈলেন দাম চুকাইবার অকিঞ্চিৎকর ভারটা নিজেই লইত— অপর পক্ষের ভূয়োভূয়ঃ আপত্তিতেও কর্ণপাত করিত না।

এমনি করিয়া, যেখানে শৈলেন ছিল সেখানে সে চারি দিকের সকলেরই সকল বিষয়ে আশ্রয়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ তাহার আশ্রয় স্বীকার না করিলে তাহার সেই ঔদ্ধত্য সে কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না। লোকের হিত করিবার শখ তাহার এতই প্রবল।

বেচারা কালীপদ নীচের স্যাঁৎসেঁতে ঘরে ময়লা মাদুরের উপর বসিয়া, একখানা ছেঁড়া গেঞ্জি পরিয়া, বইয়ের পাতায় চোখ গুঁজিয়া দুলিতে দুলিতে পড়া মুখস্থ করিত। যেমন করিয়া হউক তাহাকে স্কলারশিপ পাইতেই হইবে।

মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পূর্বে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, বড়োমানুষের ছেলের সঙ্গে মেশামেশি করিয়া সে যেন আমোদপ্রমোদে মাতিয়া না ওঠে। কেবল মাতার আদেশ বলিয়া নহে, কালীপদকে যে দৈন্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়া বড়োমানুষের ছেলের সঙ্গে মেলা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে কোনোদিন শৈলেনের কাছে ঘেঁষে নাই— এবং যদিও সে জানিত, শৈলেনের মন পাইলে তাহার প্রতিদিনের অনেক দুরূহ সমস্যা এক মুহূর্তেই সহজ হইয়া যাইতে পারে, তবু কোনো কঠিন সংকটেও তাহার প্রসাদলাভের প্রতি কালীপদর লোভ আকৃষ্ট হয় নাই। সে আপনার অভাব লইয়া আপনার দারিদ্র্যের নিভৃত অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিত।

গরিব হইয়া তবু দূরে থাকিবে, শৈলেন এই অহংকারটা কোনোমতেই সহিতে পারিল না। তাহা ছাড়া, অশনে বসনে কালীপদর দারিদ্র্যটা এতই প্রকাশ্য যে তাহা নিতান্ত দৃষ্টিকটু। তাহার অত্যন্ত দীনহীন কাপড়-চোপড় এবং মশারি-বিছানা যখনই দোতলার সিঁড়ি উঠিতে চোখে পড়িত তখনই সেটা যেন একটা অপরাধ বলিয়া মনে বাজিত। ইহার পরে, তাহার গলায় তাবিজ ঝুলানো, এবং সে দুইসন্ধ্যা যথাবিধি আহ্নিক করিত। তাহার এই-সকল অদ্ভুত গ্রাম্যতা উপরের দলের পক্ষে বিষম হাস্যকর ছিল। শৈলেনের পক্ষের দুই-একটি লোক এই নিভৃতবাসী নিরীহ লোকটির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য দুই-চারিদিন তাহার ঘরে আনাগোনা করিল। কিন্তু, এই মুখচোরা মানুষের মুখ খুলিতে পারিল না। তাহার ঘরে বেশিক্ষণ বসিয়া থাকা সুখকর নহে, স্বাস্থ্যকর তো নয়ই, কাজেই ভঙ্গ দিতে হইল।

তাহাদের পাঁঠার মাংসের ভোজে এই অকিঞ্চনকে একদিন আহ্বান করিলে সে নিশ্চয় কৃতার্থ হইবে, এই কথা মনে করিয়া অনুগ্রহ করিয়া একদা নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হইল। কালীপদ জানাইল, ভোজের ভোজ্য সহ্য করা তাহার সাধ্য নহে, তাহার অভ্যাস

অন্যরূপ। এই প্রত্যাখ্যানে দলবল-সমেত শৈলেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

কিছুদিন তাহার ঠিক উপরের ঘরটাতে এমনি ধুপ্‌ধাপ শব্দ ও সবেগে গান-বাজনা চলিতে লাগিল যে, কালীপদর পক্ষে পড়ায় মন দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। দিনের বেলায় সে যথাসম্ভব গোলদিঘিতে এক গাছের তলে বই লইয়া পড়া করিত এবং রাত্রি থাকিতে উঠিয়া খুব ভোরের দিকে একটা প্রদীপ জ্বালিয়া অধ্যয়নে মন দিত।

কলিকাতায় আহার ও বাসস্থানের কষ্টে এবং অতিপরিশ্রমে কালীপদর একটা মাথা ধরার ব্যামো উপসর্গ জুটিল। কখনো কখনো এমন হইত, তিন-চারি দিন তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইত। সে নিশ্চয় জানিত, এ সংবাদ পাইলে তাহার পিতা তাহাকে কখনোই কলিকাতায় থাকিতে দিবেন না এবং তিনি ব্যাকুল হইয়া হয়তো বা কলিকাতা পর্যন্ত ছুটিয়া আসিবেন। ভবানীচরণ জানিতেন, কলিকাতায় কালীপদ এমন সুখে আছে যাহা গ্রামের লোকের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। পাড়াগাঁয়ে যেমন গাছপালা ঝোপঝাড় আপনিই জন্মে কলিকাতার হাওয়ায় সর্বপ্রকার আরামের উপকরণ যেন সেইরূপ আপনিই উৎপন্ন হয় এবং সকলেই তাহার ফলভোগ করিতে পারে, এইরূপ তাঁহার একটা ধারণা ছিল। কালীপদ কোনোমতেই তাঁহার সে ভুল ভাঙে নাই। অসুখের অত্যন্ত কষ্টের সময়ও সে একদিনও পিতাকে পত্র লিখিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু, এইরূপ পীড়ার দিনে শৈলেনের দল যখন গোলমাল করিয়া ভূতের কাণ্ড করিতে থাকিত তখন কালীপদর কষ্টের সীমা থাকিত না। সে কেবল এপাশ-ওপাশ করিত এবং জনশূন্য ঘরে পড়িয়া মাতাকে ডাকিত ও পিতাকে স্মরণ করিত। দারিদ্র্যের অপমান ও দুঃখ এইরূপে যতই সে ভোগ করিত ততই ইহার বন্ধন হইতে তাহার পিতামাতাকে মুক্ত করিবেই এই প্রতিজ্ঞা তাহার মনে কেবলই দৃঢ় হইয়া উঠিত।

কালীপদ নিজেকে অত্যন্ত সংকুচিত করিয়া সকলের লক্ষ হইতে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে উৎপাত কিছুমাত্র কমিল না। কোনোদিন বা সে দেখিল, তাহার চিনাবাজারের পুরাতন সস্তা জুতার এক পাটির পরিবর্তে একটি অতি উত্তম বিলাতি জুতার পাটি। এরূপ বিসদৃশ জুতা পরিয়া কলেজে যাওয়াই অসম্ভব। সে এ সম্বন্ধে কোনো নালিশ না করিয়া পরের জুতার পাটি ঘরের বাহিরে রাখিয়া দিল এবং জুতা-মেরামতওয়ালা মুচির নিকট হইতে অল্প দামের পুরাতন জুতা কিনিয়া কাজ চালাইতে লাগিল। একদিন উপর হইতে একজন ছেলে হঠাৎ কালীপদর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ভুলিয়া আমার ঘর হইতে আমার সিগারেটের কেসটা লইয়া আসিয়াছেন। আমি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না।" কালীপদ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমি আপনাদের ঘরে যাই নাই।" "এই-যে, এইখানেই আছে" বলিয়া সেই লোকটি ঘরের এক কোণ হইতে মূল্যবান একটি সিগারেটের কেস্‌ তুলিয়া লইয়া আর কিছু না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

কালীপদ মনে মনে স্থির করিল, 'এফ. এ. পরীক্ষায় যদি ভালোরকম বৃত্তি পাই তবে এই মেস ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।'

মেসের ছেলেরা মিলিয়া প্রতিবৎসর ধুম করিয়া সরস্বতীপূজা করে। তাহার ব্যয়ের প্রধান অংশ শৈলেন বহন করে, কিন্তু সকল ছেলেই চাঁদা দিয়া থাকে। গত

বৎসর নিতান্তই অবজ্ঞা করিয়া কালীপদর কাছে কেহ চাঁদা চাহিতেও আসে নাই। এ বৎসর কেবল তাহাকে বিরক্ত করিবার জন্যই তাহার নিকট চাঁদার খাতা আনিয়া ধরিল। যে দলের নিকট হইতে কোনোদিন কালীপদ কিছুমাত্র সাহায্য লয় নাই, যাহাদের প্রায় নিত্য-অনুষ্ঠিত আমোদপ্রমোদে যোগ দিবার সৌভাগ্য সে একেবারে অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা যখন কালীপদর কাছে চাঁদার সাহায্য চাহিতে আসিল তখন জানি না সে কী মনে করিয়া পাঁচটা টাকা দিয়া ফেলিল। পাঁচ টাকা শৈলেন তাহার দলের লোক কাহারও নিকট হইতে পায় নাই।

কালীপদর দারিদ্র্যের কৃপণতায় এ-পর্যন্ত সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার এই পাঁচ টাকা দান তাহাদের একেবারে অসহ্য হইল। 'উহার অবস্থা যে কিরূপ তাহা তো আমাদের অগোচর নাই, তবে উহার এত বড়াই কিসের। ও যে দেখি সকলকে টেক্কা দিতে চায়!'

সরস্বতীপূজা ধুম করিয়া হইল—কালীপদ যে পাঁচটা টাকা দিয়াছিল তাহা না দিলেও কোনো ইতরবিশেষ হইত না। কিন্তু, কালীপদর পক্ষে সে কথা বলা চলে না। পরের বাড়িতে তাহাকে খাইতে হইত—সকল দিন সময়মতো আহার জুটিত না। তা ছাড়া, পাকশালার ভৃত্যরাই তাহার ভাগ্যবিধাতা, সুতরাং ভালোমন্দ কমিবেশি সম্বন্ধে কোনো অপ্রিয় সমালোচনা না করিয়া জলখাবারের জন্য কিছু সম্বল তাহাকে হাতে রাখিতেই হইত। সেই সংগতিটুকু গাঁদাফুলের শুষ্ক স্তূপের সঙ্গে বিসর্জিত দেবীপ্রতিমার পশ্চাতে অন্তর্ধান করিল।

কালীপদর মাথা ধরার উৎপাত বাড়িয়া উঠিল। এবার পরীক্ষায় সে ফেল করিল না বটে, কিন্তু বৃত্তি পাইল না। কাজেই পড়িবার সময় সংকোচ করিয়া তাহাকে আরও একটি টুইশনির জোগাড় করিয়া লইতে হইল। এবং বিস্তর উপদ্রব সত্ত্বেও, বিনা ভাড়ার বাসাটুকু ছাড়িতে পারিল না।

উপরিতলবাসীরা আশা করিয়াছিল, এবার ছুটির পরে নিশ্চয়ই কালীপদ এ মেসে আর আসিবে না। কিন্তু, যথাসময়েই তাহার সেই নীচের ঘরটার তালা খুলিয়া গেল। ধুতির উপর সেই তাহার চিরকেলে চেক-কাটা চায়না-কোট পরিয়া কালীপদ কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং একটা ময়লা-কাপড়ে-বাঁধা মস্ত পুঁটুলি-সমেত টিনের বাক্স নামাইয়া রাখিয়া শেয়ালদহের মুটে তাহার ঘরের সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া অনেক বাদ-প্রতিবাদ করিয়া ভাড়া চুকাইয়া লইল। ঐ পুঁটুলিটার গর্ভে নানা হাঁড়ি খুরি ভাণ্ডের মধ্যে কালীপদর মা কাঁচা-আম কুল চালতা প্রভৃতি উপকরণে নানাপ্রকার মুখরোচক পদার্থ তৈরি করিয়া নিজে সাজাইয়া দিয়াছেন। কালীপদ জানিত, তাহার অবর্তমানে কৌতুকপরায়ণ উপরতলার দল তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহার আর-কোনো ভাবনা ছিল না, কেবল তাহার বড়ো সংকোচ ছিল পাছে তাহার পিতামাতার কোনো স্নেহের নিদর্শন এই বিদ্রূপকারীদের হাতে পড়ে। তাহার মা তাহাকে যে খাবার জিনিসগুলি দিয়াছেন এ তাহার পক্ষে অমৃত—কিন্তু এ-সমস্তই তাহার দরিদ্র গ্রাম্যঘরের আদরের ধন; যে আধারে সেগুলি রক্ষিত সেই ময়দা দিয়া আঁটা সরা-ঢাকা হাঁড়ি, তাহার মধ্যেও শহরের ঐশ্বর্যসজ্জার কোনো লক্ষণ নাই; তাহা কাচের পাত্র নয়, তাহা চিনামাটির ভাণ্ডও নহে—কিন্তু এইগুলিকে কোনো শহরের ছেলে যে অবজ্ঞা করিয়া দেখিবে, ইহা তাহার পক্ষে একেবারেই

অসহ্য। আগের বারে তাহার এই-সমস্ত বিশেষ জিনিসগুলিকে তক্তাপোশের নীচে পুরানো খবরের কাগজ প্রভৃতি চাপা দিয়া প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। এবারে তালাচাবির আশ্রয় লইল। যখন সে পাঁচ মিনিটের জন্যও ঘরের বাহিরে যাইত ঘরে তালা বন্ধ করিয়া যাইত।

এটা সকলেরই চোখে লাগিল। শৈলেন বলিল, "ধনরত্ন তো বিস্তর! ঘরে ঢুকিলে চোরের চক্ষে জল আসে—সেই ঘরে ঘন ঘন তালা পড়িতেছে—একেবারে দ্বিতীয় 'ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল' হইয়া উঠিল দেখিতেছি। আমাদের কাহাকেও বিশ্বাস নাই—পাছে ঐ পাবনার ছিটের চায়না কোটটার লোভ সামলাইতে না পারি। ওহে রাধু, ওকে একটা ভদ্রগোছের নূতন কোট কিনিয়া না দিলে তো কিছুতেই চলিতেছে না। চিরকাল ওর ঐ একমাত্র কোট দেখিতে দেখিতে আমার বিরক্ত ধরিয়া গেছে।"

শৈলেন কোনোদিন কালীপদর ঐ লোনাধরা চুনবালি-খসা অন্ধকার ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় বাহির হইতে দেখিলেই তাহার সর্বশরীর সংকুচিত হইয়া উঠিত। বিশেষত সন্ধ্যার সময় যখন দেখিত একটা টিম্‌টিমে প্রদীপ লইয়া একলা সেই বায়ুশূন্য বন্ধ ঘরে কালীপদ গা খুলিয়া বসিয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পড়া করিতেছে, তখন তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। দলের লোককে শৈলেন বলিল, "এবারে কালীপদ কোন্‌ সাত রাজার ধন মানিক আহরণ করিয়া আনিয়াছে, সেটা তোমরা খুঁজিয়া বাহির করো।"

এই কৌতুকে সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করিল।

কালীপদর ঘরের তালাটি নিতান্তই অল্প দামের তালা; তাহার নিষেধ খুব প্রবল নিষেধ নহে; প্রায় সকল চাবিতেই এ তালা খোলে। একদিন সন্ধ্যার সময় কালীপদ যখন ছেলে পড়াইতে গিয়াছে, সেই অবকাশে জন দুই-তিন অত্যন্ত আমুদে ছেলে হাসিতে হাসিতে তালা খুলিয়া একটা লণ্ঠন হাতে তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। তক্তাপোশের নীচে হইতে আচার চাটনি আমসত্ত্ব প্রভৃতির ভাণ্ডগুলিকে আবিষ্কার করিল। কিন্তু, সেগুলি যে বহুমূল্য গোপনীয় সামগ্রী তাহা তাহাদের মনে হইল না।

খুঁজিতে খুঁজিতে বালিশের নীচে হইতে রিং-সমেত এক চাবি বাহির হইল। সেই চাবি দিয়া টিনের বাক্সটা খুলিতেই কয়েকটা ময়লা-কাপড় বই খাতা কাঁচি ছুরি কলম ইত্যাদি চোখে পড়িল। বাক্স বন্ধ করিয়া তাহারা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে সমস্ত কাপড়-চোপড়ের নীচে রুমালে মোড়া একটা কী পদার্থ বাহির হইল। রুমাল খুলিতেই ছেঁড়া কাপড়ের মোড়ক দেখা দিল। সেই মোড়কটি খোলা হইলে একটির পর আর-একটি প্রায় তিন-চারখানা কাগজের আবরণ ছাড়াইয়া ফেলিয়া একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট বাহির হইয়া পড়িল।

এই নোটখানা দেখিয়া আর কেহ হাসি রাখিতে পারিল না। হো-হো করিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। সকলেই স্থির করিল, এই নোটখানারই জন্য কালীপদ ঘন ঘন ঘরে চাবি লাগাইতেছে, পৃথিবীর কোনো লোককেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। লোকটার কৃপণতা এবং সন্দিগ্ধ প্রকৃতিতে শৈলেনের প্রসাদপ্রত্যাশী সহচরগুলি বিস্মিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ মনে হইল, রাস্তায় কালীপদর মতো যেন কাহার কাশি শোনা

গেল। তৎক্ষণাৎ বাক্সটার ডালা বন্ধ করিয়া, নোটখানা হাতে লইয়াই তাহারা উপরে ছুটিল। একজন তাড়াতাড়ি দরজায় তালা লাগাইয়া দিল।

শৈলেন সেই নোটখানা দেখিয়া অত্যন্ত হাসিল। পঞ্চাশ টাকা শৈলেনের কাছে কিছুই নয়, তবু এত টাকাও যে কালীপদর বাক্সে ছিল তাহা তাহার ব্যবহার দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিত না। তাহার পরে আবার এই নোটটুকুর জন্য এত সাবধান! সকলেই স্থির করিল, দেখা যাক এই টাকাটা খোয়া গিয়া এই অদ্ভুত লোকটি কিরকম কাণ্ডটা করে।

রাত্রি নটার পর ছেলে পড়াইয়া শ্রান্তদেহে কালীপদ ঘরের অবস্থা কিছুই লক্ষ্য করে নাই। বিশেষত, মাথা তাহার যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল। বুঝিয়াছিল, এখন কিছুদিন তাহার এই মাথার যন্ত্রণা চলিবে।

পরদিন সে কাপড় বাহির করিবার জন্য তক্তাপোশের নীচে হইতে টিনের বাক্সটা টানিয়া দেখিল বাক্সটা খোলা। যদিচ কালীপদ স্বভাবত অসাবধান নয় তবু তাহার মনে হইল, হয়তো সে চাবি বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। কারণ, ঘরে যদি চোর আসিত তবে বাহিরের দরজায় তালা বন্ধ থাকিত না।

বাক্স খুলিয়া দেখে, তাহার কাপড়-চোপড় সমস্ত উলট-পালট। তাহার বুক দমিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সমস্ত জিনিসপত্র বাহির করিয়া দেখিল, তাহার সেই মাতৃদত্ত নোটখানি নাই। কাগজ ও কাপড়ের মোড়কগুলা আছে। বার বার করিয়া কালীপদ সমস্ত কাপড় সবলে ঝাড়া দিতে লাগিল, নোট বাহির হইল না। এ দিকে উপরের তলার দুই-একটি করিয়া লোক যেন আপনার কাজে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সেই ঘরটার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বারবার উঠানামা করিতে লাগিল। উপরে অট্টহাস্যের ফোয়ারা খুলিয়া গেল।

যখন নোটের কোনো আশাই রহিল না এবং মাথার কষ্টে যখন জিনিসপত্র নাড়ানাড়ি করা তাহার পক্ষে আর সম্ভবপর হইল না তখন সে বিছানার উপর উপুড় হইয়া মৃতদেহের মতো পড়িয়া রহিল। এই তাহার মাতার অনেক দুঃখের নোট-খানি—জীবনের কত মুহূর্তকে কঠিন যন্ত্রে পেষণ করিয়া দিনে দিনে একটু একটু করিয়া এই নোটখানি সঞ্চিত হইয়াছে। একদা এই দুঃখের ইতিহাস সে কিছুই জানিত না, সেদিন সে তাহার মাতার ভারের উপর ভার কেবল বাড়াইয়াছে, অবশেষে যেদিন মা তাহাকে তাঁহার প্রতিদিনের নিয়ত-আবর্তমান দুঃখের সঙ্গী করিয়া লইলেন সেদিনকার মতো এমন গৌরব সে তাহার বয়সে আর-কখনো ভোগ করে নাই। কালীপদ আপনার জীবনে সব-চেয়ে যে বড়ো বাণী, যে মহত্তম আশীর্বাদ পাইয়াছে এই নোটখানির মধ্যে তাহাই পূর্ণ হইয়া ছিল। সেই তাহার মাতার অতল-স্পর্শ স্নেহসমুদ্র-মন্থন-করা অমূল্য দুঃখের উপহারটুকু চুরি যাওয়াকে সে একটা পৈশাচিক অভিশাপের মতো মনে করিল। পাশের সিঁড়ির উপর দিয়া পায়ের শব্দ আজ বারবার শোনা যাইতে লাগিল। অকারণ ওঠা এবং নামার আজ আর বিরাম নাই। গ্রামে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে, আর ঠিক তাহার পাশ দিয়াই কৌতুকের কলশব্দে নদী অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছে—এও সেইরকম।

উপরের তলায় অট্টহাস্য শুনিয়া এক সময়ে কালীপদর হঠাৎ মনে হইল, এ চোরের কাজ নয়। এক মুহূর্তে সে বুঝিতে পারিল, শৈলেন্দ্রের দল কৌতুক করিয়া

তাহার এই নোট লইয়া গিয়াছে। চোরে চুরি করিলেও তাহার মনে এত বাজিত না। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন ধনমদগর্বিত যুবকেরা তাহার মায়ের গায়ে হাত তুলিয়াছে। এতদিন কালীপদ এই মেসে আছে, এই সিঁড়িটুকু বাহিয়া একদিনও সে উপরের তলায় পদার্পণও করে নাই। আজ— তাহার গায়ে সেই ছেঁড়া গেঞ্জি, পায়ে জুতা নাই, মনের আবেগে এবং মাথা ধরার উত্তেজনায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে— সবেগে সে উপরে উঠিয়া পড়িল।

আজ রবিবার— কলেজে যাইবার উপসর্গ ছিল না, কাঠের ছাদ-ওয়ালা বারান্দায় বন্ধুগণ কেহ বা চৌকিতে, কেহ বা বেতের মোড়ায় বসিয়া, হাস্যালাপ করিতেছিল। কালীপদ তাহাদের মাঝখানে ছুটিয়া পড়িয়া ক্রোধগদ্‌গদস্বরে বলিয়া উঠিল, "দিন, আমার নোট দিন।"

যদি সে মিনতির সুরে বলিত তবে ফল পাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু, উন্মত্তবৎ ক্রুদ্ধমূর্তি দেখিয়া শৈলেন অত্যন্ত খাপা হইয়া উঠিল। যদি তাহার বাড়ির দারোয়ান থাকিত তবে তাহাকে দিয়া এই অসভ্যকে কান ধরিয়া দূর করিয়া দিত, সন্দেহ নাই। সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া একত্রে গর্জন করিয়া উঠিল, "কী বলেন, মশায়! কিসের নোট!"

কালীপদ কহিল, "আমার বাক্স থেকে আপনারা নোট নিয়ে এসেছেন।"

"এত বড়ো কথা! আমাদের চোর বলতে চান!"

কালীপদর হাতে যদি কিছু থাকিত তবে সেই মুহূর্তেই সে খুনোখুনি করিয়া ফেলিত। তাহার রকম দেখিয়া চার-পাঁচ জনে মিলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সে জালবদ্ধ বাঘের মতো গুমরাইতে লাগিল।

এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার তাহার কোনো শক্তি নাই, কোনো প্রমাণ নাই— সকলেই তাহার সন্দেহকে উন্মত্ততা বলিয়া উড়াইয়া দিবে। যাহারা তাহাকে মৃত্যুবাণ মারিয়াছে তাহারা তাহার ঔদ্ধত্যকে অসহ্য বলিয়া বিষম আস্ফালন করিতে লাগিল।

সে রাত্রি যে কালীপদর কেমন করিয়া কাটিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না। শৈলেন একখানা এক-শো টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, "দাও, বাঙালটাকে দিয়ে এসো গে যাও।"

সহচররা কহিল, "পাগল হয়েছ! তেজটুকু আগে মরুক— আমাদের সকলের কাছে একটা রিট্‌ন্ অ্যাপলজি আগে দিক, তার পরে বিবেচনা করে দেখা যাবে।"

যথাসময়ে সকলে শুইতে গেল এবং ঘুমাইয়া পড়িতেও কাহারও বিলম্ব হইল না। সকালে কালীপদর কথা প্রায় সকলে ভুলিয়াই গিয়াছিল। সকালে কেহ কেহ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় তাহার ঘর হইতে কথা শুনিতে পাইল। ভাবিল, হয়তো উকিল ডাকিয়া পরামর্শ করিতেছে। দরজা ভিতর হইতে খিল-লাগানো। বাহিরে কান পাতিয়া যাহা শুনিল তাহার মধ্যে আইনের কোনো সংস্রব নাই, সমস্ত অসম্বন্ধ প্রলাপ।

উপরে গিয়া শৈলেনকে খবর দিল। শৈলেন নামিয়া আসিয়া দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কালীপদ কী-যে বকিতেছে ভালো বোঝা যাইতেছে না, কেবল ক্ষণে ক্ষণে 'বাবা' 'বাবা' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

ভয় হইল, হয়তো সে নোটের শোকে পাগল হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে দুই-

তিনবার ডাকিল, "কালীপদবাবু!" কেহ কোনো সাড়া দিল না। কেবল সেই বিড়্‌ বিড়্‌ বকুনি চলিতে লাগিল। শৈলেন পুনশ্চ উচ্চস্বরে কহিল, "কালীপদবাবু, দরজা খুলুন, আপনার সেই নোট পাওয়া গেছে।" দরজা খুলিল না, কেবল বকুনির গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল।

ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াইবে তাহা শৈলেন কল্পনাও করে নাই। সে মুখে তাহার অনুচরদের কাছে অনুতাপবাক্য প্রকাশ করিল না। কিন্তু, তাহার মনের মধ্যে বিঁধিতে লাগিল। সে বলিল, "দরজা ভাঙিয়া ফেলা যাক।"

কেহ কেহ পরামর্শ দিল, "পুলিশ ডাকিয়া আনো— কী জানি পাগল হইয়া যদি হঠাৎ কিছু করিয়া বসে— কাল যেরকম কাণ্ড দেখিয়াছি— সাহস হয় না।"

শৈলেন কহিল, "না— শীঘ্র একজন গিয়া অনাদি ডাক্তারকে ডাকিয়া আনো।"

অনাদি ডাক্তার বাড়ির কাছেই থাকেন। তিনি আসিয়া দরজায় কান দিয়া বলিলেন, "এ তো বিকার বলিয়াই বোধ হয়।"

দরজা ভাঙিয়া ভিতরে গিয়া দেখা গেল— তক্তাপোশের উপর এলোমেলো বিছানা খানিকটা ভ্রষ্ট হইয়া মাটিতে লুটাইতেছে। কালীপদ মেজের উপর পড়িয়া— তাহার চেতনা নাই। সে গড়াইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে হাত-পা ছুঁড়িতেছে এবং প্রলাপ বকিতেছে; তাহার রক্তবর্ণ চোখদুটা খোলা এবং তাহার মুখে যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে।

ডাক্তার তাহার পাশে বসিয়া অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার আত্মীয় কেহ আছে?"

শৈলেনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বলুন দেখি।"

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "খবর দেওয়া ভালো, লক্ষণ ভালো নয়।"

শৈলেন কহিল, "ইঁহাদের সঙ্গে আমাদের ভালো আলাপ নাই— আত্মীয়ের খবর কিছুই জানি না। সন্ধান করিব। কিন্তু, ইতিমধ্যে কী করা কর্তব্য।"

ডাক্তার কহিলেন, "এ ঘর হইতে রোগীকে এখনই দোতলার কোনো ভালো ঘরে লইয়া যাওয়া উচিত। দিনরাত শুশ্রূষার ব্যবস্থা করাও চাই।"

শৈলেন রোগীকে তাহার নিজের ঘরে লইয়া গেল। তাহার সহচরদের সকলকে ভিড় করিতে নিষেধ করিয়া ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিল। কালীপদর মাথায় বরফের পুঁটুলি লাগাইয়া নিজের হাতে বাতাস করিতে লাগিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই বাড়ির উপরতলার দলে পাছে কোনোপ্রকার অবজ্ঞা বা পরিহাস করে এইজন্য নিজের পিতামাতার সকল পরিচয় কালীপদ ইহাদের নিকট হইতে গোপন করিয়া চলিয়াছে। নিজে তাঁহাদের নামে যে চিঠি লিখিত তাহা সাবধানে ডাকঘরে দিয়া আসিত এবং ডাকঘরের ঠিকানাতেই তাহার নামে চিঠি আসিত— প্রত্যহ সে নিজে গিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিত।

কালীপদর বাড়ির পরিচয় লইবার জন্য আর-একবার তাহার বাক্স খুলিতে হইল। তাহার বাক্সের মধ্যে দুই তাড়া চিঠি ছিল। প্রত্যেক তাড়াটি অতিযত্নে ফিতা দিয়া বাঁধা। একটি তাড়াতে তাহার মাতার চিঠি, আর-একটিতে তাহার পিতার। মায়ের চিঠি সংখ্যায় অল্পই, পিতার চিঠিই বেশি।

চিঠিগুলি হাতে করিয়া আনিয়া শৈলেন দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং রোগীর

বিছানার পার্শ্বে বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে ঠিকানা পড়িয়াই একেবারে চমকিয়া উঠিল। শানিয়াড়ি, চৌধুরীবাড়ি, ছয়-আনি! নীচে নাম দেখিল, ভবানীচরণ দেবশর্মা। ভবানীচরণ চৌধুরী!

চিঠি রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া সে কালীপদর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুদিন পূর্বে একবার তাহার সহচরদের মধ্যে কে একজন বলিয়াছিল, তাহার মুখের সঙ্গে কালীপদর মুখের অনেকটা আদল আসে। সে কথাটা তাহার শুনিতে ভালো লাগে নাই এবং অন্য সকলে তাহা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছিল। আজ বুঝিতে পারিল, সে কথাটা অমূলক নহে। তাহার পিতামহরা দুই ভাই ছিলেন— শ্যামাচরণ এবং ভবানীচরণ, এ কথা সে জানিত। তাহার পরবর্তীকালের ইতিহাস তাহাদের বাড়িতে কখনো আলোচিত হয় নাই। ভবানীচরণের যে পুত্র আছে এবং তাহার নাম কালীপদ, তাহা সে জানিতই না। এই কালীপদ! এই তাহার খুড়া!

শৈলেনের তখন মনে পড়িতে লাগিল, শৈলেনের পিতামহী, শ্যামাচরণের স্ত্রী যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, শেষ পর্যন্ত পরম স্নেহে তিনি ভবানীচরণের কথা বলিতেন। ভবানীচরণের নাম করিতে তাঁহার দুই চক্ষে জল ভরিয়া উঠিত। ভবানীচরণ তাঁহার দেবর বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রের চেয়ে বয়সে ছোটো— তাহাকে তিনি আপন ছেলের মতোই মানুষ করিয়াছেন। বৈষয়িক বিপ্লবে যখন তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া গেলেন তখন ভবানীচরণের একটু খবর পাইবার জন্য তাঁহার বক্ষ তৃষিত হইয়া থাকিত। তিনি বারবার তাঁহার ছেলেদের বলিয়াছেন, "ভবানীচরণ নিতান্ত অবুঝ ভালোমানুষ বলিয়া নিশ্চয়ই তোরা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছিস— আমার শ্বশুর তাহাকে এত ভালোবাসিতেন, তিনি যে তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া যাইবেন, এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।" তাঁহার ছেলেরা এ-সব কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হইত এবং শৈলেনের মনে পড়িল, সেও তাহার পিতামহীর উপর অত্যন্ত রাগ করিত। এমন-কি, পিতামহী তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন বলিয়া ভবানীচরণের উপরেও তাহার ভারি রাগ হইত। বর্তমানে ভবানীচরণের যে এমন দরিদ্র অবস্থা তাহাও সে জানিত না— কালীপদর অবস্থা দেখিয়া সকল কথা সে বুঝিতে পারিল এবং এতদিন সহস্র প্রলোভন-সত্ত্বেও কালীপদ যে তাহার অনুচরশ্রেণীতে ভর্তি হয় নাই ইহাতে সে ভারি গৌরব অনুভব করিল। যদি দৈবাৎ কালীপদ তাহার অনুবর্তী হইত তবে আজ যে তাহার লজ্জার সীমা থাকিত না।

৪

শৈলেনের দলের লোকেরা এতদিন প্রত্যহই কালীপদকে পীড়ন ও অপমান করিয়াছে। এই বাসাতে তাহাদের মাঝখানে কাকাকে শৈলেন রাখিতে পারিল না। ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া অতিযত্নে তাহাকে একটা ভালো বাড়িতে স্থানান্তরিত করিল।

ভবানীচরণ শৈলেনের চিঠি পাইয়া একটি সঙ্গী আশ্রয় করিয়া তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন। আসিবার সময় ব্যাকুল হইয়া রাসমণি তাঁহার কষ্ট-সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই তাঁহার স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখো যেন অযত্ন না হয়। যদি তেমন বোঝ আমাকে খবর দিলেই আমি যাব।" চৌধুরীবাড়ির বধূর

পক্ষে হট্ হট্ করিয়া কলিকাতায় যাওয়ার প্রস্তাব এতই অসংগত যে, প্রথম সংবাদেই তাঁহার যাওয়া ঘটিল না। তিনি রক্ষাকালীর নিকট মানত করিলেন এবং গ্রহাচার্যকে ডাকিয়া স্বস্ত্যয়ন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ভবানীচরণ কালীপদর অবস্থা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কালীপদর তখন ভালো করিয়া জ্ঞান হয় নাই; সে তাঁহাকে মাস্টারমশায় বলিয়া ডাকিল—ইহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল। কালীপদ প্রায় মাঝে মাঝে প্রলাপে 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল—তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চস্বরে বলিতেছিলেন, "এই-যে বাবা, এই-যে আমি এসেছি।" কিন্তু সে যে তাঁকে চিনিয়াছে এমন ভাব প্রকাশ করিল না।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "জ্বর পূর্বের চেয়ে কিছু কমিয়াছে, হয়তো এবার ভালোর দিকে যাইবে।" কালীপদ ভালোর দিকে যাইবে না, এ কথা ভবানীচরণ মনেই করিতে পারেন না। বিশেষত, তাহার শিশুকাল হইতে সকলেই বলিয়া আসিতেছে, কালীপদ বড়ো হইয়া একটা অসাধ্য সাধন করিবে—সেটাকে ভবানীচরণ কেবলমাত্র লোকমুখের কথা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই—সে বিশ্বাস একেবারে তাঁহার সংস্কারগত হইয়া গিয়াছিল। কালীপদকে বাঁচিতেই হইবে, এ তাহার ভাগ্যের লিখন।

এই কারণে, ডাক্তার যতটুকু ভালো বলে তিনি তাহার চেয়ে অনেক বেশি ভালো শুনিয়া বসেন এবং রাসমণিকে যে পত্র লেখেন তাহাতে আশঙ্কার কোনো কথাই থাকে না।

শৈলেন্দ্রের ব্যবহারে ভবানীচরণ একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে যে তাঁহার পরমাত্মীয় নহে, এ কথা কে বলিবে। বিশেষত, কলিকাতার সুশিক্ষিত সুসভ্য ছেলে হইয়াও সে তাঁহাকে যেরকম ভক্তিশ্রদ্ধা করে এমন তো দেখা যায় না। তিনি ভাবিলেন, কলিকাতার ছেলেদের বুঝি এইপ্রকারই স্বভাব। মনে মনে ভাবিলেন, 'সে তো হবারই কথা, আমাদের পাড়াগেঁয়ে ছেলেদের শিক্ষাই বা কী আর সহবতই বা কী।'

জ্বর কিছু কিছু কমিতে লাগিল এবং কালীপদ ক্রমে চৈতন্য লাভ করিল। পিতাকে শয্যার পাশে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল; ভাবিল, তাহার কলিকাতার অবস্থার কথা এইবার তাহার পিতার কাছে ধরা পড়িবে। তাহার চেয়ে ভাবনা এই যে, তাহার গ্রাম্য পিতা শহরের ছেলেদের পরিহাসের পাত্র হইয়া উঠিবেন। চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে ভাবিয়া পাইল না, এ কোন্ ঘর। মনে হইল 'এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি!'

তখন তাহার বেশি-কিছু চিন্তা করিবার শক্তি ছিল না। তাহার মনে হইল, অসুখের খবর পাইয়া তাহার পিতা আসিয়া একটা ভালো বাসায় আনিয়া রাখিয়াছেন। কী করিয়া আনিলেন, তাহার খরচ কোথা হইতে জোগাইতেছেন, এত খরচ করিতে থাকিলে পরে কিরূপ সংকট উপস্থিত হইবে, সে-সব কথা ভাবিবার তাহার সময় নাই। এখন তাহাকে বাঁচিয়া উঠিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত পৃথিবীর উপর তাহার যেন দাবি আছে।

এক সময়ে যখন তাহার পিতা ঘরে ছিলেন না এমন সময় শৈলেন একটি পাত্রে কিছু ফল লইয়া তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালীপদ অবাক হইয়া

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—ভাবিতে লাগিল, ইহার মধ্যে কিছু পরিহাস আছে নাকি। প্রথম কথা তাহার মনে হইল এই যে, পিতাকে তো ইহার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

শৈলেন ফলের পাত্র টেবিলের উপর রাখিয়া পায়ে ধরিয়া কালীপদকে প্রণাম করিল এবং কহিল, "আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, আমাকে মাপ করুন।"

কালীপদ শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। শৈলেনের মুখ দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল, তাহার মনে কোনো কপটতা নাই। প্রথম যখন কালীপদ মেসে আসিয়াছিল, এই যৌবনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া কতবার তাহার মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে আপনার দারিদ্র্যের সংকোচে কোনোদিন ইহার নিকটেও আসে নাই। যদি সে সমকক্ষ লোক হইত, যদি বন্ধুর মতো ইহার কাছে আসিবার অধিকার তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত, তবে সে কত খুশিই হইত—কিন্তু পরস্পর অত্যন্ত কাছে থাকিলেও মাঝখানে অপার ব্যবধান লঙ্ঘন করিবার উপায় ছিল না। সিঁড়ি দিয়া যখন শৈলেন উঠিত বা নামিত তখন তাহার শৌখিন চাদরের সুগন্ধ কালীপদর অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিত—তখন সে পড়া ছাড়িয়া একবার এই হাস্যপ্রফুল্ল চিন্তা-রেখাহীন তরুণ মুখের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারিত না। সেই মুহূর্তে কেবল ক্ষণকালের জন্য তাহার সেই স্যাঁৎসেঁতে কোণের ঘরে দূর সৌন্দর্যলোকের ঐশ্বর্য-বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটা আসিয়া পড়িত। তাহার পরে সেই শৈলেনের নির্দয় তারুণ্য তাহার কাছে কিরূপ সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সকলেরই জানা আছে। আজ শৈলেন যখন ফলের পাত্র বিছানায় তাহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঐ সুন্দর মুখের দিকে কালীপদ আর-একবার তাকাইয়া দেখিল। ক্ষমার কথা সে মুখে কিছুই উচ্চারণ করিল না—আস্তে আস্তে ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল—ইহাতে যাহা বলিবার তাহা বলা হইয়া গেল।

কালীপদ প্রত্যহ আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিল, তাহার গ্রাম্য পিতা ভবানীচরণের সঙ্গে শৈলেনের খুব ভাব জমিয়া উঠিল। শৈলেন তাঁহাকে ঠাকুরদা বলে, এবং পরস্পরের মধ্যে অবাধে ঠাট্টাতামাশা চলে। তাহাদের উভয় পক্ষের হাস্যকৌতুকের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন অনুপস্থিত ঠাকরুনদিদি। এতকাল পরে এই পরিহাসের দক্ষিণবায়ুর হিল্লোলে ভবানীচরণের মনে যেন যৌবনস্মৃতি পুলক সঞ্চার করিতে লাগিল। ঠাকরুনদিদির স্বহস্তরচিত আচার আমসত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তই শৈলেন রোগীর অনবধানতার অবকাশে চুরি করিয়া নিঃশেষে খাইয়া ফেলিয়াছে, এ কথা আজ সে নির্লজ্জভাবে স্বীকার করিল। এই চুরির খবরে কালীপদর মনে বড়ো একটি গভীর আনন্দ হইল। তাহার মায়ের হাতের সামগ্রী সে বিশ্বের লোককে ডাকিয়া খাওয়াইতে চায়, যদি তাহারা ইহার আদর বোঝে। কালীপদর কাছে আজ নিজের রোগের শয্যা আনন্দসভা হইয়া উঠিল—এমন সুখ তাহার জীবনে সে অল্পই পাইয়াছে। কেবল ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হইতে লাগিল, আহা, মা যদি থাকিতেন! তাহার মা থাকিলে এই কৌতুকপরায়ণ সুন্দর যুবকটিকে যে কত স্নেহ করিতেন, সেই কথা সে কল্পনা করিতে লাগিল।

তাহাদের রুগ্‌ণকক্ষসভায় কেবল একটা আলোচনার বিষয় ছিল যেটাতে আনন্দ-প্রবাহে মাঝে মাঝে বড়ো বাধা দিত। কালীপদর মনে যেন দারিদ্র্যের একটা অভিমান

ছিল— কোনো-এক সময়ে তাহাদের প্রচুর ঐশ্বর্য ছিল এ কথা লইয়া বৃথা গর্ব করিতে তাহার ভারি লজ্জা বোধ হইত। 'আমরা গরিব' এ কথাটাকে কোনো 'কিন্তু' দিয়া চাপা দিতে সে মোটেই রাজি ছিল না। ভবানীচরণও যে তাঁহাদের ঐশ্বর্যের দিনের কথা গর্ব করিয়া পাড়িতেন তাহা নহে। কিন্তু, সে যে তাঁহার সুখের দিন ছিল, তখন তাঁহার যৌবনের দিন ছিল। বিশ্বাসঘাতক সংসারের বীভৎসমূর্তি তখনো ধরা পড়ে নাই। বিশেষত, শ্যামাচরণের স্ত্রী, তাঁহার পরমস্নেহশালিনী ভ্রাতৃজায়া রমাসুন্দরী, যখন তাঁহাদের সংসারে গৃহিণী ছিলেন তখন সেই লক্ষ্মীর ভরা ভাণ্ডারের দ্বারে দাঁড়াইয়া কী অজস্র আদরই তাঁহারা লুঠিয়াছিলেন— সেই অস্তমিত সুখের দিনের স্মৃতির ছটাতেই তো ভবানীচরণের জীবনের সন্ধ্যা সোনায় মণ্ডিত হইয়া আছে। কিন্তু, এই-সমস্ত সুখস্মৃতি-আলোচনার মাঝখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই সেই উইল-চুরির কথাটা আসিয়া পড়ে। ভবানীচরণ এই প্রসঙ্গে ভারি উত্তেজিত হইয়া পড়েন। এখনও সে উইল পাওয়া যাইবে, এ সম্বন্ধে তাঁহার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই— তাঁহার সতীসাধ্বী মার কথা কখনোই ব্যর্থ হইবে না। এই কথা উঠিয়া পড়িলেই কালীপদ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিত। সে জানিত, এটা তাহার পিতার একটা পাগলামি মাত্র। তাহারা মায়ে ছেলেয় এই পাগলামিকে আপসে প্রশ্রয়ও দিয়াছে, কিন্তু শৈলেনের কাছে তাহার পিতার এই দুর্বলতা প্রকাশ পায় এ তাহার কিছুতেই ভালো লাগে না। কতবার সে পিতাকে বলিয়াছে, "না বাবা, ওটা তোমার একটা মিথ্যা সন্দেহ।" কিন্তু, এরূপ তর্কে উলটা ফল হইত। তাঁহার সন্দেহ যে অমূলক নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত ঘটনা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বিবৃত করিতে থাকিতেন। তখন কালীপদ নানা চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাঁহাকে থামাইতে পারিত না।

বিশেষত, কালীপদ ইহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে, এই প্রসঙ্গটা কিছুতেই শৈলেনের ভালো লাগে না। এমন-কি, সেও বিশেষ একটু যেন উত্তেজিত হইয়া ভবানীচরণের যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিত। অন্য-সকল বিষয়েই ভবানীচরণ আর-সকলের মত মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু এই বিষয়টাতে তিনি কাহারও কাছে হার মানিতে পারেন না। তাঁহার মা লিখিতে পড়িতে জানিতেন— তিনি নিজের হাতে তাঁহার পিতার উইল এবং অন্য দলিলটা বাক্সে বন্ধ করিয়া লোহার সিন্দুকে তুলিয়াছেন; অথচ তাঁহার সামনেই মা যখন বাক্স খুলিলেন তখন দেখা গেল, অন্য দলিলটা যেমন ছিল তেমনি আছে অথচ উইলটা নাই, ইহাকে চুরি বলা হইবে না তো কী। কালীপদ তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিত, "তা, বেশ তো বাবা, যারা তোমার বিষয় ভোগ করিতেছে তারা তো তোমার ছেলেরই মতো, তারা তো তোমারই ভাইপো। সে সম্পত্তি তোমার পিতার বংশেই রহিয়াছে— ইহাই কি কম সুখের কথা।" শৈলেন এ-সব কথা বেশিক্ষণ সহিতে পারিত না, সে ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত। কালীপদ মনে মনে পীড়িত হইয়া ভাবিত, শৈলেন হয়তো তাহার পিতাকে অর্থলোলুপ বিষয়ী বলিয়া মনে করিতেছে। অথচ, তাহার পিতার মধ্যে বৈষয়িকতার নামগন্ধ নাই, এ কথা কোনোমতে শৈলেনকে বুঝাইতে পারিলে কালীপদ বড়োই আরাম পাইত।

এতদিনে কালীপদ ও ভবানীচরণের কাছে শৈলেন আপনার পরিচয় নিশ্চয় প্রকাশ করিত। কিন্তু, এই উইল-চুরির আলোচনাতেই তাহাকে বাধা দিল। তাহার পিতা পিতামহ যে উইল চুরি করিয়াছেন এ কথা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না;

অথচ ভবানীচরণের পক্ষে পৈতৃক বিষয়ের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে যে একটা নিষ্ঠুর অন্যায় আছে, সে কথাও সে কোনোমতে অস্বীকার করিতে পারিল না। এখন হইতে এই প্রসঙ্গে কোনোপ্রকার তর্ক করা সে বন্ধ করিয়া দিল—একেবারে সে চুপ করিয়া থাকিত—এবং যদি কোনো সুযোগ পাইত তবে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

এখনো বিকালে একটু অল্প জ্বর আসিয়া কালীপদর মাথা ধরিত কিন্তু সেটাকে সে রোগ বলিয়া গণ্যই করিত না। পড়ার জন্য তাহার মন উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল। একবার তাহার স্কলার্‌শিপ ফস্‌কাইয়া গিয়াছে, আর তো সেরূপ হইলে চলিবে না। শৈলেনকে লুকাইয়া আবার সে পড়িতে আরম্ভ করিল; এ সম্বন্ধে ডাক্তারের কঠোর নিষেধ আছে জানিয়াও সে তাহা অগ্রাহ্য করিল।

ভবানীচরণকে কালীপদ কহিল, "বাবা, তুমি বাড়ি ফিরিয়া যাও—সেখানে মা একলা আছেন। আমি তো বেশ সারিয়া উঠিয়াছি।"

শৈলেনও বলিল, "এখন আপনি গেলে কোনো ক্ষতি নাই। আর তো ভাবনার কারণ কিছু দেখি না। এখন যেটুকু আছে সে দুদিনেই সারিয়া যাইবে। আর, আমরা তো আছি।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "সে আমি বেশ জানি; কালীপদর জন্য ভাবনা করিবার কিছুই নাই। আমার কলিকাতায় আসিবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না, তবু মন মানে কই, ভাই। বিশেষত তোমার ঠাকরুনদিদি যখন যেটি ধরেন সে তো আর ছাড়াইবার জো নাই।"

শৈলেন হাসিয়া কহিল, "ঠাকুরদা, তুমিই তো আদর দিয়া ঠাকরুনদিদিকে একেবারে মাটি করিয়াছ।"

ভবানীচরণ হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা ভাই, আচ্ছা, ঘরে যখন নাতবউ আসিবে তখন তোমার শাসনপ্রণালীটা কিরকম কঠোর আকার ধারণ করে দেখা যাইবে।"

ভবানীচরণ একান্তভাবে রাসমণির সেবায় পালিত জীব। কলিকাতার নানাপ্রকার আরাম-আয়োজনও রাসমণির আদরযত্নের অভাব কিছুতেই পূরণ করিতে পারিতেছিল না। এই কারণে ঘরে যাইবার জন্য তাঁহাকে বড়ো বেশি অনুরোধ করিতে হইল না।

সকালবেলায় জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন, এমন সময় কালীপদর ঘরে গিয়া দেখিলেন তাহার মুখচোখ অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছে—তাহার গা যেন আগুনের মতো গরম। কাল অর্ধেক রাত্রি সে লজিক মুখস্ত করিয়াছে, বাকি রাত্রি এক নিমেষের জন্যও ঘুমাইতে পারে নাই।

কালীপদর দুর্বলতা তো সারিয়া উঠে নাই, তাহার উপরে আবার রোগের প্রবল আক্রমণ দেখিয়া ডাক্তার বিশেষ চিন্তিত হইলেন। শৈলেনকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "এবার তো গতিক ভালো বোধ করিতেছি না।"

শৈলেন ভবানীচরণকে কহিল, "দেখো ঠাকুরদা, তোমারও কষ্ট হইতেছে, রোগীরও বোধ হয় ঠিক তেমন সেবা হইতেছে না, তাই আমি বলি, আর দেরি না করিয়া ঠাকরুন-দিদিকে আনানো যাক।"

শৈলেন যতই ঢাকিয়া বলুক, একটা প্রকাণ্ড ভয় আসিয়া ভবানীচরণের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাঁহার হাত-পা থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি

বলিলেন, "তোমরা যেমন ভালো বোঝ তাই করো।"

রাসমণির কাছে চিঠি গেল; তিনি তাড়াতাড়ি বগলাচরণকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া তিনি কেবল কয়েক ঘণ্টা-মাত্র কালীপদকে জীবিত দেখিয়াছিলেন। বিকারের অবস্থায় সে রহিয়া রহিয়া মাকে ডাকিয়াছিল—সেই ধ্বনিগুলি তাঁহার বুকে বিঁধিয়া রহিল।

ভবানীচরণ এই আঘাত সহিয়া যে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন সেই ভয়ে রাসমণি নিজের শোককে ভালো করিয়া প্রকাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না—তাঁহার পুত্র আবার তাঁহার স্বামীর মধ্যে গিয়া বিলীন হইল—স্বামীর মধ্যে আবার দুইজনেরই ভার তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের উপর তিনি তুলিয়া লইলেন। তাঁহার প্রাণ বলিল, 'আর আমার সয় না।' তবু তাঁহাকে সহিতেই হইল।

৫

রাত্রি তখন অনেক। গভীর শোকের একান্ত ক্লান্তিতে কেবল ক্ষণকালের জন্য রাসমণি অচেতন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু, ভবানীচরণের ঘুম হইতেছিল না। কিছুক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিয়া অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস-সহকারে 'দয়াময় হরি' বলিয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন। কালীপদ যখন গ্রামের বিদ্যালয়েই পড়িত, যখন সে কলিকাতায় যায় নাই, তখন সে যে-একটি কোণের ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিত ভবানীচরণ কম্পিত হস্তে একটি প্রদীপ ধরিয়া সেই শূন্যঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসমণির হাতে চিত্র করা ছিন্ন কাঁথাটি এখনো তক্তাপোশের উপর পাতা আছে, তাহার নানা স্থানে এখনো সেই কালির দাগ রহিয়াছে; মলিন দেয়ালের গায়ে কয়লায় আঁকা সেই জ্যামিতির রেখাগুলি দেখা যাইতেছে; তক্তাপোশের এক কোণে কতকগুলি হাতে-বাঁধা ময়লা কাগজের খাতার সঙ্গে তৃতীয়খণ্ড রয়াল-রীডারের ছিন্নাবশেষ আজিও পড়িয়া আছে। আর—হায় হায়—তার ছেলেবয়সের ছোটো পায়ের একপাটি চটি যে ঘরের কোণে পড়িয়া ছিল, তাহা এতদিন কেহ দেখিয়াও দেখে নাই, আজ তাহা সকলের চেয়ে বড়ো হইয়া চোখে দেখা দিল—জগতে এমন কোনো মহৎ সামগ্রী নাই যাহা আজ ঐ ছোটো জুতাটিকে আড়াল করিয়া রাখিতে পারে।

কুলুঙ্গিতে প্রদীপটি রাখিয়া ভবানীচরণ সেই তক্তাপোশের উপর আসিয়া বসিলেন। তাঁহার শুষ্ক চোখে জল আসিল না, কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল—যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্বাস লইতে তাঁহার পাঁজর যেন ফাটিয়া যাইতে চাহিল। ঘরের পূর্বদিকের দরজা খুলিয়া দিয়া গরাদে ধরিয়া তিনি বাহিরের দিকে চাহিলেন।

অন্ধকার রাত্রি, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সম্মুখে প্রাচীরবেষ্টিত ঘন জঙ্গল। তাহার মধ্যে ঠিক পড়িবার ঘরের সামনে একটুখানি জমিতে কালীপদ বাগান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখনো তাহার স্বহস্তে রোপিত ঝুমকা-লতা কঞ্চির বেড়ার উপর প্রচুর পল্লব বিস্তার করিয়া সজীব আছে—তাহা ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে।

আজ সেই বালকের যত্নপালিত বাগানের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রাণ যেন কণ্ঠের

কাছে উঠিয়া আসিল। আর কিছু আশা করিবার নাই; গ্রীষ্মের সময়—পূজার সময়—কলেজের ছুটি হয়, কিন্তু যাহার জন্য তাঁহার দরিদ্র ঘর শূন্য হইয়া আছে সে আর কোনোদিন কোনো ছুটিতেই ঘরে ফিরিয়া আসিবে না। "ওরে বাপ আমার!" বলিয়া ভবানীচরণ সেইখানেই মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। কালীপদ তাহার বাপের দারিদ্র্য ঘুচাইবে বলিয়াই কলিকাতায় গিয়াছিল, কিন্তু জগৎসংসারে সে এই বৃদ্ধকে কী একান্ত নিঃসম্বল করিয়াই চলিয়া গেল।—বাহিরে বৃষ্টি আরও চাপিয়া আসিল।

এমন সময় অন্ধকারে ঘাসপাতার মধ্যে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ভবানীচরণের বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল। যাহা কোনোমতেই আশা করিবার নহে, তাহাও যেন তিনি আশা করিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে হইল, কালীপদ যেন বাগান দেখিতে আসিয়াছে। কিন্তু, বৃষ্টি যে মুষলধারায় পড়িতেছে—ও যে ভিজিবে, এই অসম্ভব উদ্‌বেগে যখন তাঁহার মনের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে কে গরাদের বাহিরে তাঁহার ঘরের সামনে আসিয়া মুহূর্তকালের জন্য দাঁড়াইল। চাদর দিয়া সে মাথা মুড়ি দিয়াছে—তাহার মুখ চিনিবার জো নাই। কিন্তু, সে যেন মাথায় কালীপদরই মতো হইবে। "এসেছিস বাপ!" বলিয়া ভবানীচরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরের দরজা খুলিতে গেলেন। দ্বার খুলিয়া বাগানে আসিয়া সেই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কেহই নাই। সেই বৃষ্টিতে বাগানময় ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই নিশীথরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভাঙা গলায় একবার 'কালীপদ' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—কাহারও সাড়া পাইলেন না। সেই ডাকে নটু চাকরটা গোহালঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অনেক করিয়া বৃদ্ধকে ঘরে লইয়া আসিল।

পরদিন সকালে নটু ঘর ঝাঁট দিতে গিয়া দেখিল, গরাদের সামনেই ঘরের ভিতরে পুঁটুলিতে বাঁধা একটা কী পড়িয়া আছে। সেটা সে ভবানীচরণের হাতে আনিয়া দিল। ভবানীচরণ খুলিয়া দেখিলেন, একটা পুরাতন দলিলের মতো। চশমা বাহির করিয়া চোখে লাগাইয়া একটু পড়িয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া রাসমণির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কাগজখানা তাঁহার নিকট মেলিয়া ধরিলেন।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কী ও।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "সেই উইল।"

রাসমণি কহিলেন, "কে দিল।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "কাল রাত্রে সে আসিয়াছিল—সে দিয়া গেছে।"

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কী হইবে।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "আর আমার কোনো দরকার নাই।"

বলিয়া সেই দলিল ছিন্ন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

এ সংবাদটা পাড়ায় যখন রটিয়া গেল তখন বগলাচরণ মাথা নাড়িয়া সগর্বে বলিল, "আমি বলি নাই কালীপদকে দিয়াই উইল উদ্ধার হইবে?"

রামচরণ মুদি কহিল, "কিন্তু দাদাঠাকুর, কাল যখন রাত দশটার গাড়ি এস্টেশনে

এসে পৌঁছিল তখন একটি সুন্দর-দেখিতে বাবু আমার দোকানে আসিয়া চৌধুরীদের বাড়ির পথ জিজ্ঞাসা করিল— আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলাম। তার হাতে যেন কী-একটা দেখিয়াছিলাম।"

"আরে দূর" বলিয়া এ কথাটাকে বগলাচরণ একেবারেই উড়াইয়া দিল।

আশ্বিন ১৩১৮

পণরক্ষা

বংশীবদন তাহার ভাই রসিককে যেমন ভালোবাসিত এমন করিয়া সচরাচর মাও ছেলেকে ভালোবাসিতে পারে না। পাঠশালা হইতে রসিকের আসিতে যদি কিছু বিলম্ব হইত তবে সকল কাজ ফেলিয়া সে তাহার সন্ধানে ছুটিত। তাহাকে না খাওয়াইয়া সে নিজে খাইতে পারিত না। রসিকের অল্প-কিছু অসুখবিসুখ হইলেই বংশীর দুই চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতে থাকিত।

রসিক বংশীর চেয়ে ষোলো বছরের ছোটো। মাঝে যে-কয়টি ভাইবোন জন্মিয়াছিল সবগুলিই মারা গিয়াছে। কেবল এই সব-শেষেরটিকে রাখিয়া যখন রসিকের এক বছর বয়স তখন তাহার মা মারা গেল এবং রসিক যখন তিন বছরের ছেলে তখন সে পিতৃহীন হইল। এখন রসিককে মানুষ করিবার ভার একা এই বংশীর উপর।

তাঁতে কাপড় বোনাই বংশীর পৈতৃক ব্যবসায়। এই ব্যাবসা করিয়াই বংশীর বৃদ্ধ-প্রপিতামহ অভিরাম বসাক গ্রামে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে আজও সেখানে রাধানাথের বিগ্রহ স্থাপিত আছে। কিন্তু, সমুদ্রপার হইতে এক কল-দৈত্য আসিয়া বেচারা তাঁতের উপর অগ্নিবাণ হানিল এবং তাঁতির ঘরে ক্ষুধাসুরকে বসাইয়া দিয়া বাষ্পফুৎকারে মুহুর্মুহু জয়শৃঙ্গ বাজাইতে লাগিল।

তবু তাঁতের কঠিন প্রাণ মরিতে চায় না—ঠুক্‌ঠাক্ ঠুক্‌ঠাক্ করিয়া সুতা দাঁতে লইয়া মাকু এখনও চলাচল করিতেছে—কিন্তু তাহার সাবেক চালচলন চঞ্চলা লক্ষ্মীর মনঃপূত হইতেছে না, লোহার দৈত্যটা কলে বলে কৌশলে তাঁহাকে একেবারে বশ করিয়া লইয়াছে।

বংশীর একটু সুবিধা ছিল। থানাগড়ের বাবুরা তাহার মুরুব্বি ছিলেন। তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারের সমুদয় শৌখিন কাপড় বংশীই বুনিয়া দিত। একলা সব পারিয়া উঠিত না, সেজন্য তাহাকে লোক রাখিতে হইয়াছিল।

যদিচ তাহাদের সমাজে মেয়ের দর বড়ো বেশি, তবু চেষ্টা করিলে বংশী এতদিনে যেমন-তেমন একটা বউ ঘরে আনিতে পারিত। রসিকের জন্যই সে আর ঘটিয়া উঠিল না। পুজার সময় কলিকাতা হইতে রসিকের যে সাজ আমদানি হইত তাহা যাত্রার দলের রাজপুত্রকেও লজ্জা দিতে পারিত। এইরূপ আর-আর সকল বিষয়েই রসিকের যাহা-কিছু প্রয়োজন ছিল না তাহা জোগাইতে গিয়া বংশীকে নিজের সকল প্রয়োজনই খর্ব করিতে হইল।

তবু বংশরক্ষা করিতে তো হইবে। তাহাদের বিবাহযোগ্য ঘরের একটি মেয়েকে মনে মনে ঠিক করিয়া বংশী টাকা জমাইতে লাগিল। তিন-শো টাকা পণ এবং অলংকার বাবদ আর এক-শো টাকা হইলেই মেয়েটিকে পাওয়া যাইবে স্থির করিয়া অল্প-অল্প কিছু-কিছু সে খরচ বাঁচাইয়া চলিল। হাতে যথেষ্ট টাকা ছিল না বটে, কিন্তু যথেষ্ট সময় ছিল। কারণ, মেয়েটির বয়স সবে চার—এখনো অন্তত চার-পাঁচ বছর মেয়াদ পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু, কোষ্ঠীতে তাহার সঞ্চয়ের স্থানে দৃষ্টি ছিল রসিকের। সে দৃষ্টি শুভ-গ্রহের দৃষ্টি নহে।

রসিক ছিল তাহাদের পাড়ার ছোটো ছেলে এবং সমবয়সীদের দলের সর্দার। যে লোক সুখে মানুষ হয় এবং যাহা চায় তাহাই পাইয়া থাকে ভাগ্যদেবতা কর্তৃক বঞ্চিত হতভাগাদের পক্ষে তাহার ভারি একটা আকর্ষণ আছে। তাহার কাছে ঘেঁষিতে পাওয়াই যেন কতকটা পরিমাণে প্রার্থিত বস্তুকে পাওয়ার সামিল। যাহার অনেক আছে সে যে অনেক দেয় বলিয়াই লোকে তাহার কাছে আনাগোনা করে তাহা নহে— সে কিছু না দিলেও মানুষের লুব্ধ কল্পনাকে তৃপ্ত করে।

শুধু যে রসিকের শৌখিনতাই পাড়ার ছেলেদের মন মুগ্ধ করিয়াছে এ কথা বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। সকল বিষয়েই রসিকের এমন একটি আশ্চর্য নৈপুণ্য ছিল যে তাহার চেয়ে উচ্চবংশের ছেলেরাও তাহাকে খাতির না করিয়া থাকিতে পারিত না। সে যাহাতে হাত দেয় তাহাই অতি সুকৌশলে করিতে পারে। তাহার মনের উপর যেন কোনো পূর্বসংস্কারের মূঢ়তা চাপিয়া নাই. সেইজন্য সে যাহা দেখে তাহাই গ্রহণ করিতে পারে।

রসিকের এই কারুনৈপুণ্যের জন্য তাহার কাছে ছেলেমেয়েরা, এমন-কি, তাহাদের অভিভাবকেরা পর্যন্ত উমেদারি করিত। কিন্তু, তাহার দোষ ছিল কি, কোনো একটা-কিছুতে সে বেশিদিন মন দিতে পারিত না। একটা-কোনো বিদ্যা আয়ত্ত করিলেই আর সেটা তাহার ভালো লাগিত না— তখন তাহাকে সে বিষয়ে সাধ্যসাধনা করিতে গেলে সে বিরক্ত হইয়া উঠিত। বাবুদের বাড়িতে দেওয়ালির উৎসবে কলিকাতা হইতে আতসবাজিওয়ালা আসিয়াছিল— তাহাদের কাছ হইতে সে বাজি তৈরি শিখিয়া কেবল দুটো বৎসর পাড়ায় কালীপূজার উৎসবকে জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিয়াছিল; তৃতীয় বৎসরে কিছুতেই আর তুবড়ির ফোয়ারা ছুটিল না। রসিক তখন চাপকান-জোব্বা-পরা মেডেল-ঝোলানো এক নব্য যাত্রাওয়ালার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া বাক্স হার্মোনিয়ম লইয়া লক্ষ্ণৌ ঠুংরি সাধিতেছিল।

তাহার ক্ষমতার এই খামখেয়ালি লীলায় কখনো সুলভ কখনো দুর্লভ হইয়া সে লোককে আরও বেশি মুগ্ধ করিত, তাহার নিজের দাদার তো কথাই নাই। দাদা কেবলই ভাবিত, 'এমন আশ্চর্য ছেলে আমাদের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে, এখন কোনো-মতে বাঁচিয়া থাকিলে হয়!' এই ভাবিয়া নিতান্ত অকারণেই তাহার চোখে জল আসিত এবং মনে মনে রাধানাথের কাছে ইহাই প্রার্থনা করিত যে, 'আমি যেন উহার আগে মরিতে পারি।'

এমনতরো ক্ষমতাশালী ভাইয়ের নিত্যনূতন শখ মিটাইতে গেলে ভাবী বধূ কেবলই দূরতর ভবিষ্যতে অন্তর্ধান করিতে থাকে, অথচ বয়স চলিয়া যায় অতীতের দিকেই। বংশীর বয়স যখন ত্রিশ পার হইল, টাকা যখন একশতও পুরিল না, এবং সেই মেয়েটি অন্যত্র শ্বশুরঘর করিতে গেল, তখন বংশী মনে মনে কহিল, 'আমার আর বড়ো আশা দেখি না, এখন বংশরক্ষার ভার রসিককেই লইতে হইবে।'

পাড়ায় যদি স্বয়ম্বরপ্রথা চলিত থাকিত তবে রসিকের বিবাহের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইত না। বিধু, তারা, ননী, শশী, সুধা— এমন কত নাম করিব— সবাই রসিককে ভালোবাসিত। রসিক যখন কাদা লইয়া মাটির মূর্তি গড়িবার মেজাজে থাকিত তখন তাহার তৈরি পুতুলের অধিকার লইয়া মেয়েদের মধ্যে বন্ধুবিচ্ছেদের উপক্রম হইত। ইহাদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল সৌরভী, সে বড়ো শান্ত— সে চুপ

করিয়া বসিয়া পুতুল-গড়া দেখিতে ভালোবাসিত এবং প্রয়োজনমতো রসিককে কাদা কাঠি প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া দিত। তাহার ভারি ইচ্ছা রসিক তাহাকে একটা-কিছু ফরমাশ করে। কাজ করিতে করিতে রসিক পান চাহিবে জানিয়া সৌরভী তাহা জোগাইয়া দিবার জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হইয়া আসিত। রসিক স্বহস্তের কীর্তিগুলি তাহার সামনে সাজাইয়া ধরিয়া যখন বলিত "সৈরি, তুই এর কোন্‌টা নিবি বল্‌", তখন সে ইচ্ছা করিলে যেটা খুশি লইতে পারিত, কিন্তু সংকোচে কোনোটাই লইত না; রসিক নিজের পছন্দমতো জিনিসটি তাহাকে তুলিয়া দিত। পুতুল-গড়ার পর্ব শেষ হইলে যখন হার্মোনিয়ম বাজাইবার দিন আসিল তখন পাড়ার ছেলেমেয়েরা সকলেই এই যন্ত্রটা টেপাটুপি করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িত, রসিক তাহাদের সকলকেই হুংকার দিয়া খেদাইয়া রাখিত। সৌরভী কোনো উৎপাত করিত না; সে তাহার ডুরে শাড়ি পরিয়া, বড়ো বড়ো চোখ মেলিয়া, বাম হাতের উপর শরীরটার ভার দিয়া হেলিয়া বসিয়া, চুপ করিয়া আশ্চর্য হইয়া দেখিত। রসিক ডাকিত, "আয় সৈরি, একবার টিপিয়া দেখ্‌।" সে মৃদু মৃদু হাসিত, অগ্রসর হইতে চাহিত না। রসিক অসম্মতি-সত্ত্বেও নিজের হাতে তাহার আঙুল ধরিয়া তাহাকে দিয়া বাজাইয়া লইত।

সৌরভীর দাদা গোপালও রসিকের ভক্তবৃন্দের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিল। সৌরভীর সঙ্গে তাহার প্রভেদ এই যে, ভালো জিনিস লইবার জন্য তাহাকে কোনো-দিন সাধিতে হইত না। সে আপনি ফরমাশ করিত এবং না পাইলে অস্থির করিয়া তুলিত। নূতনগোছের যাহা-কিছু দেখিত তাহাই সে সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত। রসিক কাহারও আবদার বড়ো সহিতে পারিত না, তবু গোপাল যেন অন্য ছেলেদের চেয়ে রসিকের কাছে কিছু বেশি প্রশ্রয় পাইত।

বংশী মনে মনে ঠিক করিল, এই সৌরভীর সঙ্গেই রসিকের বিবাহ দিতে হইবে। কিন্তু সৌরভীর ঘর তাহাদের চেয়ে বড়ো— পাঁচ-শো টাকার কমে কাজ হইবার আশা নাই।

২

এতদিন বংশী কখনো রসিককে তাহার তাঁত-বোনায় সাহায্য করিতে অনুরোধ করে নাই। খাটুনি সমস্তই সে নিজের ঘাড়ে লইয়াছিল। রসিক নানাপ্রকার বাজে কাজ লইয়া লোকের মনোরঞ্জন করিত, ইহা তাহার দেখিতে ভালোই লাগিত। রসিক ভাবিত, 'দাদা কেমন করিয়া যে রোজই এই এক তাঁতের কাজ লইয়া পড়িয়া থাকে কে জানে। আমি হইলে তো মরিয়া গেলেও পারি না।' তাহার দাদা নিজের সম্বন্ধে নিতান্তই টানাটানি করিয়া চালাইত, ইহাতে সে দাদাকে কৃপণ বলিয়া জানিত। তাহার দাদার সম্বন্ধে রসিকের মনে যথেষ্ট একটা লজ্জা ছিল। শিশুকাল হইতেই সে নিজেকে তাহার দাদা হইতে সকল বিষয়ে ভিন্ন শ্রেণীর লোক বলিয়াই জানিত। তাহার দাদাই তাহার এই ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে।

এমন সময়ে বংশী নিজের বিবাহের আশা বিসর্জন দিয়া রসিকেরই বধূ আনিবার জন্য যখন উৎসুক হইল তখন বংশীর মন আর ধৈর্য মানিতে চাহিল না। প্রত্যেক মাসের বিলম্ব তাহার কাছে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। বাজনা বাজিতেছে, আলো

জ্বালা হইয়াছে। বরসজ্জা করিয়া রসিকের বিবাহ হইতেছে, এই আনন্দের ছবি বংশীর মনে তৃষ্ণার্তের সম্মুখে মৃগতৃষ্ণিকার মতো কেবলই জাগিয়া আছে।

তবু যথেষ্ট দ্রুত বেগে টাকা জমিতে চায় না। যত বেশি চেষ্টা করে ততই যেন সফলতাকে আরও বেশি দূরবর্তী বলিয়া মনে হয়। বিশেষত মনের ইচ্ছার সঙ্গে শরীরটা সমান বেগে চলিতে চায় না, বারবার ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। পরিশ্রমের মাত্রা দেহের শক্তিকে ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে।

যখন সমস্ত গ্রাম নিষুপ্ত, কেবল নিশা-নিশাচরীর চৌকিদারের মতো প্রহরে প্রহরে শৃগালের দল হাঁক দিয়া যাইতেছে, তখনো মিট্‌মিটে প্রদীপে বংশী কাজ করিতেছে, এমন কত রাত ঘটিয়াছে। বাড়িতে তাহার এমন কেহই ছিল না যে তাহাকে নিষেধ করে। এ দিকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর আহার হইতেও বংশী নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে। গায়ের শীতবস্ত্রখানা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নানা ছিদ্রের খিড়কির পথ দিয়া গোপনে শীতকে ডাকিয়া-ডাকিয়াই আনে। গত দুই বৎসর হইতে প্রত্যেক শীতের সময়ই বংশী মনে করে, 'এইবারটা একরকম করিয়া চালাইয়া দিই, আর-একটু হাতে টাকা জমুক, আসছে বছরে যখন কাবুলিওয়ালা তাহার শীতবস্ত্রের বোঝা লইয়া গ্রামে আসিবে তখন একটা কাপড় ধারে কিনিয়া তাহার পরের বৎসরে শোধ করিব, ততদিনে তহবিল ভরিয়া উঠিবে।' সুবিধামতো বৎসর আসিল না। ইতিমধ্যে তাহার শরীর টেঁকে না এমন হইয়া আসিল।

এতদিন পরে বংশী তাহার ভাইকে বলিল, "তাঁতের কাজ আমি একলা চালাইয়া উঠিতে পারি না, তুমি আমার কাজে যোগ দাও।" রসিক কোনো জবাব না করিয়া মুখ বাঁকাইল। শরীরের অসুখে বংশীর মেজাজ খারাপ ছিল, সে রসিককে ভর্ৎসনা করিল; কহিল, "বাপ-পিতামহের ব্যাবসা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যদি দিনরাত হো-হো করিয়া বেড়াইবে তবে তোমার দশা হইবে কী।"

কথাটা অসংগত নহে এবং ইহাকে কটূক্তিও বলা যায় না। কিন্তু রসিকের মনে হইল, এত বড়ো অন্যায় তাহার জীবনে সে কোনোদিন সহ্য করে নাই। সেদিন বাড়িতে সে বড়ো একটা কিছু খাইল না; ছিপ হাতে করিয়া চন্দনীদহে মাছ ধরিতে বসিল। শীতের মধ্যাহ্ন নিস্তব্ধ, ভাঙা উঁচু পাড়ির উপর শালিক নাচিতেছে, পশ্চাতের আমবাগানে ঘুঘু ডাকিতেছে, এবং জলের কিনারায় শৈবালের উপর একটি পতঙ্গ তাহার স্বচ্ছ দীর্ঘ দুই পাখা মেলিয়া দিয়া স্থিরভাবে রৌদ্র পোহাইতেছে। কথা ছিল, রসিক আজ গোপালকে লাঠিখেলা শিখাইবে— গোপাল তাহার আশু কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া রসিকের ভাঁড়ের মধ্যেকার মাছ ধরিবার কেঁচোগুলাকে লইয়া অস্থিরভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করিতে লাগিল— রসিক তাহার গালে ঠাস্ করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। কখন তাহার কাছে রসিক পান চাহিবে বলিয়া সৌরভী যখন ঘাটের পাশে ঘাসের উপর দুই পা মেলিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে এমন সময়ে রসিক হঠাৎ তাহাকে বলিল, "সৈরি, বড়ো ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু খাবার আনিয়া দিতে পারিস?" সৌরভী খুশি হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া বাড়ি হইতে আঁচল ভরিয়া মুড়িমুড়কি আনিয়া উপস্থিত করিল। রসিক সেদিন তাহার দাদার কাছেও ঘেঁষিল না।

বংশীর শরীর মন খারাপ ছিল, রাত্রে সে তাহার বাপকে স্বপ্ন দেখিল। স্বপ্ন হইতে উঠিয়া তাহার মন আরও বিকল হইয়া উঠিল। তাহার নিশ্চয় মনে হইল,

বংশলোপের আশঙ্কায় তাহার বাপের পরলোকেও ঘুম হইতেছে না।

পরদিন বংশী কিছু জোর করিয়াই রসিককে কাজে বসাইয়া দিল। কেননা, ইহা তো ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা নহে, এ যে বংশের প্রতি কর্তব্য। রসিক কাজে বসিল বটে, কিন্তু তাহাতে কাজের সুবিধা হইল না; তাহার হাত আর চলেই না, পদে পদে সুতা ছিঁড়িয়া যায়, সুতা সারিয়া তুলিতে তাহার বেলা কাটিতে থাকে। বংশী মনে করিল, ভালোরূপ অভ্যাস নাই বলিয়াই এমনটা ঘটিতেছে, কিছুদিন গেলেই হাত দুরস্ত হইয়া যাইবে।

কিন্তু, স্বভাবপটু রসিকের হাত দুরস্ত হইবার দরকার ছিল না বলিয়াই তাহার হাত দুরস্ত হইতে চাহিল না। বিশেষত তাহার অনুগতবর্গ তাহার সন্ধানে আসিয়া যখন দেখিত সে নিতান্ত ভালোমানুষটির মতো তাহাদের বাপ-পিতামহের চিরকালীন ব্যবসায়ে লাগিয়া গেছে, তখন রসিকের মনে ভারি লজ্জা এবং রাগ হইতে লাগিল।

দাদা তাহাকে তাহার এক বন্ধুর মুখ দিয়া খবর দিল যে, সৌরভীর সঙ্গেই রসিকের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা যাইতেছে। বংশী মনে করিয়াছিল, এই সুখবরটায় নিশ্চয়ই রসিকের মন নরম হইবে। কিন্তু, সেরূপ ফল তো দেখা গেল না। 'দাদা মনে করিয়াছেন, সৌরভীর সঙ্গে বিবাহ হইলেই আমার মোক্ষলাভ হইবে!' সৌরভীর প্রতি হঠাৎ তাহার ব্যবহারের এমনি পরিবর্তন হইল যে, সে বেচারা আঁচলের প্রান্তে পান বাঁধিয়া তাহার কাছে আসিতে আর সাহসই করিত না— সমস্ত রকম-সকম দেখিয়া কী জানি এই ছোটো শান্ত মেয়েটির ভারি কান্না পাইতে লাগিল। হার্মোনিয়ম বাজনা সম্বন্ধে অন্য মেয়েদের চেয়ে তাহার যে একটু বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল সে তো ঘুচিয়াই গেল— তার পর সর্বদাই রসিকের যে ফাইফরমাশ খাটিবার ভার তাহার উপর ছিল সেটাও রহিল না। হঠাৎ জীবনটা ফাঁকা এবং সংসারটা নিতান্তই ফাঁকি বলিয়া তাহার কাছে মনে হইতে লাগিল।

এতদিন রসিক এই গ্রামের বনবাদাড়, রথতলা, রাধানাথের মন্দির, নদী, খেয়াঘাট, বিল, দিঘি, কামারপাড়া, ছুতারপাড়া, হাটবাজার সমস্তই আপনার আনন্দে ও প্রয়োজনে বিচিত্রভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। সব জায়গাতেই তাহার একটা একটা আড্ডা ছিল, যেদিন যেখানে খুশি কখনো বা একলা কখনো বা দলবলে কিছু-না-কিছু লইয়া থাকিত। এই গ্রাম এবং থানাগড়ের বাবুদের বাড়ি ছাড়া জগতের আর-যে কোনো অংশ তাহার জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় তাহা সে কোনোদিন মনেও করে নাই। আজ এই গ্রামে তাহার মন আর কুলাইল না। দূর দূর বহুদূরের জন্য তাহার চিত্ত ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার অবসর যথেষ্ট ছিল— বংশী তাহাকে খুব বেশিক্ষণ কাজ করাইত না। কিন্তু, ঐ একটুক্ষণ কাজ করিয়াই তাহার সমস্ত অবসর পর্যন্ত যেন বিস্বাদ হইয়া গেল; এরূপ খণ্ডিত অবসরকে কোনো ব্যবহারে লাগাইতে তাহার ভালো লাগিল না।

৩

এই সময়ে থানাগড়ের বাবুদের এক ছেলে এক বাইসিক্‌ল্‌ কিনিয়া আনিয়া চড়া অভ্যাস করিতেছিল। রসিক সেটাকে লইয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন আয়ত্ত করিয়া লইল যেন সে তাহার নিজেরই পায়ের তলাকার একটা ডানা। কিন্তু, কী চমৎকার, কী স্বাধীনতা, কী আনন্দ! দূরত্বের সমস্ত বাধাকে এই বাহনটা যেন তীক্ষ্ম সুদর্শনচক্রের মতো অতি অনায়াসেই কাটিয়া দিয়া চলিয়া যায়। ঝড়ের বাতাস যেন চাকার আকার ধারণ করিয়া উন্মত্তের মতো মানুষকে পিঠে করিয়া লইয়া ছোটে। রামায়ণ-মহাভারতের সময় মানুষে কখনো কখনো দেবতার অস্ত্র লইয়া যেমন ব্যবহার করিতে পাইত এ যেন সেইরকম।

রসিকের মনে হইল, এই বাইসিক্‌ল্‌ নহিলে তাহার জীবন বৃথা। দাম এমনই কী বেশি। এক-শো পঁচিশ টাকা মাত্র! এই এক-শো পঁচিশ টাকা দিয়া মানুষ একটা নূতন শক্তি লাভ করিতে পারে—ইহা তো সস্তা। বিষ্ণুর গরুড়বাহন এবং সূর্যের অরুণসারথি তো সৃষ্টিকর্তাকে কম ভোগ ভোগায় নাই, আর ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার জন্য সমুদ্রমন্থন করিতে হইয়াছিল—কিন্তু এই বাইসিক্‌ল্‌টি তাহার পৃথিবীজয়ী গতি-বেগ স্তব্ধ করিয়া কেবল এক-শো পঁচিশ টাকার জন্য দোকানের এক কোণে দেয়াল ঠেস দিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

দাদার কাছে রসিক আর-কিছু চাহিবে না পণ করিয়াছিল, কিন্তু সে পণ রক্ষা হইল না। তবে চাওয়াটার কিছু বেশ পরিবর্তন করিয়া দিল। কহিল, "আমাকে এক-শো পঁচিশ টাকা ধার দিতে হইবে।"

বংশীর কাছে রসিক কিছুদিন হইতে কোনো আবদার করে নাই, ইহাতে শরীরের অসুখের উপর আর-একটা গভীরতর বেদনা বংশীকে দিনরাত্রি পীড়া দিতেছিল। তাই রসিক তাহার কাছে দরবার উপস্থিত করিবামাত্রই মুহূর্তের জন্য বংশীর মন নাচিয়া উঠিল; মনে হইল, 'দূরে হোক্‌গে ছাই, এমন করিয়া আর টানা-টানি করা যায় না—দিয়া ফেলি।' কিন্তু বংশ? সে যে একেবারেই ডোবে! এক-শো পঁচিশ টাকা দিলে আর বাকি থাকে কী। ধার! রসিক এক-শো পঁচিশ টাকা ধার শুধিবে! তাই যদি সম্ভব হইত তবে তো বংশী নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিত।

বংশী মনটাকে একেবারে পাথরের মতো শক্ত করিয়া বলিল, "সে কি হয়। এক-শো পঁচিশ টাকা আমি কোথায় পাইব।"

রসিক বন্ধুদের কাছে বলিল, "এ টাকা যদি না পাই তবে আমি বিবাহ করিবই না।"

বংশীর কানে যখন সে কথা গেল তখন সে বলিল, "এও তো মজা মন্দ নয়। পাত্রীকে টাকা দিতে হইবে, আবার পাত্রকে না দিলেও চলিবে না। এমন দায় তো আমাদের সাত পুরুষের মধ্যে কখনো ঘটে নাই।"

রসিক সুস্পষ্ট বিদ্রোহ করিয়া তাঁতের কাজ হইতে অবসর লইল। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "আমার অসুখ করিয়াছে।" তাঁতের কাজ না করা ছাড়া তাহার আহার-বিহারে অসুখের অন্য কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বংশী মনে মনে একটু অভিমান করিয়া বলিল, "থাক্‌, উহাকে আমি আর কখনো কাজ করিতে বলিব না।"

বলিয়া রাগ করিয়া নিজেকে আরও বেশি কষ্ট দিতে লাগিল। বিশেষত সেই বছরেই বয়কটের কল্যাণে হঠাৎ তাঁতের কাপড়ের দর এবং আদর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তাঁতিদের মধ্যে যাহারা অন্য কাজে ছিল তাহারাও প্রায় সকলে তাঁতে ফিরিল। নিয়তচঞ্চল মাকুগুলা ইঁদুর-বাহনের মতো সিদ্ধিদাতা গণনায়ককে বাংলাদেশের তাঁতির ঘরে দিনরাত কাঁধে করিয়া দৌড়াইতে লাগিল। এখন এক মুহূর্ত তাঁত কামাই পড়িলে বংশীর মন অস্থির হইয়া উঠে; এই সময়ে রসিক যদি তাহার সাহায্য করে তবে দুই বৎসরের কাজ ছয় মাসে আদায় হইতে পারে, কিন্তু সে আর ঘটিল না। কাজেই ভাঙা শরীর লইয়া বংশী একেবারে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল।

রসিক প্রায় বাড়ির বাহিরে বাহিরেই কাটায়। কিন্তু, হঠাৎ একদিন যখন সন্ধ্যার সময় বংশীর হাত আর চলে না, পিঠের দাঁড়া যেন ফাটিয়া পড়িতেছে, কেবলই কাজের গোলমাল হইয়া যাইতেছে এবং তাহা সারিয়া লইতে বৃথা সময় কাটিতেছে, এমন সময় শুনিতে পাইল, সেই কিছুকালের উপেক্ষিত হার্মোনিয়ম যন্ত্রে আবার লক্ষ্ণৌ ঠুংরি বাজিতেছে। এমন দিন ছিল যখন কাজ করিতে করিতে রসিকের এই হার্মোনিয়ম বাজনা শুনিলে গর্বে ও আনন্দে বংশীর মন পুলকিত হইয়া উঠিত; আজ একেবারেই সেরূপ হইল না। সে তাঁত ফেলিয়া ঘরের আঙিনার কাছে আসিয়া দেখিল একজন কোথাকার অপরিচিত লোককে রসিক বাজনা শুনাইতেছে। ইহাতে তাহার জ্বরতপ্ত ক্লান্ত দেহ আরও জ্বলিয়া উঠিল। মুখে তাহার যাহা আসিল তাহাই বলিল। রসিক উদ্ধত হইয়া জবাব করিল, "তোমার অন্নে যদি আমি ভাগ বসাই তবে আমি" ইত্যাদি ইত্যাদি। বংশী কহিল, "আর মিথ্যা বড়াই করিয়া কাজ নাই, তোমার সামর্থ্য যতদূর ঢের দেখিয়াছি! শুধু বাবুদের নকলে বাজনা বাজাইয়া নবাবি করিলেই তো হয় না।" বলিয়া সে চলিয়া গেল— আর তাঁতে বসিতে পারিল না; ঘরে মাদুরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

রসিক যে হার্মোনিয়ম বাজাইয়া চিত্তবিনোদন করিবার জন্য সঙ্গী জুটাইয়া আনিয়াছিল তাহা নহে। থানাগড়ে যে সার্কাসের দল আসিয়াছিল রসিক সেই দলে চাকরির উমেদারি করিতে গিয়াছিল। সেই দলেরই একজনের কাছে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিবার জন্য তাহাকে যতগুলি গৎ জানে একে একে শুনাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল— এমন সময় সংগীতের মাঝখানে নিতান্ত অন্যরকম সুর আসিয়া পৌঁছিল।

আজ পর্যন্ত বংশীর মুখ দিয়া এমন কঠিন কথা কখনো বাহির হয় নাই। নিজের বাক্যে সে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, যেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর-একজন কে এই নিষ্ঠুর কথাগুলো বলিয়া গেল। এমনতরো মর্মান্তিক ভর্ৎসনার পরে বংশীর পক্ষে আর তাহার সঞ্চয়ের টাকা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। যে টাকার জন্য হঠাৎ এমন অভাবনীয় কাণ্ডটা ঘটিতে পারিল সেই টাকার উপর বংশীর ভারি একটা রাগ হইল— তাহাতে আর তাহার কোনো সুখ রহিল না। রসিক যে তাহার কত আদরের সামগ্রী, এই কথা কেবলই তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। যখন সে 'দাদা' শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিত না, যখন তাহার দুরন্ত হস্ত হইতে তাঁতের সুতাগুলোকে রক্ষা করা এক বিষম ব্যাপার ছিল, যখন তাহার দাদা

হাত বাড়াইবামাত্র সে অন্য সকলের কোল হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সবেগে তাহার বুকের উপর আসিয়া পড়িত, এবং তাহার ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া টানাটানি করিত, তাহার নাক ধরিয়া দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিবার চেষ্টা করিত, সে-সমস্তই সুস্পষ্ট মনে পড়িয়া বংশীর প্রাণের ভিতরটাতে হাহা করিতে লাগিল। সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। রসিকের নাম ধরিয়া বার-কয়েক করুণকণ্ঠে ডাকিল। সাড়া না পাইয়া তাহার জ্বর লইয়াই সে উঠিল। গিয়া দেখিল, সেই হার্মোনিয়মটা পাশে পড়িয়া আছে, অন্ধকারে দাওয়ায় রসিক চুপ করিয়া একলা বসিয়া। তখন বংশী কোমর হইতে সাপের মতো সরু লম্বা এক থলি খুলিয়া ফেলিল, রুদ্ধপ্রায়-কণ্ঠে কহিল, "এই নে, ভাই— আমার এ টাকা সমস্ত তোরই জন্য। তোরই বউ ঘরে আনিব বলিয়া আমি এ জমাইতেছিলাম। কিন্তু, তোকে কাঁদাইয়া আমি জমাইতে পারিব না, ভাই আমার, গোপাল আমার— আমার সে শক্তি নাই— তুই চাকার গাড়ি কিনিস, তোর যা খুশি তাই করিস।"

রসিক দাঁড়াইয়া উঠিয়া শপথ করিয়া কঠোরস্বরে কহিল, "চাকার গাড়ি কিনিতে হয়, বউ আনিতে হয়, আমার নিজের টাকায় করিব— তোমার ও টাকা আমি ছুঁইব না।" বলিয়া বংশীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। উভয়ের মধ্যে আর এই টাকার কথা বলার পথ রহিল না— কোনো কথা বলাই অসম্ভব হইয়া উঠিল।

৪

রসিকের ভক্তশ্রেষ্ঠ গোপাল আজকাল অভিমান করিয়া দূরে দূরে থাকে। রসিকের সামনে দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া একাই মাছ ধরিতে যায়, আগেকার মতো তাহাকে ডাকাডাকি করে না। আর, সৌরভীর তো কথাই নাই। রসিকদাদার সঙ্গে তাহার আড়ি, একেবারে জন্মের মতো আড়ি— অথচ সে যে এত বড়ো একটা ভয়ংকর আড়ি করিয়াছে, সেটা রসিককে স্পষ্ট করিয়া জানাইবার সুযোগ না পাইয়া, আপন-মনে ঘরের কোণে অভিমানে ক্ষণে ক্ষণে কেবলই তাহার দুই চোখ ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন রসিক মধ্যাহ্নে গোপালদের বাড়িতে গিয়া তাহাকে ডাক দিল। আদর করিয়া তাহার কান মলিয়া দিল, তাহাকে কাতুকুতু দিতে লাগিল। গোপাল প্রথমটা প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিয়া লড়াইয়ের ভাব দেখাইল, কিন্তু বেশিক্ষণ সেটা রাখিতে পারিল না; দুইজনে বেশ হাস্যালাপ জমিয়া উঠিল। রসিক কহিল, "গোপাল, আমার হার্মোনিয়মটি নিবি?"

হার্মোনিয়ম! এত বড়ো দান! কলির সংসারে এও কি কখনো সম্ভব। কিন্তু, যে জিনিসটা তাহার ভালো লাগে বাধা না পাইলে সেটা অসংকোচে গ্রহণ করিবার শক্তি গোপালের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। অতএব হার্মোনিয়মটি সে অবিলম্বে অধিকার করিয়া লইল; বলিয়া রাখিল, ফিরিয়া চাহিলে আর কিন্তু পাইবে না।

গোপালকে যখন রসিক ডাক দিয়াছিল তখন নিশ্চয় জানিয়াছিল, সে ডাক অন্তত আরও একজনের কানে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু, বাহিরে আজ তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। তখন রসিক গোপালকে বলিল, "সৌরি কোথায় আছে

একবার ডাকিয়া আন্ তো।”

গোপাল ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “সৈরি বলিল, তাহাকে এখন বড়ি শুকাইতে দিতে হইবে, তাহার সময় নাই।” রসিক মনে মনে হাসিয়া কহিল, “চল্ দেখি, সে কোথায় বড়ি শুকাইতেছে।” রসিক আঙিনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কোথাও বড়ির নামগন্ধ নাই। সৌরভী তাহাদের পায়ের শব্দ পাইয়া আর-কোথাও লুকাইবার উপায় না দেখিয়া তাহাদের দিকে পিঠ করিয়া মাটির প্রাচীরের কোণ ঠেসিয়া দাঁড়াইল। রসিক তাহার কাছে গিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “রাগ করেছিস সৈরি?” সে আঁকিয়া-বাঁকিয়া রসিকের চেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেয়ালের দিকেই মুখ করিয়া রহিল।

একদা রসিক আপন খেয়ালে নানা রঙের সুতা মিলাইয়া নানা চিত্রবিচিত্র করিয়া একটা কাঁথা শেলাই করিতেছিল। মেয়েরা যে কাঁথা শেলাই করিত তাহার কতকগুলো বাঁধা নকশা ছিল, কিন্তু রসিকের সমস্তই নিজের মনের রচনা। যখন এই শেলাইয়ের ব্যাপার চলিতেছিল তখন সৌরভী আশ্চর্য হইয়া একমনে তাহা দেখিত; সে মনে করিত, জগতে কোথাও এমন আশ্চর্য কাঁথা আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই। প্রায় যখন কাঁথা শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে রসিকের বিরক্তি বোধ হইল, সে আর শেষ করিল না। ইহাতে সৌরভী মনে ভারি পীড়া বোধ করিয়াছিল; এইটে শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য সে রসিককে কতবার যে কত সানুনয় অনুরোধ করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। আর ঘণ্টা দুই-তিন বসিলেই শেষ হইয়া যায়, কিন্তু রসিকের যাহাতে গা লাগে না তাহাতে তাহাকে প্রবৃত্ত করাইতে কে পারে। হঠাৎ এতদিন পরে রসিক কাল রাত্রি জাগিয়া সেই কাঁথাটি শেষ করিয়াছে।

রসিক বলিল, “সৈরি, সেই কাঁথাটা শেষ করিয়াছি, একবার দেখবি না?”

অনেক কষ্টে সৌরভী মুখ ফিরাইতেই সে আঁচল দিয়া মুখ ঝাঁপিয়া ফেলিল। তখন যে তাহার দুই কপোল বাহিয়া জল পড়িতেছিল, সে জল সে দেখাইবে কেমন করিয়া।

সৌরভীর সঙ্গে তাহার পূর্বের সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে রসিকের যথেষ্ট সময় লাগিল। অবশেষে উভয় পক্ষে সন্ধি যখন এতদূর অগ্রসর হইল যে সৌরভী রসিককে পান আনিয়া দিল তখন রসিক সেই কাঁথার আবরণ খুলিয়া সেটা আঙিনার উপর মেলিয়া দিল—সৌরভীর হৃদয়টি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। অবশেষে যখন রসিক বলিল, “সৈরি, এ কাঁথা তোর জন্যই তৈরি করিয়াছি, এটা আমি তোকেই দিলাম”, তখন এতবড়ো অভাবনীয় দান কোনোমতেই সৌরভী স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না। পৃথিবীতে সৌরভী কোনো দুর্লভ জিনিস দাবি করিতে শেখে নাই। গোপাল তাহাকে খুব ধমক দিল। মানুষের মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে তাহার কোনো বোধ ছিল না; সে মনে করিল, লোভনীয় জিনিস লইতে লজ্জা একটা নিরবচ্ছিন্ন কপটতামাত্র। গোপাল ব্যর্থ কালব্যয়-নিবারণের জন্য নিজেই কাঁথাটা ভাঁজ করিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিল। বিচ্ছেদ মিটমাট হইয়া গেল। এখন হইতে আবার পূর্বতন প্রণালীতে তাহাদের বন্ধুত্বের ইতিহাসের দৈনিক অনুবৃত্তি চলিতে থাকিবে, দুটি বালক-বালিকার মন এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সেদিন পাড়ায় তাহার দলের সকল ছেলেমেয়ের সঙ্গেই রসিক আগেকার মতোই

ভাব করিয়া লইল; কেবল তাহার দাদার ঘরে একবারও প্রবেশ করিল না। যে প্রৌঢ়া বিধবা তাহাদের বাড়িতে আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া যায় সে আসিয়া যখন সকালে বংশীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কী রান্না হইবে", বংশী তখন বিছানায় শুইয়া। সে বলিল, "আমার শরীর ভালো নাই, আজ আমি কিছু খাইব না—রসিককে ডাকিয়া তুমি খাওয়াইয়া দিয়ো।" স্ত্রীলোকটি বলিল, রসিক তাহাকে বলিয়াছে সে আজ বাড়িতে খাইবে না—অন্যত্র বোধ করি তাহার নিমন্ত্রণ আছে। শুনিয়া বংশী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গায়ের কাপড়টায় মাথা পর্যন্ত মুড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

রসিক যেদিন সন্ধ্যার পর গ্রাম ছাড়িয়া সার্কাসের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল সেদিন এমনি করিয়াই কাটিল। শীতের রাত্রি; আকাশে আধখানি চাঁদ উঠিয়াছে। সেদিন হাট সারিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছে—কেবল যাহাদের দূর পাড়ায় বাড়ি এখনো তাহারা মাঠের পথে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। একখানি বোঝাইশূন্য গোরুর গাড়িতে গাড়োয়ান র‍্যাপার মুড়ি দিয়া নিদ্রামগ্ন; গোরু দুটি আপন-মনে ধীরে ধীরে বিশ্রামশালার দিকে গাড়ি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। গ্রামের গোয়ালঘর হইতে খড়-জ্বালানো ধোঁয়া বায়ুহীন শীতরাত্রে হিমভারাক্রান্ত হইয়া স্তরে স্তরে বাঁশঝাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে। রসিক যখন প্রান্তরের প্রান্তে গিয়া পেঁৗছিল, যখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহাদের গ্রামের ঘন গাছগুলির নীলিমাও আর দেখা যায় না, তখন রসিকের মনটা কেমন করিয়া উঠিল। তখনো ফিরিয়া আসার পথ কঠিন ছিল না, কিন্তু তখনো তাহার হৃদয়ের কঠিনতা যায় নাই। 'উপার্জন করি না অথচ দাদার অন্ন খাই' যেমন করিয়া হউক এ লাঞ্ছনা না মুছিয়া, নিজের টাকায় কেনা বাইসিক্‌লে না চড়িয়া আজন্মকালের এই গ্রামে আর ফিরিয়া আসা চলিবে না—রহিল এখানকার চন্দনীদহের ঘাট, এখানকার সুখসাগর দিঘি, এখানকার ফাল্গুন মাসে সর্ষেখেতের গন্ধ, চৈত্র মাসে আমবাগানে মৌমাছির গুঞ্জনধ্বনি; রহিল এখানকার বন্ধুত্ব, এখানকার আমোদ-উৎসব—এখন সম্মুখে অপরিচিত পৃথিবী, অনাত্মীয় সংসার এবং ললাটে অদৃষ্টের লিখন।

৫

রসিক একমাত্র তাঁতের কাজেই যত অসুবিধা দেখিয়াছিল; তাহার মনে হইত, আর-সকল কাজই ইহার চেয়ে ভালো। সে মনে করিয়াছিল, একবার তাহার সংকীর্ণ ঘরের বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির হইতে পারিলেই তাহার কোনো ভাবনা নাই। তাই সে ভারি আনন্দে পথে বাহির হইয়াছিল। মাঝখানে যে কোনো বাধা, কোনো কষ্ট, কোনো দীর্ঘকালব্যয় আছে, তাহা তাহার মনেও হইল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দূরের পাহাড়কেও যেমন মনে হয় অনতিদূরে—যেমন মনে হয়, আধ ঘণ্টার পথ পার হইলেই বুঝি তাহার শিখরে গিয়া পেঁৗছিতে পারা যায়—তাহার গ্রামের বেষ্টন হইতে বাহির হইবার সময় নিজের ইচ্ছার দুর্লভ সার্থকতাকে রসিকের তেমনি সহজগম্য এবং অত্যন্ত নিকটবর্তী বলিয়া বোধ হইল। কোথায় যাইতেছে, রসিক কাহাকেও তাহার কোনো খবর দিল না। একদিন স্বয়ং সে খবর বহন করিয়া আসিবে, এই তাহার পণ রহিল।

কাজ করিতে গিয়া দেখিল, বেগারের কাজে আদর পাওয়া যায় এবং সেই আদর সে বরাবর পাইয়াছে, কিন্তু যেখানে গরজের কাজ সেখানে দয়ামায়া নাই। বেগারের কাজে নিজের ইচ্ছা-নামক পদার্থটাকে খুব কষিয়া দৌড় করানো যায়; সেই ইচ্ছার জোরেই সে কাজে এমন অভাবনীয় নৈপুণ্য জাগিয়া উঠিয়া মনকে এত উৎসাহিত করিয়া তোলে। কিন্তু, বেতনের কাজে এই ইচ্ছা একটা বাধা; এই কাজের তরণীতে অনিশ্চিত ইচ্ছার হাওয়া লাগাইবার জন্য পালের কোনো বন্দোবস্ত নাই, দিনরাত কেবল মজুরের মতো দাঁড় টানা এবং লগি ঠেলা। যখন দর্শকের মতো দেখিয়াছিল তখন রসিক মনে করিয়াছিল, সার্কাসে ভারি মজা। কিন্তু, ভিতরে যখন প্রবেশ করিল মজা তখন সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গিয়াছে। যাহা আমোদের জিনিস যখন তাহা আমোদ দেয় না, যখন তাহার প্রতিদিনের পুনরাবৃত্তি বন্ধ হইলে প্রাণ বাঁচে অথচ তাহা কিছুতেই বন্ধ হইতে চায় না, তখন তাহার মতো অরুচিকর জিনিস আর-কিছুই হইতে পারে না। এই সার্কাসের দলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রসিকের প্রত্যেক দিনই তাহার পক্ষে একান্ত বিস্বাদ হইয়া উঠিল। সে প্রায়ই বাড়ির স্বপ্ন দেখে। রাত্রে ঘুম হইতে জাগিয়া অন্ধকারে প্রথমটা রসিক মনে করে, সে তাহার দাদার বিছানার কাছে শুইয়া আছে; মুহূর্তকাল পরেই চমক ভাঙিয়া দেখে, দাদা কাছে নাই। বাড়িতে থাকিতে এক-একদিন শীতের রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে অনুভব করিত, দাদা তাহার শীত করিতেছে মনে করিয়া তাহার গাত্রবস্ত্রের উপর নিজের কাপড়খানা ধীরে ধীরে চাপাইয়া দিতেছে। এখানে পৌষের রাত্রে যখন ঘুমের ঘোরে তাহার শীত-শীত করে তখন দাদা তাহার গায়ে ঢাকা দিতে আসিবে মনে করিয়া সে যেন অপেক্ষা করিতে থাকে— দেরি হইতেছে দেখিয়া রাগ হয়। এমন সময় জাগিয়া উঠিয়া মনে পড়ে, দাদা কাছে নাই এবং সেই সঙ্গে ইহাও মনে হয় যে, এই শীতের সময় তাহার গায়ে আপন কাপড়টি টানিয়া দিতে না পারিয়া আজ রাত্রে শূন্যশয্যার প্রান্তে তাহার দাদার মনে শান্তি নাই। তখনই সেই অর্ধরাত্রে সে মনে করে, 'কাল সকালে উঠিয়াই আমি ঘরে ফিরিয়া যাইব।' কিন্তু, ভালো করিয়া জাগিয়া উঠিয়া, আবার সে শক্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, মনে মনে আপনাকে বারবার করিয়া জপাইতে থাকে যে, 'আমি পণের টাকা ভর্তি করিয়া বাইসিক্‌লে চড়িয়া বাড়ি ফিরিব, তবে আমি পুরুষমানুষ, তবে আমার নাম রসিক।'

একদিন দলের কর্তা তাহাকে তাঁতি বলিয়া বিশ্রী করিয়া গালি দিল। সেইদিন রসিক তাহার সামান্য কয়েকটি কাপড় ঘটি ও থালাবাটি, নিজের যে-কিছু ঋণ ছিল তাহার পরিবর্তে ফেলিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ রিক্তহস্তে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সমস্তদিন কিছু খাওয়া হয় নাই। সন্ধ্যার সময় যখন নদীর ধারে দেখিল গোরুগুলা আরামে চরিয়া খাইতেছে তখন একপ্রকার ঈর্ষার সহিত তাহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবী যথার্থ এই পশুপক্ষীদের মা— নিজের হাতে তাহাদের মুখে আহারের গ্রাস তুলিয়া দেন— আর, মানুষ বুঝি তাঁর কোন্‌ সতিনের ছেলে, তাই চারি দিকে এত বড়ো মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, কোথাও রসিকের জন্য একমুষ্টি অন্ন নাই। নদীর কিনারায় গিয়া রসিক অঞ্জলি ভরিয়া খুব খানিকটা জল খাইল। এই নদীটির ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, কোনো ভাবনা নাই, কোনো চেষ্টা নাই, ঘর নাই তবু ঘরের অভাব নাই, সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি আসিতেছে তবু সে নিরুদ্‌বেগে নিরুদ্দেশের অভিমুখে

ছুটিয়া চলিয়াছে— এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রসিক একদৃষ্টে জলের স্রোতের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল; বোধ করি তাহার মনে হইতেছিল, দুর্বহ মানবজন্মটাকে এই বন্ধনহীন নিশ্চিন্ত জলধারার সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে পারিলেই একমাত্র শান্তি।

এমন সময় একজন তরুণ যুবক মাথা হইতে একটা বস্তা নামাইয়া তাহার পাশে বসিয়া কোঁচার প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া ভিজাইয়া খাইবার উদ্যোগ করিল। এই লোকটিকে দেখিয়া রসিকের কিছু নূতন রকমের ঠেকিল। পায়ে জুতা নাই, ধুতির উপর একটা জামা, মাথায় পাগড়ি পরা— দেখিবামাত্র স্পষ্ট মনে হয়, ভদ্রলোকের ছেলে— কিন্তু মুটে-মজুরের মতো কেন যে সে এমন করিয়া বস্তা বহিয়া বেড়াইতেছে ইহা সে বুঝিতে পারিল না। দুইজনের আলাপ হইতে দেরি হইল না এবং রসিক ভিজা চিঁড়ার যথোচিত পরিমাণে ভাগ লইল। এ ছেলেটি কলিকাতার কলেজের ছাত্র। ছাত্রেরা যে স্বদেশী কাপড়ের দোকান খুলিয়াছে তাহারই জন্য দেশি কাপড় সংগ্রহ করিতে সে এই গ্রামের হাটে আসিয়াছে। নাম সুবোধ, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাহার কোনো সংকোচ নাই, বাধা নাই— সমস্তদিন হাটে ঘুরিয়া সন্ধ্যাবেলায় চিঁড়া ভিজাইয়া খাইতেছে।

দেখিয়া নিজের সম্বন্ধে রসিকের ভারি একটা লজ্জা বোধ হইল। শুধু তাই নয়, তাহার মনে হইল 'যেন মুক্তি পাইলাম'। এমন করিয়া খালি পায়ে মজুরের মতো যে মাথায় মোট বহিতে পারা যায় ইহা উপলব্ধি করিয়া জীবনযাত্রার ক্ষেত্র এক মুহূর্তে তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, 'আজ তো আমার উপবাস করিবার কোনো দরকারই ছিল না— আমি তো ইচ্ছা করিলেই মোট বহিতে পারিতাম।'

সুবোধ যখন মোট মাথায় লইতে গেল রসিক বাধা দিয়া বলিল, "মোট আমি বহিব।" সুবোধ তাহাতে নারাজ হইলে রসিক কহিল, "আমি তাঁতির ছেলে, আমি আপনার মোট বহিব, আমাকে কলিকাতায় লইয়া যান।" 'আমি তাঁতি', আগে হইলে রসিক এ কথা কখনোই মুখে উচ্চারণ করিতে পারিত না— তাহার বাধা কাটিয়া গেছে।

সুবোধ তো লাফাইয়া উঠিল; বলিল, "তুমি তাঁতি! আমি তো তাঁতি খুঁজিতেই বাহির হইয়াছি। আজকাল তাহাদের দর এত বাড়িয়াছে যে, কেহই আমাদের তাঁতের স্কুলে শিক্ষকতা করিতে যাইতে রাজি হয় না।"

রসিক তাঁতের স্কুলের শিক্ষক হইয়া কলিকাতায় আসিল। এত দিন পরে বাসা-খরচ বাদে সে সামান্য কিছু জমাইতে পারিল, কিন্তু বাইসিক্‌ল্‌চক্রের লক্ষ্য ভেদ করিতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে। আর, বধূর বরমাল্যের তো কথাই নাই!— ইতিমধ্যে তাঁতের স্কুলটা গোড়ায় যেমন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তেমনি হঠাৎ নিবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কমিটির বাবুরা যতক্ষণ কমিটি করিতে থাকেন অতি চমৎকার হয়, কিন্তু কাজ করিতে নামিলেই গণ্ডগোল বাধে; তাঁহারা নানা দিগ্‌দেশ হইতে নানা প্রকারের তাঁত আনাইয়া শেষকালে এমন একটা অপরূপ জঞ্জাল বুনিয়া তুলিলেন যে, সমস্ত ব্যাপারটা লইয়া যে কোন্‌ আবর্জনাকুণ্ডে ফেলা যাইতে পারে তাহা কমিটির পর কমিটি করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না।

রসিকের আর সহ্য হয় না। ঘরে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া

উঠিয়াছে। চোখের সামনে সে কেবলই আপনার গ্রামের নানা ছবি দেখিতেছে। অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটিও উজ্জ্বল হইয়া তাহার মনের সামনে দেখা দিয়া যাইতেছে। পুরোহিতের আধ-পাগলা ছেলেটা; তাহাদের প্রতিবেশীর কপিলবর্ণের বাছুরটা; নদীর পথে যাইতে রাস্তার দক্ষিণধারে একটা তাল গাছকে শিকড় দিয়া আঁটিয়া জড়াইয়া একটা অশথ গাছ দুই কুস্তিগির পালোয়ানের মতো প্যাঁচ কষিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই তলায় একটা অনেক দিনের পরিত্যক্ত ভিটা; তাহাদের বিলের তিন দিকে আমন ধান, এক পাশে গভীর জলের প্রান্তে মাছ-ধরা জাল বাঁধিবার জন্য বাঁশের খোঁটা পোঁতা, তাহারই উপরে একটি মাছরাঙা চুপ করিয়া বসিয়া; কৈবর্তপাড়া হইতে সন্ধ্যার পরে মাঠ পার হইয়া কীর্তনের শব্দ আসিতেছে; ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানা-প্রকার মিশ্রিত গন্ধে গ্রামের ছায়াময় পথে স্তব্ধ হাওয়া ভরিয়া রহিয়াছে; আর তারই সঙ্গে মিলিয়া তাহার সেই ভক্তবন্ধুর দল, সেই চঞ্চল গোপাল, সেই আঁচলের-খুঁটে-পান-বাঁধা বড়ো-বড়ো-স্নিগ্ধ-চোখ-মেলা সৌরভী—এই-সমস্ত স্মৃতি, ছবিতে গন্ধে শব্দে, স্নেহে প্রীতিতে বেদনায়, তাহার মনকে প্রতিদিন গভীরতর আবিষ্ট করিয়া ধরিতে লাগিল। গ্রামে থাকিতে রসিকের যে নানাপ্রকার কারুনৈপুণ্য প্রকাশ পাইত এখানে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে, এখানে তাহার কোনো মূল্য নাই; এখনকার দোকান-বাজারের কলের তৈরি জিনিস হাতের চেষ্টাকে লজ্জা দিয়া নিরস্ত করে। তাঁতের ইস্কুলে কাজ কাজের বিড়ম্বনামাত্র, তাহাতে মন ভরে না। থিয়েটারের দীপ-শিখা তাহার চিত্তকে পতঙ্গের মতো মরণের পথে টানিয়াছিল—কেবল টাকা জমাইবার কঠোর নিষ্ঠা তাহাকে বাঁচাইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র তাহার গ্রামটিতে যাইবার পথই তাহার কাছে একেবারে রুদ্ধ। এইজন্যই গ্রামে যাইবার টান প্রতি মুহূর্তে তাহাকে এমন করিয়া পীড়া দিতেছে। তাঁতের ইস্কুলে সে প্রথমটা ভারি ভরসা পাইয়াছিল, কিন্তু আজ যখন সে আশা আর টেঁকে না, যখন তাহার দুই মাসের বেতনই সে আদায় করিতে পারিল না, তখন সে আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না এমন হইল। সমস্ত লজ্জা স্বীকার করিয়া, মাথা হেঁট করিয়া, এই এক বৎসর প্রবাসবাসের বৃহৎ ব্যর্থতা বহিয়া দাদার আশ্রয়ে যাইবার জন্য তাহার মনের মধ্যে কেবলই তাগিদ আসিতে লাগিল।

যখন মনটা অত্যন্ত যাই-যাই করিতেছে এমন সময় তাহার বাসার কাছে খুব ধুম করিয়া একটা বিবাহ হইল। সন্ধ্যাবেলায় বাজনা বাজাইয়া বর আসিল। সেইদিন রাত্রে রসিক স্বপ্ন দেখিল, তাহার মাথায় টোপর, গায়ে লাল চেলি; কিন্তু সে গ্রামের বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা 'তোর বর আসিয়াছে' বলিয়া সৌরভীকে খেপাইতেছে, সৌরভী বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে—রসিক তাহাদিগকে শাসন করিতে ছুটিয়া আসিতে চায়, কিন্তু কেমন করিয়া কেবলই বাঁশের কঞ্চিতে তাহার কাপড় জড়াইয়া যায়, ডালে তাহার টোপর আটকায়, কোনোমতেই পথ করিয়া বাহির হইতে পারে না। জাগিয়া উঠিয়া রসিকের মনের মধ্যে ভারি লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। বধূ তাহার জন্য ঠিক করা আছে অথচ সেই বধূকে ঘরে আনিবার যোগ্যতা তাহার নাই, এইটেই তাহার কাপুরুষতার সব চেয়ে চূড়ান্ত পরিচয় বলিয়া মনে হইল। না—এতবড়ো দীনতা স্বীকার করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া কোনো-মতেই হইতে পারে না।

৬

অনাবৃষ্টি যখন চলিতে থাকে তখন দিনের পর দিন কাটিয়া যায় মেঘের আর দেখা নাই, যদি বা মেঘ দেখা দেয় বৃষ্টি পড়ে না, যদি বা বৃষ্টি পড়ে তাহাতে মাটি ভেজে না। কিন্তু বৃষ্টি যখন নামে তখন দিগন্তের এক কোণে যেমনি মেঘ দেখা দেয় অমনি দেখিতে দেখিতে আকাশ ছাইয়া ফেলে এবং অবিরল বর্ষণে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতে থাকে। রসিকের ভাগ্যে হঠাৎ সেইরকমটা ঘটিল।

জানকী নন্দী মস্ত ধনী লোক। সে একদিন কাহার কাছ হইতে কী একটা খবর পাইল; তাঁতের ইস্কুলের সামনে তাহার জুড়ি আসিয়া থামিল, তাঁতের ইস্কুলের মাস্টারের সঙ্গে তাহার দুই-চারটে কথা হইল এবং তাহার পরদিনই রসিক আপনার মেসের বাসা পরিত্যাগ করিয়া নন্দীবাবুদের মস্ত তেতালা বাড়ির এক ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

নন্দীবাবুদের বিলাতের সঙ্গে কমিশন এজেন্সির মস্ত কারবার—সেই কারবারে কেন যে জানকীবাবু অযাচিতভাবে রসিককে একটা নিতান্ত সামান্য কাজে নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বেতন দিতে লাগিলেন তাহা রসিক বুঝিতেই পারিল না। সেরকম কাজের জন্য লোক সন্ধান করিবার দরকারই হয় না, এবং যদি বা লোক জোটে তাহার তো এত আদর নহে। বাজারে নিজের মূল্য কত এত দিনে রসিক তাহা বুঝিয়া লইয়াছে; অতএব জানকীবাবু যখন তাহাকে ঘরে রাখিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন তখন রসিক তাহার এত আদরের মূল কারণ সুদূর আকাশের গ্রহনক্ষত্র ছাড়া আর-কোথাও খুঁজিয়া পাইল না।

কিন্তু, তাহার শুভগ্রহটি অত্যন্ত দূরে ছিল না। তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা আবশ্যক।

একদিন জানকীবাবুর অবস্থা এমন ছিল না। তিনি যখন কষ্ট করিয়া কলেজে পড়িতেন তখন তাঁহার সতীর্থ হরমোহন বসু ছিলেন তাঁহার পরম বন্ধু। হরমোহন ব্রাহ্ম সমাজের লোক। এই কমিশন এজেন্সি হরমোহনদেরই পৈতৃক বাণিজ্য—তাঁহাদের একজন মুরুব্বি ইংরেজ সদাগর তাঁহার পিতাকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। তিনি তাঁহাকে এই কাজে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। হরমোহন তাঁহার নিঃস্ব বন্ধু জানকীকে এই কাজে টানিয়া লইয়াছিলেন।

সেই দরিদ্র অবস্থায় নূতন যৌবনে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে জানকীর উৎসাহ হরমোহনের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। তাই তিনি পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে বড়ো বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহাদের তন্তুবায়সমাজে যখন তাঁহার ভগিনীর বিবাহ অসম্ভব হইয়া উঠিল তখন কায়স্থ হরমোহন নিজে তাঁহাকে এই সংকট হইতে উদ্ধার করিয়া এই মেয়েটিকে বিবাহ করিলেন।

তাহার পরে অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। হরমোহনেরও মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার ভগিনীও মারা গেছে। ব্যাবসাটিও প্রায় সম্পূর্ণ জানকীর হাতে আসিয়াছে। ক্রমে বাসাবাড়ি হইতে তাহার তেতালা বাড়ি হইল, চিরকালের নিকেলের ঘড়িটিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়া সোনার ঘড়ি সুয়োরানীর মতো তাঁহার বক্ষের পার্শ্বে টিক্‌টিক্‌

করিতে লাগিল।

এইরূপে তাঁহার তহবিল যতই স্ফীত হইয়া উঠিল, অল্পবয়সের অকিঞ্চন অবস্থার সমস্ত উৎসাহ ততই তাঁহার কাছে নিতান্ত ছেলেমানুষি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোনোমতে পারিবারিক পূর্ব-ইতিহাসের এই অধ্যায়টাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সমাজে উঠিবার জন্য তাঁহার রোখ চাপিয়া উঠিল। নিজের মেয়েটিকে সমাজে বিবাহ দিবেন, এই তাঁর জেদ। টাকার লোভ দেখাইয়া দুই-একটি পাত্রকে রাজি করিয়াছিলেন, কিন্তু যখনই তাহাদের আত্মীয়েরা খবর পাইল তখনই তাহারা গোলমাল করিয়া বিবাহ ভাঙিয়া দিল। শিক্ষিত সৎপাত্র না হইলেও তাঁহার চলে— কন্যার চিরজীবনের সুখ বলিদান দিয়াও তিনি সমাজদেবতার প্রসাদলাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় তিনি তাঁতের ইস্কুলের মাস্টারের খবর পাইলেন। সে থানাগড়ের বসাক-বংশের ছেলে—তাহার পূর্বপুরুষ অভিরাম বসাকের নাম সকলেই জানে— এখন তাহাদের অবস্থা হীন, কিন্তু কুলে তাহারা তাঁহাদের চেয়ে বড়ো।

দূর হইতে দেখিয়া গৃহিণীর ছেলেটিকে পছন্দ হইল। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটির পড়াশুনা কিরকম।"

জানকীবাবু বলিলেন, "সে বালাই নাই। আজকাল যাহার পড়াশুনা বেশি তাহাকে হিন্দুয়ানিতে আঁটিয়া ওঠা শক্ত।"

গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, "টাকাকড়ি?"

জানকীবাবু বলিলেন, "যথেষ্ট অভাব আছে। আমার পক্ষে সেইটেই লাভ।"

গৃহিণী কহিলেন, "আত্মীয়স্বজনদের তো ডাকিতে হইবে।"

জানকীবাবু কহিলেন, "পূর্বে অনেকবার সে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; তাহাতে আত্মীয়স্বজনেরা দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বিবাহ হয় নাই। এবারে স্থির করিয়াছি, আগে বিবাহ দিব, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিষ্টালাপ পরে সময়মতো করা যাইবে।"

রসিক যখন দিনে রাত্রে তাহার গ্রামে ফিরিবার কথা চিন্তা করিতেছে, এবং হঠাৎ অভাবনীয়রূপে অতি সত্বর টাকা জমাইবার কী উপায় হইতে পারে তাহা ভাবিয়া কোনো কূলকিনারা পাইতেছে না, এমন সময় আহার ঔষধ দুইই তাহার মুখের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাঁ করিতে সে আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করিতে চাহিল না।

জানকীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাদাকে খবর দিতে চাও?"

রসিক কহিল, "না, তাহার কোনো দরকার নাই।" সমস্ত কাজ নিঃশেষে সারিয়া তাহার পরে সে দাদাকে চমৎকৃত করিয়া দিবে; অকর্মণ্য রসিকের যে সামর্থ্য কিরকম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোনো ত্রুটি থাকিবে না।

শুভলগ্নে বিবাহ হইযা গেল। অন্যান্য সকলপ্রকার দানসামগ্রীর আগে রসিক একটা বাইসিক্‌ল্‌ দাবি করিল।

৭

তখন মাঘের শেষ। সর্ষে এবং তিসির ফুলে খেত ভরিয়া আছে। আখের গুড় জ্বাল দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই গন্ধে বাতাস যেন ঘন হইয়া উঠিয়াছে। ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান এবং কলাই; গোয়ালের প্রাঙ্গণে খড়ের গাদা স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। ও পারে নদীর চরে বাথানে রাখালেরা গোরু-মহিষের দল লইয়া কুটির বাঁধিয়া বাস করিতেছে। খেয়াঘাটের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে—নদীর জল কমিয়া গিয়া, লোকেরা কাপড় গুটাইয়া হাঁটিয়া পার হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রসিক কলার-পরানো শার্টের উপর মালকোঁচা মারিয়া ঢাকাই ধুতি পরিয়াছে; শার্টের উপরে বোতাম-খোলা কালো বনাতের কোট; পায়ে রঙিন ফুল্-মোজা ও চক্‌চকে কালো চামড়ার শৌখিন বিলাতি জুতা। ডিস্ট্রিক্ট্-বোর্ডের পাকা রাস্তা বাহিয়া দ্রুতবেগে সে বাইসিক্‌ল্ চালাইয়া আসিল; গ্রামের কাঁচা রাস্তায় আসিয়া তাহাকে বেগ কমাইতে হইল। গ্রামের লোকে হঠাৎ তাহার বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে চিনিতেই পারিল না। সেও কাহাকেও কোনো সম্ভাষণ করিল না; তাহার ইচ্ছা, অন্য লোকে তাহাকে চিনিবার আগেই সর্বাগ্রে সে তাহার দাদার সঙ্গে দেখা করিবে। বাড়ির কাছাকাছি যখন সে আসিয়াছে তখন ছেলেদের চোখ সে এড়াইতে পারিল না। তাহারা এক মুহূর্তেই তাহাকে চিনিতে পারিল। সৌরভীদের বাড়ি কাছেই ছিল—ছেলেরা সেই দিকে ছুটিয়া চেঁচাইতে লাগিল, "সৈরিদিদির বর এসেছে, সৈরিদিদির বর।" গোপাল বাড়িতেই ছিল, সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবার পূর্বেই বাইসিক্‌ল্ রসিকদের বাড়ির সামনে আসিয়া থামিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে; ঘর অন্ধকার, বাহিরে তালা লাগানো। জনহীন পরিত্যক্ত বাড়ির যেন নীরব একটা কান্না উঠিতেছে, 'কেহ নাই, কেহ নাই।' এক নিমেষেই রসিকের বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিয়া চোখের সামনে সমস্ত অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার পা কাঁপিতে লাগিল, বন্ধ দরজা ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার গলা শুকাইয়া গেল, কাহাকেও ডাক দিতে সাহস হইল না। দূরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির যে কাঁসরঘণ্টা বাজিতেছিল তাহা যেন কোন্ একটি গতজীবনের পরপ্রান্ত হইতে সুগভীর একটা বিদায়ের বার্তা বাহিয়া তাহার কানের কাছে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সামনে যাহা কিছু দেখিতেছে, এই মাটির প্রাচীর, এই চালাঘর, এই রুদ্ধ কপাট, এই জিগর গাছের বেড়া, এই হেলিয়া-পড়া খেজুর গাছ—সমস্তই যেন একটা হারানো সংসারের ছবিমাত্র, কিছুই যেন সত্য নহে।

গোপাল আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। রসিক পাংশুমুখে গোপালের মুখের দিকে চাহিল; গোপাল কিছু না বলিয়া চোখ নিচু করিল। রসিক বলিয়া উঠিল, "বুঝেছি, বুঝেছি,—দাদা নাই!" অমনি সেইখানেই দরজার কাছে সে বসিয়া পড়িল। গোপাল তাহার পাশে বসিয়া কহিল, "ভাই রসিকদাদা, চলো আমাদের বাড়ি চলো।" রসিক তাহার দুই হাত ছাড়াইয়া দিয়া সেই দরজার সামনে উপুড় হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। "দাদা! দাদা! দাদা!"

যে দাদা তাহার পায়ের শব্দটি পাইলে আপনিই ছুটিয়া আসিত কোথাও তাহার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

গোপালের বাপ আসিয়া অনেক বলিয়া-কহিয়া রসিককে বাড়িতে লইয়া আসিল। রসিক সেখানে প্রবেশ করিয়াই মুহূর্তকালের জন্য দেখিতে পাইল, সৌরভী সেই তাহার চিত্রিত কাঁথায় মোড়া কী-একটা জিনিস অতি যত্নে রোয়াকের দেয়ালে ঠেসান দিয়া রাখিতেছে। প্রাঙ্গণে লোকসমাগমের শব্দ পাইবামাত্রই সে ছুটিয়া ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। রসিক কাছে আসিয়াই বুঝিতে পারিল, এই কাঁথায় মোড়া পদার্থটি একটি নূতন বাইসিক্‌ল্‌। তৎক্ষণাৎ তাহার অর্থ বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। একটা বুক-ফাটা কান্না বক্ষ ঠেলিয়া তাহার কণ্ঠের কাছে পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে লাগিল এবং চোখের জলের সমস্ত রাস্তা যেন ঠাসিয়া বন্ধ করিয়া ধরিল।

রসিক চলিয়া গেলে বংশী দিনরাত্রি অবিশ্রাম খাটিয়া সৌরভীর পণ এবং এই বাইসিক্‌ল্‌ কিনিবার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহার এক মুহূর্ত আর-কোনো চিন্তা ছিল না। ক্লান্ত ঘোড়া যেমন প্রাণপণে ছুটিয়া গম্য স্থানে পৌঁছিয়াই পড়িয়া মরিয়া যায়, তেমনি যেদিন পণের টাকা পূর্ণ করিয়া বংশী বাইসিক্‌ল্‌টি ভি. পি. ডাকে পাইল সেইদিনই আর তাহার হাত চলিল না, তাহার তাঁত বন্ধ হইয়া গেল; গোপালের পিতাকে ডাকিয়া তাহার হাতে ধরিয়া সে বলিল, "আর-একটি বছর রসিকের জন্য অপেক্ষা করিয়ো—এই তোমার হাতে পণের টাকা দিয়া গেলাম। আর যেদিন রসিক আসিবে তাহাকে এই চাকার গাড়িটি দিয়া বলিয়ো, দাদার কাছে চাহিয়াছিল, তখন হতভাগ্য দাদা দিতে পারে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে যেন সে রাগ না রাখে।"

দাদার টাকার উপহার গ্রহণ করিবে না, একদিন এই শপথ করিয়া রসিক চলিয়া গিয়াছিল। বিধাতা তাহার সেই কঠোর শপথ শুনিয়াছিলেন। আজ যখন রসিক ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল, দাদার উপহার তাহার জন্য এতদিন পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার দ্বার একেবারে রুদ্ধ। তাহার দাদা যে-তাঁতে আপনার জীবনটি বুনিয়া আপনার ভাইকে দান করিয়াছে, রসিকের ভারি ইচ্ছা করিল, সব ছাড়িয়া সেই তাঁতের কাছেই আপনার জীবন উৎসর্গ করে। কিন্তু হায়, কলিকাতা শহরে টাকার হাড়কাঠে চিরকালের মতো সে আপনার জীবন বলি দিয়া আসিয়াছে।

পৌষ ১৩১৮

হালদারগোষ্ঠী

এই পরিবারটির মধ্যে কোনোরকমের গোল বাধিবার কোনো সংগত কারণ ছিল না। অবস্থাও সচ্ছল, মানুষগুলিও কেহই মন্দ নহে। কিন্তু তবুও গোল বাধিল।

কেননা, সংগত কারণেই যদি মানুষের সব-কিছু ঘটিত তবে তো লোকালয়টা একটা অঙ্কের খাতার মতো হইত, একটু সাবধানে চলিলেই হিসাবে কোথাও কোনো ভুল ঘটিত না; যদি বা ঘটিত সেটাকে রবার দিয়া মুছিয়া সংশোধন করিলেই চলিয়া যাইত।

কিন্তু, মানুষের ভাগ্যদেবতার রসবোধ আছে; গণিতশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য আছে কি না জানি না, কিন্তু অনুরাগ নাই; মানবজীবনের যোগবিয়োগের বিশুদ্ধ অঙ্কফলটি উদ্ধার করিতে তিনি মনোযোগ করেন না। এইজন্য তাঁহার ব্যবস্থার মধ্যে একটা পদার্থ তিনি সংযোগ করিয়াছেন, সেটা অসংগতি। যাহা হইতে পারিত সেটাকে সে হঠাৎ আসিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়। ইহাতেই নাট্যলীলা জমিয়া উঠে, সংসারের দুই কূল ছাপাইয়া হাসিকান্নার তুফান চলিতে থাকে।

এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল— যেখানে পদ্মবন সেখানে মত্তহস্তী আসিয়া উপস্থিত। পঙ্কের সঙ্গে পঙ্কজের একটা বিপরীত রকমের মাখামাখি হইয়া গেল। তা না হইলে এ গল্পটির সৃষ্টি হইতে পারিত না।

যে পরিবারের কথা উপস্থিত করিয়াছি তাহার মধ্যে সব চেয়ে যোগ্য মানুষ যে বনোয়ারিলাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে নিজেও তাহা বিলক্ষণ জানে এবং সেইটেতেই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। যোগ্যতা এঞ্জিনের স্টীমের মতো তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে; সামনে যদি সে রাস্তা পায় তো ভালোই, যদি না পায় তবে যাহা পায় তাহাকে ধাক্কা মারে।

তাহার বাপ মনোহরলালের ছিল সাবেককেলে বড়োমানুষি চাল। যে সমাজ তাঁহার, সেই সমাজের মাথাটিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি তাহার শিরোভূষণ হইয়া থাকিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। সুতরাং সমাজের হাত-পায়ের সঙ্গে তিনি কোনো সংস্রব রাখেন না। সাধারণ লোকে কাজকর্ম করে, চলে ফেরে; তিনি কাজ না-করিবার ও না-চলিবার বিপুল আয়োজনটির কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া বিরাজ করেন।

প্রায় দেখা যায়, এইপ্রকার লোকেরা বিনা চেষ্টায় আপনার কাছে অন্তত দুটি-একটি শক্ত এবং খাঁটি লোককে যেন চুম্বকের মতো টানিয়া আনেন। তাহার কারণ আর কিছু নয়, পৃথিবীতে একদল লোক জন্মায় সেবা করাই তাহাদের ধর্ম। তাহারা আপন প্রকৃতির চরিতার্থতার জন্যই এমন অক্ষম মানুষকে চায় যে লোক নিজের ভার ষোলো-আনাই তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারে। এই সহজ সেবকেরা নিজের কাজে কোনো সুখ পায় না; কিন্তু আর-একজনকে নিশ্চিন্ত করা, তাহাকে সম্পূর্ণ আরামে রাখা, তাহাকে সকলপ্রকার সংকট হইতে বাঁচাইয়া চলা, লোকসমাজে তাহার সম্মানবৃদ্ধি করা, ইহাতেই তাহাদের পরম উৎসাহ। ইহারা যেন একপ্রকারের পুরুষ মা; তাহাও নিজের ছেলের নহে, পরের ছেলের।

মনোহরলালের যে চাকরটি আছে, রামচরণ, তাহার শরীররক্ষা ও শরীরপাতের

একমাত্র লক্ষ্য বাবুর দেহ রক্ষা করা। যদি সে নিশ্বাস লইলে বাবুর নিশ্বাস লইবার প্রয়োজনটুকু বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে সে অহোরাত্র কামারের হাপরের মতো হাঁপাইতে রাজি আছে। বাহিরের লোকে অনেক সময় ভাবে, মনোহরলাল বুঝি তাঁহার সেবককে অনাবশ্যক খাটাইয়া অন্যায় পীড়ন করিতেছেন। কেননা, হাত হইতে গুড়গুড়ির নলটা হয়তো মাটিতে পড়িয়াছে, সেটাকে তোলা কঠিন কাজ নহে, অথচ সেজন্য ডাক দিয়া অন্য ঘর হইতে রামচরণকে দৌড় করানো নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু, এই-সকল ভূরি ভূরি অনাবশ্যক ব্যাপারে নিজেকে অত্যাবশ্যক করিয়া তোলাতেই রামচরণের প্রভূত আনন্দ।

যেমন তাঁহার রামচরণ, তেমনি তাঁহার আর-একটি অনুচর নীলকণ্ঠ। বিষয়-রক্ষার ভার এই নীলকণ্ঠের উপর। বাবুর প্রসাদপরিপুষ্ট রামচরণটি দিব্য সুচিক্কণ, কিন্তু নীলকণ্ঠের দেহে তাহার অস্থিকঙ্কালের উপর কোনোপ্রকার আব্রু নাই বলিলেই হয়। বাবুর ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দ্বারে সে মূর্তিমান দুর্ভিক্ষের মতো পাহারা দেয়। বিষয়টা মনোহরলালের, কিন্তু তাহার মমতাটা সম্পূর্ণ নীলকণ্ঠের।

নীলকণ্ঠের সঙ্গে বনোয়ারিলালের খিটিমিটি অনেক দিন হইতে বাধিয়াছে। মনে করো, বাপের কাছে দরবার করিয়া বনোয়ারি বড়োবউয়ের জন্য একটা নূতন গহনা গড়াইবার হুকুম আদায় করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, টাকাটা বাহির করিয়া লইয়া নিজের মনোমত করিয়া জিনিসটা ফরমাশ করে। কিন্তু, সে হইবার জো নাই। খরচপত্রের সমস্ত কাজই নীলকণ্ঠের হাত দিয়াই হওয়া চাই। তাহার ফল হইল এই, গহনা হইল বটে, কিন্তু কাহারও মনের মতো হইল না। বনোয়ারির নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, স্যাকরার সঙ্গে নীলকণ্ঠের ভাগবাটোয়ারা চলে। কড়া লোকের শত্রুর অভাব নাই। ঢের লোকের কাছে বনোয়ারি ঐ কথাই শুনিয়া আসিয়াছে যে, নীলকণ্ঠ অন্যকে যে পরিমাণে বঞ্চিত করিতেছে নিজের ঘরে তাহার ততোধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

অথচ দুই পক্ষে এই-যে সব বিরোধ জমা হইয়া উঠিয়াছে তাহা সামান্য পাঁচ-দশ টাকা লইয়া। নীলকণ্ঠের বিষয়বুদ্ধির অভাব নাই—এ কথা তাহার পক্ষে বুঝা কঠিন নহে যে, বনোয়ারির সঙ্গে বনাইয়া চলিতে না পারিলে কোনো-না-কোনো দিন তাহার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু, মনিবের ধন সম্বন্ধে নীলকণ্ঠের একটা কৃপণতার বায়ু আছে। সে যেটাকে অন্যায্য মনে করে মনিবের হুকুম পাইলেও কিছুতেই তাহা সে খরচ করিতে পারে না।

এ দিকে বনোয়ারির প্রায়ই অন্যায্য খরচের প্রয়োজন ঘটিতেছে। পুরুষের অনেক অন্যায্য ব্যাপারের মূলে যে কারণ থাকে সেই কারণটি এখানেও খুব প্রবলভাবে বর্তমান। বনোয়ারির স্ত্রী কিরণলেখার সৌন্দর্য সম্বন্ধে নানা মত থাকিতে পারে, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তাহার মধ্যে যে মতটি বনোয়ারির, বর্তমান প্রসঙ্গে একমাত্র সেইটেই কাজের। বস্তুত স্ত্রীর প্রতি বনোয়ারির মনের যে পরিমাণ টান সেটাকে বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে করে। অর্থাৎ, তাহারা নিজের স্বামীর কাছ হইতে যতটা আদর চায় অথচ পায় না, ইহা ততটা।

কিরণলেখার বয়স যতই হউক, চেহারা দেখিলে মনে হয় ছেলেমানুষটি। বাড়ির বড়োবউয়ের যেমনতরো গিন্নিবান্নি ধরনের আকৃতি-প্রকৃতি হওয়া উচিত সে তাহা একেবারেই নহে। সবসুদ্ধ জড়াইয়া সে যেন বড়ো স্বল্প।

বনোয়ারি তাহাকে আদর করিয়া অণু বলিয়া ডাকিত। যখন তাহাতেও কুলাইত না তখন বলিত পরমাণু। রসায়নশাস্ত্রে যাঁহাদের বিচক্ষণতা আছে তাঁহারা জানেন, বিশ্বঘটনায় অণুপরমাণুগুলির শক্তি বড়ো কম নয়।

কিরণ কোনোদিন স্বামীর কাছে কিছুর জন্য আবদার করে নাই। তাহার এমন একটি উদাসীন ভাব, যেন তাহার বিশেষ-কিছুতে প্রয়োজন নাই। বাড়িতে তাহার অনেক ঠাকুরঝি, অনেক ননদ; তাহাদিগকে লইয়া সর্বদাই তাহার সমস্ত মন ব্যাপৃত— নবযৌবনের নবজাগ্রত প্রেমের মধ্যে যে একটা নির্জন তপস্যা আছে তাহাতে তাহার তেমন প্রয়োজন-বোধ নাই। এইজন্য বনোয়ারির সঙ্গে ব্যবহারে তাহার বিশেষ একটা আগ্রহের লক্ষণ দেখা যায় না। যাহা সে বনোয়ারির কাছ হইতে পায় তাহা সে শান্তভাবে গ্রহণ করে, অগ্রসর হইয়া কিছু চায় না। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, স্ত্রীটি কেমন করিয়া খুশি হইবে সেই কথা বনোয়ারিকে নিজে ভাবিয়া বাহির করিতে হয়। স্ত্রী যেখানে নিজের মুখে ফরমাশ করে সেখানে সেটাকে তর্ক করিয়া কিছু-না-কিছু খর্ব করা সম্ভব হয়, কিন্তু নিজের সঙ্গে তো দর-কষাকষি চলে না। এমন স্থলে অযাচিত দানে যাচিত দানের চেয়ে খরচ বেশি পড়িয়া যায়।

তাহার পরে স্বামীর সোহাগের উপহার পাইয়া কিরণ যে কতখানি খুশি হইল তাহা ভালো করিয়া বুঝিবার জো নাই। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে বলে— বেশ! ভালো! কিন্তু, বনোয়ারির মনের খটকা কিছুতেই মেটে না; ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হয়, হয়তো পছন্দ হয় নাই। কিরণ স্বামীকে ঈষৎ ভর্ৎসনা করিয়া বলে, "তোমার ঐ স্বভাব। কেন এমন খুঁৎখুঁৎ করছ। কেন, এ তো বেশ হয়েছে।"

বনোয়ারি পাঠ্যপুস্তকে পড়িয়াছে— সন্তোষগুণটি মানুষের মহৎ গুণ। কিন্তু, স্ত্রীর স্বভাবে এই মহৎ গুণটি তাহাকে পীড়া দেয়। তাহার স্ত্রী তো তাহাকে কেবলমাত্র সন্তুষ্ট করে নাই, অভিভূত করিয়াছে, সেও স্ত্রীকে অভিভূত করিতে চায়। তাহার স্ত্রীকে তো বিশেষ কোনো চেষ্টা করিতে হয় না— যৌবনের লাবণ্য আপনি উছলিয়া পড়ে, সেবার নৈপুণ্য আপনি প্রকাশ হইতে থাকে। কিন্তু পুরুষের তো এমন সহজ সুযোগ নয়; পৌরুষের পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে কিছু-একটা করিয়া তুলিতে হয়। তাহার যে বিশেষ একটা শক্তি আছে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে পুরুষের ভালোবাসা ম্লান হইয়া থাকে। আর-কিছু না'ও যদি থাকে, ধন যে একটা শক্তির নিদর্শন, ময়ূরের পুচ্ছের মতো স্ত্রীর কাছে সেই ধনের সমস্ত বর্ণচ্ছটা বিস্তার করিতে পারিলে তাহাতে মন সান্ত্বনা পায়। নীলকণ্ঠ বনোয়ারির প্রেমনাট্যলীলার এই আয়োজনটাতে বারম্বার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। বনোয়ারি বাড়ির বড়োবাবু, তবু কিছুতে তাহার কর্তৃত্ব নাই, কর্তার প্রশ্রয় পাইয়া ভৃত্য হইয়া নীলকণ্ঠ তাহার উপরে আধিপত্য করে— ইহাতে বনোয়ারির যে অসুবিধা ও অপমান সেটা আর-কিছুর জন্য তত নহে যতটা পঞ্চশরের তূণে মনের মতো শর জোগাইবার অক্ষমতা-বশত।

একদিন এই ধনসম্পদে তাহারই অবাধ অধিকার তো জন্মিবে। কিন্তু যৌবন কি চিরদিন থাকিবে? বসন্তের রঙিন পেয়ালায় তখন এ সুধারস এমন করিয়া আপনা-আপনি ভরিয়া উঠিবে না; টাকা তখন বিষয়ীর টাকা হইয়া খুব শক্ত হইয়া জমিবে, গিরিশিখরের তুষারসংঘাতের মতো— তাহাতে কথায় কথায় অসাবধানের অপব্যয়ের ঢেউ খেলিতে থাকিবে না। টাকার দরকার তো এখনই, যখন আনন্দে তাহা নয়-ছয়

করিবার শক্তি নষ্ট হয় নাই।

বনোয়ারির প্রধান শখ তিনটি— কুস্তি, শিকার এবং সংস্কৃতচর্চা। তাহার খাতার মধ্যে সংস্কৃত উদ্ভটকবিতা একেবারে বোঝাই করা। বাদলার দিনে, জ্যোৎস্নারাত্রে, দক্ষিণা হাওয়ায়, সেগুলি বড়ো কাজে লাগে। সুবিধা এই, নীলকণ্ঠ এই কবিতাগুলির অলংকারবাহুল্যকে খর্ব করিতে পারে না। অতিশয়োক্তি যতই অতিশয় হউক, কোনো খাতাঞ্চি-সেরেস্তায় তাহার জন্য জবাবদিহি নাই। কিরণের কানের সোনায় কার্পণ্য ঘটে কিন্তু তাহার কানের কাছে যে মন্দাক্রান্তা গুঞ্জরিত হয় তাহার ছন্দে একটি মাত্রাও কম পড়ে না এবং তাহার ভাবে কোনো মাত্রা থাকে না বলিলেই হয়।

লম্বাচওড়া পালোয়ানের চেহারা বনোয়ারির। যখন সে রাগ করে তখন তাহার ভয়ে লোকে অস্থির। কিন্তু, এই জোয়ান লোকটির মনের ভিতরটা ভারি কোমল। তাহার ছোটো ভাই বংশীলাল যখন ছোটো ছিল তখন সে তাহাকে মাতৃস্নেহে লালন করিয়াছে। তাহার হৃদয়ে যেন একটি লালন করিবার ক্ষুধা আছে।

তাহার স্ত্রীকে সে যে ভালোবাসে তাহার সঙ্গে এই জিনিসটিও জড়িত, এই লালন করিবার ইচ্ছা। কিরণলেখা তরুচ্ছায়ার মধ্যে পথহারা রশ্মিরেখাটুকুর মতোই ছোটো, ছোটো বলিয়াই সে তাহার স্বামীর মনে ভারি একটা দরদ জাগাইয়া রাখিয়াছে; এই স্ত্রীকে বসনে ভূষণে নানারকম করিয়া সাজাইয়া দেখিতে তাহার বড়ো আগ্রহ। তাহা ভোগ করিবার আনন্দ নহে, তাহা রচনা করিবার আনন্দ, তাহা এককে বহু করিবার আনন্দ, কিরণলেখাকে নানা বর্ণে নানা আবরণে নানারকম করিয়া দেখিবার আনন্দ।

কিন্তু কেবলমাত্র সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বনোয়ারির এই শখ কোনো-মতেই মিটিতেছে না। তাহার নিজের মধ্যে একটি পুরুষোচিত প্রভুশক্তি আছে তাহাও প্রকাশ করিতে পারিল না, আর প্রেমের সামগ্রীকে নানা উপকরণে ঐশ্বর্যবান করিয়া তুলিবার যে ইচ্ছা তাহাও তার পূর্ণ হইতেছে না।

এমনি করিয়াই এই ধনীর সন্তান তাহার মানমর্যাদা, তাহার সুন্দরী স্ত্রী, তাহার ভরা যৌবন— সাধারণত লোকে যাহা কামনা করে তাহার সমস্ত লইয়াও সংসারে একদিন একটা উৎপাতের মতো হইয়া উঠিল।

সুখদা মধুকৈবর্তের স্ত্রী, মনোহরলালের প্রজা। সে একদিন অন্তঃপুরে আসিয়া কিরণলেখার পা জড়াইয়া ধরিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। ব্যাপারটা এই— বছর কয়েক পূর্বে নদীতে বেড়জাল ফেলিবার আয়োজন-উপলক্ষে অন্যান্য বারের মতো জেলেরা মিলিয়া একযোগে খৎ লিখিয়া মনোহরলালের কাছারিতে হাজার টাকা ধার লইয়াছিল। ভালোমতো মাছ পড়িলে সুদে আসলে টাকা শোধ করিয়া দিবার কোনো অসুবিধা ঘটে না; এইজন্য উচ্চ সুদের হারে টাকা লইতে ইহারা চিন্তামাত্র করে না। সে বৎসর তেমন মাছ পড়িল না, এবং ঘটনাক্রমে উপরি উপরি তিন বৎসর নদীর বাঁকে মাছ এত কম আসিল যে জেলেদের খরচ পোষাইল না, অধিকন্তু তাহারা ঋণের জালে বিপরীত রকম জড়াইয়া পড়িল। যে-সকল জেলে ভিন্ন এলেকার তাহাদের আর দেখা পাওয়া যায় না; কিন্তু, মধুকৈবর্ত ভিটাবাড়ির প্রজা, তাহার পলাইবার জো নাই বলিয়া সমস্ত দেনার দায় তাহার উপরেই চাপিয়াছে। সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার

অনুরোধ লইয়া সে কিরণের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিরণের শাশুড়ির কাছে গিয়া কোনো ফল নাই তাহা সকলেই জানে; কেননা, নীলকণ্ঠের ব্যবস্থায় কেহ যে আঁচড়টুকু কাটিতে পারে এ কথা তিনি কল্পনা করিতেও পারেন না। নীলকণ্ঠের প্রতি বনোয়ারির খুব একটা আক্রোশ আছে জানিয়াই মধুকৈবর্ত তাহার স্ত্রীকে কিরণের কাছে পাঠাইয়াছে।

বনোয়ারি যতই রাগ এবং যতই আস্ফালন করুক, কিরণ নিশ্চয় জানে যে, নীলকণ্ঠের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোনো অধিকার তাহার নাই। এইজন্য কিরণ সুখদাকে বার বার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "বাছা, কী করব বলো। জানই তো এতে আমাদের কোনো হাত নেই। কর্তা আছেন, মধুকে বলো, তাঁকে গিয়ে ধরুক।"

সে চেষ্টা তো পূর্বেই হইয়াছে। মনোহরলালের কাছে কোনো বিষয়ে নালিশ উঠিলেই তিনি তাহার বিচারের ভার নীলকণ্ঠের 'পরেই অর্পণ করেন, কখনোই তাহার অন্যথা হয় না। ইহাতে বিচারপ্রার্থীর বিপদ আরও বাড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাঁহার কাছে আপীল করিতে চায় তাহা হইলে কর্তা রাগিয়া আগুন হইয়া উঠেন—বিষয়কর্মের বিরক্তিই যদি তাঁহাকে পোহাইতে হইল তবে বিষয় ভোগ করিয়া তাঁহার সুখ কী!

সুখদা যখন কিরণের কাছে কান্নাকাটি করিতেছে তখন পাশের ঘরে বসিয়া বনোয়ারি তাহার বন্দুকের চোঙে তেল মাখাইতেছিল। বনোয়ারি সব কথাই শুনিল। কিরণ করুণকণ্ঠে যে বার বার করিয়া বলিতেছিল যে তাহারা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে অক্ষম, সেটা বনোয়ারির বুকে শেলের মতো বিঁধিল।

সেদিন মাঘীপূর্ণিমা ফাল্গুনের আরম্ভে আসিয়া পড়িয়াছে। দিনের বেলাকার গুমট ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ একটা পাগলা হাওয়া মাতিয়া উঠিল। কোকিল তো ডাকিয়া ডাকিয়া অস্থির; বারবার এক সুরের আঘাতে সে কোথাকার কোন্ ঔদাসীন্যকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর, আকাশে ফুলগন্ধের মেলা বসিয়াছে, যেন ঠেলাঠেলি ভিড়; জানলার ঠিক পাশেই অন্তঃপুরের বাগান হইতে মুচুকুন্দফুলের গন্ধ বসন্তের আকাশে নিবিড় নেশা ধরাইয়া দিল। কিরণ সেদিন লট্‌কানের-রঙ-করা একখানি শাড়ি এবং খোঁপায় বেলফুলের মালা পরিয়াছে। এই দম্পতির চিরনিয়ম-অনুসারে সেদিন বনোয়ারির জন্যও ফাল্গুন-ঋতুযাপনের উপযোগী একখানি লট্‌কানে-রঙিন চাদর ও বেলফুলের গোড়েমালা প্রস্তুত। রাত্রির প্রথম প্রহর কাটিয়া গেল তবু বনোয়ারির দেখা নাই। যৌবনের ভরা পেয়ালাটি আজ তাহার কাছে কিছুতেই রুচিল না। প্রেমের বৈকুণ্ঠলোকে এত বড়ো কুণ্ঠা লইয়া সে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া। মধুকৈবর্তের দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সে ক্ষমতা আছে নীলকণ্ঠের! এমন কাপুরুষের কণ্ঠে পরাইবার জন্য মালা কে গাঁথিয়াছে!

প্রথমেই সে তাহার বাহিরের ঘরে নীলকণ্ঠকে ডাকাইয়া আনিল এবং দেনার দায়ে মধুকৈবর্তকে নষ্ট করিতে নিষেধ করিল। নীলকণ্ঠ কহিল, মধুকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহা হইলে এই তামাদির মুখে বিস্তর টাকা বাকি পড়িবে; সকলেই ওজর করিতে আরম্ভ করিবে। বনোয়ারি তর্কে যখন পারিল না তখন যাহা মুখে

আসিল গালে দিতে লাগিল। বলিল, ছোটোলোক। নীলকণ্ঠ কহিল, "ছোটোলোক না হইলে বড়োলোকের শরণাপন্ন হইব কেন।" বলিল, চোর। নীলকণ্ঠ বলিল, "সে তো বটেই, ভগবান যাহাকে নিজের কিছুই দেন নাই, পরের ধনেই তো সে প্রাণ বাঁচায়।" সকল গালিই সে মাথায় করিয়া লইল; শেষকালে বলিল, "উকিলবাবু বসিয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গে কাজের কথাটা সারিয়া লই। যদি দরকার বোধ করেন তো আবার আসিব।"

বনোয়ারি ছোটো ভাই বংশীকে নিজের দলে টানিয়া তখনই বাপের কাছে যাওয়া স্থির করিল। সে জানিত, একলা গেলে কোনো ফল হইবে না, কেননা, এই নীলকণ্ঠকে লইয়াই তাহার বাপের সঙ্গে পূর্বেই তাহার খিটিমিটি হইয়াছে। বাপ তাহার উপর বিরক্ত হইয়াই আছেন। একদিন ছিল যখন সকলেই মনে করিত, মনোহরলাল তাঁহার বড়ো ছেলেকেই সব চেয়ে ভালোবাসেন। কিন্তু, এখন মনে হয়, বংশীর উপরেই তাঁহার পক্ষপাত। এইজন্যই বনোয়ারি বংশীকেও তাহার নালিশের পক্ষভুক্ত করিতে চাহিল।

বংশী, যাহাকে বলে, অত্যন্ত ভালো ছেলে। এই পরিবারের মধ্যে সে'ই কেবল দুটো এক্‌জামিন পাস করিয়াছে। এবার সে আইনের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দিনরাত জাগিয়া পড়া করিয়া করিয়া তাহার অন্তরের দিকে কিছু জমা হইতেছে কি না অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু শরীরের দিকে খরচ ছাড়া আর কিছুই নাই।

এই ফাল্গুনের সন্ধ্যায় তাহার ঘরে জানলা বন্ধ। ঋতুপরিবর্তনের সময়টাকে তাহার ভারি ভয়। হাওয়ার প্রতি তাহার শ্রদ্ধামাত্র নাই। টেবিলের উপর একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছে; কতক বই মেজের উপরে চৌকির পাশে রাশীকৃত, কতক টেবিলের উপরে; দেয়ালে কুলুঙ্গিতে কতকগুলি ঔষধের শিশি।

বনোয়ারির প্রস্তাবে সে কোনোমতেই সম্মত হইল না। বনোয়ারি রাগ করিয়া গর্জিয়া উঠিল, "তুই নীলকণ্ঠকে ভয় করিস!" বংশী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। বস্তুতই নীলকণ্ঠকে অনুকূল রাখিবার জন্য তাহার সর্বদাই চেষ্টা। সে প্রায় সমস্ত বৎসর কলিকাতার বাসাতেই কাটায়; সেখানে বরাদ্দ টাকার চেয়ে তাহার বেশি দরকার হইয়াই পড়ে। এই সূত্রে নীলকণ্ঠকে প্রসন্ন রাখাটা তাহার অভ্যস্ত।

বংশীকে ভীরু, কাপুরুষ, নীলকণ্ঠের চরণ-চারণ-চক্রবর্তী বলিয়া খুব একচোট গালি দিয়া বনোয়ারি একলাই বাপের কাছে গিয়া উপস্থিত। মনোহরলাল তাঁহাদের বাগানে দিঘির ঘাটে তাঁহার নধর শরীরটি উদ্ঘাটন করিয়া আরামে হাওয়া খাইতেছেন। পারিষদগণ কাছে বসিয়া কলিকাতার বারিস্টারের জেরায় জেলাকোর্টে অপর পল্লীর জমিদার অখিল মজুমদার যে কিরূপ নাকাল হইয়াছিল তাহারই কাহিনী কর্তাবাবুর শ্রুতিমধুর করিয়া রচনা করিতেছিল। সেদিন বসন্তসন্ধ্যার সুগন্ধ বায়ু-সহযোগে সেই বৃত্তান্তটি তাঁহার কাছে অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ বনোয়ারি তাহার মাঝখানে পড়িয়া রসভঙ্গ করিয়া দিল। ভূমিকা করিয়া নিজের বক্তব্য কথাটা ধীরে ধীরে পাড়িবার মতো অবস্থা তাহার ছিল না। সে একেবারে গলা চড়াইয়া শুরু করিয়া দিল, নীলকণ্ঠের দ্বারা তাহাদের ক্ষতি হইতেছে। সে

চোর, সে মনিবের টাকা ভাঙিয়া নিজের পেট ভরিতেছে। কথাটার কোনো প্রমাণ নাই এবং তাহা সত্যও নহে। নীলকণ্ঠের দ্বারা বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে, এবং সে চুরিও করে না। বনোয়ারি মনে করিয়াছিল, নীলকণ্ঠের সৎস্বভাবের প্রতি অটল বিশ্বাস আছে বলিয়াই কর্তা সকল বিষয়েই তাহার 'পরে এমন চোখ বুজিয়া নির্ভর করেন। এটা তাহার ভ্রম। মনোহরলালের মনে নিশ্চয় ধারণা যে, নীলকণ্ঠ সুযোগ পাইলে চুরি করিয়া থাকে। কিন্তু, সেজন্য তাহার প্রতি তাঁহার কোনো অশ্রদ্ধা নাই। কারণ, আবহমান কাল এমনি ভাবেই সংসার চলিয়া আসিতেছে। অনুচরগণের চুরির উচ্ছিষ্টেই তো চিরকাল বড়োঘর পালিত। চুরি করিবার চাতুরী যাহার নাই, মনিবের বিষয়রক্ষা করিবার বুদ্ধিই বা তাহার জোগাইবে কোথা হইতে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়া তো জমিদারির কাজ চলে না। মনোহর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, নীলকণ্ঠ কী করে না-করে সে কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।" সেই সঙ্গে ইহাও বলিলেন, "দেখো দেখি, বংশীর তো কোনো বালাই নাই। সে কেমন পড়াশুনা করিতেছে! ঐ ছেলেটা তবু একটু মানুষের মতো।"

ইহার পরে অখিল মজুমদারের দুর্গতিকাহিনীতে আর রস জমিল না। সুতরাং, মনোহরলালের পক্ষে সেদিন বসন্তের বাতাস বৃথা বহিল এবং দিঘির কালো জলের উপর চাঁদের আলোর ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া উঠিবার কোনো উপযোগিতা রহিল না। সেদিন সন্ধ্যাটা কেবল বৃথা হয় নাই বংশী এবং নীলকণ্ঠের কাছে। জানলা বন্ধ করিয়া বংশী অনেক রাত পর্যন্ত পড়িল এবং উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নীলকণ্ঠ অর্ধেক রাত কাটাইয়া দিল।

কিরণ ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া জানলার কাছে বসিয়া। কাজকর্ম আজ সে সকাল-সকাল সারিয়া লইয়াছে। রাত্রের আহার বাকি, কিন্তু এখনো বনোয়ারি খায় নাই, তাই সে অপেক্ষা করিতেছে। মধুকৈবর্তের কথা তাহার মনেও নাই। বনোয়ারি যে মধুর দুঃখের কোনো প্রতিকার করিতে পারে না, এ সম্বন্ধে কিরণের মনে ক্ষোভের লেশমাত্র ছিল না। তাহার স্বামীর কাছ হইতে কোনোদিন সে কোনো বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাইবার জন্য উৎসুক নহে। পরিবারের গৌরবেই তাহার স্বামীর গৌরব। তাহার স্বামী তাহার শ্বশুরের বড়ো ছেলে, ইহার চেয়ে তাহাকে যে আরও বড়ো হইতে হইবে, এমন কথা কোনোদিন তাহার মনেও হয় নাই। ইঁহারা যে গোঁসাই-গঞ্জের সুবিখ্যাত হালদার-বংশ!

বনোয়ারি অনেক রাত্রি পর্যন্ত বাহিরের বারান্ডায় পায়চারি সমাধা করিয়া ঘরে আসিল। সে ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহার খাওয়া হয় নাই। কিরণ যে তাহার অপেক্ষায় না-খাইয়া বসিয়া আছে এই ঘটনাটা সেদিন যেন তাহাকে বিশেষ করিয়া আঘাত করিল। কিরণের এই কষ্টস্বীকারের সঙ্গে তাহার নিজের অকর্মণ্যতা যেন খাপ খাইল না। অন্নের গ্রাস তাহার গলায় বাধিয়া যাইবার জো হইল। বনোয়ারি অত্যন্ত উত্তেজনার সহিত স্ত্রীকে বলিল, "যেমন করিয়া পারি মধুকৈবর্তকে আমি রক্ষা করিব।" কিরণ তাহার এই অনাবশ্যক উগ্রতায় বিস্মিত হইয়া কহিল, "শোনো একবার! তুমি তাহাকে বাঁচাইবে কেমন করিয়া।"

মধুর দেনা বনোয়ারি নিজে শোধ করিয়া দিবে এই তাহার পণ, কিন্তু বনোয়ারির

হাতে কোনোদিন তো টাকা জমে না। স্থির করিল, তাহার তিনটে ভালো বন্দুকের মধ্যে একটা বন্দুক এবং একটা দামি হীরার আংটি বিক্রয় করিয়া সে অর্থ সংগ্রহ করিবে। কিন্তু, গ্রামে এ-সব জিনিসের উপযুক্ত মূল্য জুটিবে না এবং বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে চারি দিকে লোকে কানাকানি করিবে। এইজন্য কোনো-একটা ছুতা করিয়া বনোয়ারি কলিকাতায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় মধুকে ডাকিয়া আশ্বাস দিয়া গেল, তাহার কোনো ভয় নাই।

এ দিকে বনোয়ারির শরণাপন্ন হইয়াছে বুঝিয়া, নীলকণ্ঠ মধুর উপরে রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। পেয়াদার উৎপীড়নে কৈবর্তপাড়ার আর মানসম্ভ্রম থাকে না।

কলিকাতা হইতে বনোয়ারি যেদিন ফিরিয়া আসিল সেই দিনই মধুর ছেলে স্বরূপ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে বনোয়ারির পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউমাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। "কী রে কী, ব্যাপারখানা কী।" স্বরূপ বলিল, তাহার বাপকে নীলকণ্ঠ কাল রাত্রি হইতে কাছারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বনোয়ারির সর্বশরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল। কহিল, "এখনি গিয়া থানায় খবর দিয়া আয় গে।"

কী সর্বনাশ। থানায় খবর! নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে! তাহার পা উঠিতে চায় না। শেষকালে বনোয়ারির তাড়নায় থানায় গিয়া সে খবর দিল। পুলিস হঠাৎ কাছারিতে আসিয়া বন্ধনদশা হইতে মধুকে খালাস করিল এবং নীলকণ্ঠ ও কাছারির কয়েকজন পেয়াদাকে আসামী করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চালান করিয়া দিল।

মনোহর বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মকদ্দমার মন্ত্রীরা ঘুষের উপলক্ষ করিয়া পুলিসের সঙ্গে ভাগ করিয়া টাকা লুটিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে এক বারিস্টার আসিল, সে একেবারে কাঁচা, নূতন-পাস-করা। সুবিধা এই, যত ফি তাহার নামে খাতায় খরচ পড়ে তত ফি তাহার পকেটে উঠে না। ও দিকে মধুকৈবর্তের পক্ষে জেলা-আদালতের একজন মাতব্বর উকিল নিযুক্ত হইল। কে যে তাহার খরচ জোগাইতেছে বোঝা গেল না। নীলকণ্ঠের ছয় মাস মেয়াদ হইল। হাইকোর্টের আপিলেও তাহাই বহাল রহিল।

ঘড়ি এবং বন্দুকটা যে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে তাহা ব্যর্থ হইল না— আপাতত মধু বাঁচিয়া গেল এবং নীলকণ্ঠের জেল হইল। কিন্তু, এই ঘটনার পরে মধু তাহার ভিটায় টিঁকিবে কী করিয়া। বনোয়ারি তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "তুই থাক্, তোর কোনো ভয় নাই।" কিসের জোরে যে আশ্বাস দিল তাহা সেই জানে— বোধ করি, নিছক নিজের পৌরুষের স্পর্ধায়।

বনোয়ারি যে এই ব্যাপারের মূলে আছে তাহা সে লুকাইয়া রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করে নাই। কথাটা প্রকাশ হইল; এমন-কি, কর্তার কানেও গেল। তিনি চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "বনোয়ারি যেন কদাচ আমার সম্মুখে না আসে।" বনোয়ারি পিতার আদেশ অমান্য করিল না।

কিরণ তাহার স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া অবাক। এ কী কাণ্ড। বাড়ির বড়োবাবু— বাপের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ! তার উপরে নিজেদের আমলাকে জেলে পাঠাইয়া বিশ্বের লোকের কাছে নিজের পরিবারের মাথা হেঁট করিয়া দেওয়া! তাও এই এক সামান্য মধুকৈবর্তকে লইয়া!

অদ্ভুত বটে! এ বংশে কতকাল ধরিয়া কত বড়োবাবু জন্মিয়াছে এবং কোনো-দিন নীলকণ্ঠেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠেরা বিষয়ব্যবস্থার সমস্ত দায় নিজেরা লইয়াছে আর বড়োবাবুরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বংশগৌরব রক্ষা করিয়াছে। এমন বিপরীত ব্যাপার তো কোনোদিন ঘটে নাই!

আজ এই পরিবারের বড়োবাবুর পদের অবনতি ঘটাতে বড়োবউয়ের সম্মানে আঘাত লাগিল। ইহাতে এতদিন পরে আজ স্বামীর প্রতি কিরণের যথার্থ অশ্রদ্ধার কারণ ঘটিল। এতদিন পরে তাহার বসন্তকালের লট্‌কানে রঙের শাড়ি এবং খোঁপার বেলফুলের মালা লজ্জায় ম্লান হইয়া গেল।

কিরণের বয়স হইয়াছে অথচ সন্তান হয় নাই। এই নীলকণ্ঠই একদিন কর্তার মত করাইয়া পাত্রী দেখিয়া বনোয়ারির আর-একটি বিবাহ প্রায় পাকাপাকি স্থির করিয়াছিল। বনোয়ারি হালদারবংশের বড়ো ছেলে, সকল কথার আগে এ কথা তো মনে রাখিতে হইবে। সে অপুত্রক থাকিবে, ইহা তো হইতেই পারে না। এই ব্যাপারে কিরণের বুক দুর্‌দুর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহা সে মনে মনে না স্বীকার করিয়া থাকিতে পারে নাই যে, কথাটা সংগত। তখনো সে নীলকণ্ঠের উপরে কিছুমাত্র রাগ করে নাই, সে নিজের ভাগ্যকেই দোষ দিয়াছে। তাহার স্বামী যদি নীলকণ্ঠকে রাগিয়া মারিতে না যাইত এবং বিবাহসম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া পিতামাতার সঙ্গে রাগারাগি না করিত তবে কিরণ সেটাকে অন্যায় মনে করিত না। এমন-কি, বনোয়ারি যে তাহার বংশের কথা ভাবিল না, ইহাতে অতি গোপনে কিরণের মনে বনোয়ারির পৌরুষের প্রতি একটু অশ্রদ্ধাই হইয়াছিল। বড়ো ঘরের দাবি কি সামান্য দাবি। তাহার যে নিষ্ঠুর হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো তরুণী স্ত্রীর কিম্বা কোনো দুঃখী কৈবর্তের সুখদুঃখের কতটুকুই বা মূল্য!

সাধারণত যাহা ঘটিয়া থাকে এক-একবার তাহা না ঘটিলে কেহই তাহা ক্ষমা করিতে পারে না, এ কথা বনোয়ারি কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। সম্পূর্ণরূপে এ বাড়ির বড়োবাবু হওয়াই তাহার উচিত ছিল; অন্য কোনো প্রকারের উচিত-অনুচিত চিন্তা করিয়া এখানকার ধারাবাহিকতা নষ্ট করা যে তাহার অকর্তব্য, তাহা সে ছাড়া সকলেরই কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

এ লইয়া কিরণ তাহার দেবরের কাছে কত দুঃখই করিয়াছে। বংশী বুদ্ধিমান; তাহার খাওয়া হজম হয় না এবং একটু হাওয়া লাগিলেই সে হাঁচিয়া কাশিয়া অস্থির হইয়া উঠে, কিন্তু সে স্থির ধীর বিচক্ষণ। সে তাহার আইনের বইয়ের যে অধ্যায়টি পড়িতেছিল সেইটেকে টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় উপুড় করিয়া রাখিয়া কিরণকে বলিল, "এ পাগলামি ছাড়া আর-কিছুই নহে।" কিরণ অত্যন্ত উদ্‌বেগের সহিত মাথা নাড়িয়া কহিল, "জান তো ঠাকুরপো, তোমার দাদা যখন ভালো আছেন তখন বেশ আছেন, কিন্তু একবার যদি খ্যাপেন তবে তাঁহাকে কেহ সামলাইতে পারে না। আমি কী করি বলো তো।"

পরিবারের সকল প্রকৃতিস্থ লোকের সঙ্গেই যখন কিরণের মতের সম্পূর্ণ মিল হইল তখন সেইটেই বনোয়ারির বুকে সকলের চেয়ে বাজিল। এই একটুখানি স্ত্রীলোক, অনতিস্ফুট চাঁপাফুলটির মতো পেলব, ইহার হৃদয়টিকে আপন বেদনার কাছে টানিয়া আনিতে পুরুষের সমস্ত শক্তি পরাস্ত হইল। আজকের দিনে কিরণ

যদি বনোয়ারির সহিত সম্পূর্ণ মিলিতে পারিত তবে তাহার হৃদয়ক্ষত দেখিতে দেখিতে এমন করিয়া বাড়িয়া উঠিত না।

মধুকে রক্ষা করিতে হইবে এই অতি সহজ কর্তব্যের কথাটা, চারি দিক হইতে তাড়নার চোটে, বনোয়ারির পক্ষে সত্য-সত্যই একটা খ্যাপামির ব্যাপার হইয়া উঠিল। ইহার তুলনায় অন্য সমস্ত কথাই তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল। এ দিকে জেল হইতে নীলকণ্ঠ এমন সুস্থভাবে ফিরিয়া আসিল যেন সে জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। আবার সে যথারীতি অম্লানবদনে আপনার কাজে লাগিয়া গেল।

মধুকে ভিটাছাড়া করিতে না পারিলে প্রজাদের কাছে নীলকণ্ঠের মান রক্ষা হয় না। মানের জন্য সে বেশি কিছু ভাবে না, কিন্তু প্রজারা তাহাকে না মানিলে তাহার কাজ চলিবে না, এইজন্যই তাহাকে সাবধান হইতে হয়। তাই মধুকে তৃণের মতো উৎপাটিত করিবার জন্য তাহার নিড়ানিতে শান দেওয়া শুরু হইল।

এবার বনোয়ারি আর গোপনে রহিল না। এবার সে নীলকণ্ঠকে স্পষ্টই জানাইয়া দিল যে, যেমন করিয়া হউক মধুকে উচ্ছেদ হইতে সে দিবে না। প্রথমত, মধুর দেনা সে নিজে হইতে সমস্ত শোধ করিয়া দিল; তাহার পরে আর-কোনো উপায় না দেখিয়া সে নিজে গিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইয়া আসিল যে, নীলকণ্ঠ অন্যায় করিয়া মধুকে বিপদে ফেলিবার উদ্‌যোগ করিতেছে।

হিতৈষীরা বনোয়ারিকে সকলেই বুঝাইল, যেরূপ কাণ্ড ঘটিতেছে তাহাতে কোন্‌দিন মনোহর তাহাকে ত্যাগ করিবে। ত্যাগ করিতে গেলে যে-সব উৎপাত পোহাইতে হয় তাহা যদি না থাকিত তবে এতদিনে মনোহর তাহাকে বিদায় করিয়া দিত। কিন্তু, বনোয়ারির মা আছেন এবং আত্মীয়স্বজনের নানা লোকের নানাপ্রকার মত, এই লইয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিতে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছুক বলিয়াই এখনো মনোহর চুপ করিয়া আছেন।

এমনি হইতে হইতে একদিন সকালে হঠাৎ দেখা গেল, মধুর ঘরে তালা বন্ধ। রাতারাতি সে যে কোথায় গিয়াছে তাহার খবর নাই। ব্যাপারটা নিতান্ত অশোভন হইতেছে দেখিয়া নীলকণ্ঠ জমিদার-সরকার হইতে টাকা দিয়া তাহাকে সপরিবারে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছে। পুলিস তাহা জানে; এজন্য কোনো গোলমাল হইল না। অথচ নীলকণ্ঠ কৌশলে গুজব রটাইয়া দিল যে, মধুকে তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-সমেত অমাবস্যা-রাত্রে কালীর কাছে বলি দিয়া মৃতদেহগুলি ছালায় পুরিয়া মাঝগঙ্গায় ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভয়ে সকলের শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং নীলকণ্ঠের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা পূর্বের চেয়ে অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গেল।

বনোয়ারি যাহা লইয়া মাতিয়া ছিল উপস্থিতমতো তাহার শান্তি হইল। কিন্তু, সংসারটি তাহার কাছে আর পূর্বের মতো রহিল না।

বংশীকে একদিন বনোয়ারি অত্যন্ত ভালোবাসিত; আজ দেখিল, বংশী তাহার কেহ নহে, সে হালদারগোষ্ঠীর। আর, তাহার কিরণ, যাহার ধ্যানরূপটি যৌবনারম্ভের পূর্ব হইতেই ক্রমে ক্রমে তাহার হৃদয়ের লতাবিতানটিকে জড়াইয়া জড়াইয়া আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, সেও সম্পূর্ণ তাহার নহে, সেও হালদারগোষ্ঠীর। একদিন ছিল যখন নীলকণ্ঠের ফরমাশে-গড়া গহনা তাহার এই হৃদয়বিহারিণী কিরণের গায়ে ঠিকমতো মানাইত না বলিয়া বনোয়ারি খুঁৎখুঁৎ করিত। আজ দেখিল, কালিদাস

হইতে আরম্ভ করিয়া অমরু ও চৌর কবির যে-সমস্ত কবিতার সোহাগে সে প্রেয়সীকে মণ্ডিত করিয়া আসিয়াছে আজ তাহা এই হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউকে কিছুতেই মানাইতেছে না।

হায় রে, বসন্তের হাওয়া তবু বহে, রাত্রে শ্রাবণের বর্ষণ তবু মুখরিত হইয়া উঠে এবং অতৃপ্ত প্রেমের বেদনা শূন্য হৃদয়ের পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়।

প্রেমের নিবিড়তায় সকলের তো প্রয়োজন নাই; সংসারের ছোটো কুন্‌কের মাপের বাঁধা বরাদ্দে অধিকাংশ লোকের বেশ চলিয়া যায়। সেই পরিমিত ব্যবস্থায় বৃহৎ সংসারে কোনো উৎপাত ঘটে না। কিন্তু, এক-একজনের ইহাতে কুলায় না। তাহারা অজাত পক্ষীশাবকের মতো কেবলমাত্র ডিমের ভিতরকার সংকীর্ণ খাদ্যরসটুকু লইয়া বাঁচে না, তাহারা ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে, নিজের শক্তিতে খাদ্য-আহরণের বৃহৎ ক্ষেত্র তাহাদের চাই। বনোয়ারি সেই ক্ষুধা লইয়া জন্মিয়াছে, নিজের প্রেমকে নিজের পৌরুষের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য তাহার চিত্ত উৎসুক, কিন্তু যে দিকেই সে ছুটিতে চায় সেই দিকেই হালদারগোষ্ঠীর পাকা ভিত; নড়িতে গেলেই তাহার মাথা ঠুকিয়া যায়।

দিন আবার পূর্বের মতো কাটিতে লাগিল। আগের চেয়ে বনোয়ারি শিকারে বেশি মন দিয়াছে, ইহা ছাড়া বাহিরের দিক হইতে তাহার জীবনে আর বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা গেল না। অন্তঃপুরে সে আহার করিতে যায়, আহারের পর স্ত্রীর সঙ্গে যথাপরিমাণে বাক্যালাপও হয়। মধুকৈবর্তকে কিরণ আজও ক্ষমা করে নাই, কেননা, এই পরিবারে তাহার স্বামী যে আপন প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছে তাহার মূল কারণ মধু। এইজন্য ক্ষণে ক্ষণে কেমন করিয়া সেই মধুর কথা অত্যন্ত তীব্র হইয়া কিরণের মুখে আসিয়া পড়ে। মধুর যে হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, সে যে শয়তানের অগ্রগণ্য, এবং মধুকে দয়া করাটা যে নিতান্তই একটা ঠকা, এ কথা বারবার বিস্তারিত করিয়াও কিছুতে তাহার শান্তি হয় না। বনোয়ারি প্রথম দুই-একদিন প্রতিবাদের চেষ্টা করিয়া কিরণের উত্তেজনা প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করে না। এমনি করিয়া বনোয়ারি তাহার নিয়মিত গৃহধর্ম রক্ষা করিতেছে; কিরণ ইহাতে কোনো অভাব-অসম্পূর্ণতা অনুভব করে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বনোয়ারির জীবনটা বিবর্ণ, বিরস এবং চির-অভুক্ত।

এমন সময় জানা গেল, বাড়ির ছোটোবউ, বংশীর স্ত্রী গর্ভিণী। সমস্ত পরিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিরণের দ্বারা এই মহদ্‌বংশের প্রতি যে কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছিল, এতদিন পরে তাহা পূরণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে; এখন ষষ্ঠীর কৃপায় কন্যা না হইয়া পুত্র হইলে রক্ষা।

পুত্রই জন্মিল। ছোটোবাবু কলেজের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ, বংশের পরীক্ষাতেও প্রথম মার্ক্‌ পাইল। তাহার আদর উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল, এখন তাহার আদরের সীমা রহিল না।

সকলে মিলিয়া এই ছেলেটিকে লইয়া পড়িল। কিরণ তো তাহাকে এক মুহূর্ত কোল হইতে নামাইতে চায় না। তাহার এমন অবস্থা যে, মধুকৈবর্তের স্বভাবের কুটিলতার কথাও সে প্রায় বিস্মৃত হইবার জো হইল।

বনোয়ারির ছেলে-ভালোবাসা অত্যন্ত প্রবল। যাহা কিছু ছোটো, অক্ষম, সুকুমার,

তাহার প্রতি তাহার গভীর স্নেহ এবং করুণা। সকল মানুষেরই প্রকৃতির মধ্যে বিধাতা এমন একটা-কিছু দেন যাহা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, নহিলে বনোয়ারি যে কেমন করিয়া পাখি শিকার করিতে পারে বোঝা যায় না।

কিরণের কোলে একটি শিশুর উদয় দেখিবে, এই ইচ্ছা বনোয়ারির মনে বহুকাল হইতে অতৃপ্ত হইয়া আছে। এইজন্য বংশীর ছেলে হইলে প্রথমটা তাহার মনে একটু ঈর্ষার বেদনা জন্মিয়াছিল, কিন্তু সেটাকে দূর করিয়া দিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। এই শিশুটিকে বনোয়ারি খুবই ভালোবাসিতে পারিত, কিন্তু ব্যাঘাতের কারণ হইল এই যে, যত দিন যাইতে লাগিল কিরণ তাহাকে লইয়া অত্যন্ত বেশি ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর সঙ্গে বনোয়ারির মিলনে বিস্তর ফাঁক পড়িতে লাগিল। বনোয়ারি স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, এতদিন পরে কিরণ এমন একটা-কিছু পাইয়াছে যাহা তাহার হৃদয়কে সত্যসত্যই পূর্ণ করিতে পারে। বনোয়ারি যেন তাহার স্ত্রীর হৃদয়হর্ম্যের একজন ভাড়াটে; যতদিন বাড়ির কর্তা অনুপস্থিত ছিল ততদিন সমস্ত বাড়িটা সে ভোগ করিত, কেহ বাধা দিত না—এখন গৃহস্বামী আসিয়াছে তাই ভাড়াটে সব ছাড়িয়া তাহার কোণের ঘরটি মাত্র দখল করিতে অধিকারী। কিরণ স্নেহে যে কতদূর তন্ময় হইতে পারে, তাহার আত্মবিসর্জনের শক্তি যে কত প্রবল, তাহা বনোয়ারি যখন দেখিল তখন তাহার মন মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এই হৃদয়কে আমি তো জাগাইতে পারি নাই, অথচ আমার যাহা সাধ্য তাহা তো করিয়াছি।'

শুধু তাই নয়, এই ছেলেটির সূত্রে বংশীর ঘরই যেন কিরণের কাছে বেশি আপন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত মন্ত্রণা আলোচনা বংশীর সঙ্গেই ভালো করিয়া জমে। সেই সূক্ষ্মবুদ্ধি সূক্ষ্মশরীর রসরক্তহীন ক্ষীণজীবী ভীরু মানুষটার প্রতি বনোয়ারির অবজ্ঞা ক্রমেই গভীরতর হইতেছিল। সংসারের সকল লোকে তাহাকেই বনোয়ারির চেয়ে সকল বিষয়ে যোগ্য বলিয়া মনে করে তাহা বনোয়ারির সহিয়াছে; কিন্তু আজ সে যখন বারবার দেখিল, মানুষ হিসাবে তাহার স্ত্রীর কাছে বংশীর মূল্য বেশি, তখন নিজের ভাগ্য এবং বিশ্বসংসারের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন হইল না।

এমন সময়ে পরীক্ষার কাছাকাছি কলিকাতার বাসা হইতে খবর আসিল, বংশী জ্বরে পড়িয়াছে এবং ডাক্তার আরোগ্য অসাধ্য বলিয়া আশঙ্কা করিতেছে। বনোয়ারি কলিকাতায় গিয়া দিনরাত জাগিয়া বংশীর সেবা করিল, কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না।

মৃত্যু বনোয়ারির স্মৃতি হইতে সমস্ত কাঁটা উৎপাটিত করিয়া লইল। বংশী যে তাহার ছোটো ভাই এবং শিশুবয়সে দাদার কোলে যে তাহার স্নেহের আশ্রয় ছিল, এই কথাই তাহার মনে অশ্রুধৌত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার সমস্ত প্রাণের যত্ন দিয়া শিশুটিকে মানুষ করিতে সে কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু, এই শিশু সম্বন্ধে কিরণ তাহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছে। ইহার প্রতি তাহার স্বামীর বিরাগ সে প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়াছে। স্বামীর সম্বন্ধে কিরণের মনে কেমন একটা ধারণা হইয়া গেছে যে, অপর সাধারণের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহার স্বামীর পক্ষে ঠিক তাহার উলটা। তাহাদের বংশের এই তো একমাত্র কুলপ্রদীপ, ইহার মূল্য যে কী তাহা আর-সকলেই বোঝে, নিশ্চয় সেইজন্যই তাহার স্বামী তাহা বোঝে না। কিরণের মনে সর্বদাই ভয়, পাছে বনোয়ারির

বিদ্বেষদৃষ্টি ছেলেটির অমঙ্গল ঘটায়। তাহার দেবর বাঁচিয়া নাই, কিরণের সন্তান-সম্ভাবনা আছে বলিয়া কেহই আশা করে না, অতএব এই শিশুটিকে কোনোমতে সকলপ্রকার অকল্যাণ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তবে রক্ষা। এইরূপে বংশীয় ছেলেটিকে যত্ন করিবার পথ বনোয়ারির পক্ষে বেশ স্বাভাবিক হইল না।

বাড়ির সকলের আদরে ক্রমে ছেলেটি বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার নাম হইল হরিদাস। এত বেশি আদরের আওতায় সে যেন কেমন ক্ষীণ এবং ক্ষণভঙ্গুর আকার ধারণ করিল। তাগা-তাবিজ-মাদুলিতে তাহার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন, রক্ষকের দল সর্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া।

ইহার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে বনোয়ারির সঙ্গে তাহার দেখা হয়। জ্যাঠামশায়ের ঘোড়ায় চড়িবার চাবুক লইয়া আস্ফালন করিতে সে বড়ো ভালোবাসে। দেখা হইলেই বলে 'চাবু'। বনোয়ারি ঘর হইতে চাবুক বাহির করিয়া আনিয়া বাতাসে সাঁই সাঁই শব্দ করিতে থাকে, তাহার ভারি আনন্দ হয়। বনোয়ারি এক-একদিন তাহাকে আপনার ঘোড়ার উপর বসাইয়া দেয়, তাহাতে বাড়িসুদ্ধ লোক একেবারে হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে। বনোয়ারি কখনো কখনো আপনার বন্দুক লইয়া তাহার সঙ্গে খেলা করে, দেখিতে পাইলে কিরণ ছুটিয়া আসিয়া বালককে সরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু, এই-সকল নিষিদ্ধ আমোদেই হরিদাসের সকলের চেয়ে অনুরাগ। এইজন্য সকল-প্রকার বিঘ্ন-সত্ত্বে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে তাহার খুব ভাব হইল।

বহুকাল অব্যাহতির পর এক সময়ে হঠাৎ এই পরিবারে মৃত্যুর আনাগোনা ঘটিল। প্রথমে মনোহরের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তাহার পরে নীলকণ্ঠ যখন কর্তার জন্য বিবাহের পরামর্শ ও পাত্রীর সন্ধান করিতেছে এমন সময় বিবাহের লগ্নের পূর্বেই মনোহরের মৃত্যু হইল। তখন হরিদাসের বয়স আট। মৃত্যুর পূর্বে মনোহর বিশেষ করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র এই বংশধরকে কিরণ এবং নীলকণ্ঠের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন; বনোয়ারিকে কোনো কথাই বলিলেন না।

বাক্স হইতে উইল যখন বাহির হইল তখন দেখা গেল, মনোহর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরিদাসকে দিয়া গিয়াছেন। বনোয়ারি যাবজ্জীবন দুই শত টাকা করিয়া মাসোহারা পাইবেন। নীলকণ্ঠ উইলের এক্‌জিক্যুটর; তাহার উপরে ভার রহিল, সে যতদিন বাঁচে, হালদার-পরিবারের বিষয় এবং সংসারের ব্যবস্থা সেই করিবে।

বনোয়ারি বুঝিলেন, এ পরিবারে কেহ তাঁহাকে ছেলে দিয়াও ভরসা পায় না, বিষয় দিয়াও না। তিনি কিছুই পারেন না, সমস্তই নষ্ট করিয়া দেন, এ সম্বন্ধে এ বাড়িতে কাহারও দুই মত নাই। অতএব, তিনি বরাদ্দমতো আহার করিয়া কোণের ঘরে নিদ্রা দিবেন, তাঁহার পক্ষে এইরূপ বিধান।

তিনি কিরণকে বলিলেন, "আমি নীলকণ্ঠের পেন্‌সন খাইয়া বাঁচিব না। এ বাড়ি ছাড়িয়া চলো আমার সঙ্গে কলিকাতায়।"

"ওমা! সে কী কথা। এ তো তোমারই বাপের বিষয়, আর হরিদাস তো তোমারই আপন ছেলের তুল্য। ওকে বিষয় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তুমি রাগ কর কেন।"

হায় হায়, তাহার স্বামীর হৃদয় কী কঠিন। এই কচি ছেলের উপরেও ঈর্ষা করিতে তাহার মন ওঠে! তাহার শ্বশুর যে উইলটি লিখিয়াছে কিরণ মনে মনে

তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস, বনোয়ারির হাতে যদি বিষয় পড়িত তবে রাজ্যের যত ছোটোলোক, যত যদু মধু, যত কৈবর্ত এবং আগুরির দল তাহাকে ঠকাইয়া কিছু আর বাকি রাখিত না এবং হালদার-বংশের এই ভাবী আশা একদিন অকূলে ভাসিত। শ্বশুরের কুলে বাতি জ্বালিবার দীপটি তো ঘরে আসিয়াছে, এখন তাহার তৈলসঞ্চয় যাহাতে নষ্ট না হয় নীলকণ্ঠই তো তাহার উপযুক্ত প্রহরী।

বনোয়ারি দেখিল, নীলকণ্ঠ অন্তঃপুরে আসিয়া ঘরে ঘরে সমস্ত জিনিসপত্রের লিস্ট্ করিতেছে এবং যেখানে যত সিন্দুক-বাক্স আছে তাহাতে তালাচাবি লাগাইতেছে। অবশেষে কিরণের শোবার ঘরে আসিয়া সে বনোয়ারির নিত্যব্যবহার্য সমস্ত দ্রব্য ফর্দভুক্ত করিতে লাগিল। নীলকণ্ঠের অন্তঃপুরে গতিবিধি আছে, সুতরাং কিরণ তাহাকে লজ্জা করে না। কিরণ শ্বশুরের শোকে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু মুছিবার অবকাশে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বিশেষ করিয়া সমস্ত জিনিস বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

বনোয়ারি সিংহগর্জনে গর্জিয়া উঠিয়া নীলকণ্ঠকে বলিল, "তুমি এখনি আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাও।"

নীলকণ্ঠ নম্র হইয়া কহিল, "বড়োবাবু, আমার তো কোনো দোষ নাই। কর্তার উইল-অনুসারে আমাকে তো সমস্ত বুঝিয়া লইতে হইবে। আসবাবপত্র সমস্তই তো হরিদাসের।"

কিরণ মনে মনে কহিল, 'দেখো একবার, ব্যাপারখানা দেখো! হরিদাস কি আমাদের পর। নিজের ছেলের সামগ্রী ভোগ করিতে আবার লজ্জা কিসের। আর, জিনিসপত্র মানুষের সঙ্গে যাইবে না কি। আজ না হয় কাল ছেলেপুলেরাই তো ভোগ করিবে।'

এ বাড়ির মেঝে বনোয়ারির পায়ের তলায় কাঁটার মতো বিঁধিতে লাগিল, এ বাড়ির দেয়াল তাহার দুই চক্ষুকে যেন দগ্ধ করিল। তাহার বেদনা যে কিসের তাহা বলিবার লোকও এই বৃহৎ পরিবারে কেহ নাই।

এই মুহূর্তেই বাড়িঘর সমস্ত ফেলিয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য বনোয়ারির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু, তাহার রাগের জ্বালা যে থামিতে চায় না। সে চলিয়া যাইবে আর নীলকণ্ঠ আরামে একাধিপত্য করিবে, এ কল্পনা সে সহ্য করিতে পারিল না। এখনি কোনো-একটি গুরুতর অনিষ্ট করিতে না পারিলে তাহার মন শান্ত হইতে পারিতেছে না। সে বলিল, 'নীলকণ্ঠ কেমন বিষয় রক্ষা করিতে পারে আমি তাহা দেখিব।'

বাহিরে তাহার পিতার ঘরে গিয়া দেখিল, সে ঘরে কেহই নাই। সকলেই অন্তঃপুরের তৈজসপত্র ও গহনা প্রভৃতির খবরদারি করিতে গিয়াছে। অত্যন্ত সাবধান লোকেরও সাবধানতায় ত্রুটি থাকিয়া যায়। নীলকণ্ঠের হুঁশ ছিল না যে, কর্তার বাক্স খুলিয়া উইল বাহির করিবার পরে বাক্সয় চাবি লাগানো হয় নাই। সেই বাক্সয় তাড়াবাঁধা মূল্যবান সমস্ত দলিল ছিল। সেই দলিলগুলির উপরেই এই হালদার-বংশের সম্পত্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

বনোয়ারি এই দলিলগুলির বিবরণ কিছুই জানে না, কিন্তু এগুলি যে অত্যন্ত কাজের এবং ইহাদের অভাবে মামলা-মকদ্দমায় পদে পদে ঠকিতে হইবে তাহা সে বোঝে। কাগজগুলি লইয়া সে নিজের একটা রুমালে জড়াইয়া তাহাদের বাহিরের বাগানে চাঁপাতলার বাঁধানো চাতালে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নীলকণ্ঠ বনোয়ারির কাছে উপস্থিত হইল। নীলকণ্ঠের দেহের ভঙ্গি অত্যন্ত বিনম্র, কিন্তু তাহার মুখের মধ্যে এমন একটা-কিছু ছিল, অথবা ছিল না, যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তাহার মনে হইল, নম্রতার দ্বারা নীলকণ্ঠ তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

নীলকণ্ঠ বলিল, "কর্তার শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে—"

বনোয়ারি তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "আমি তাহার কী জানি।"

নীলকণ্ঠ কহিল, "সে কী কথা। আপনিই তো শ্রাদ্ধাধিকারী।"

'মস্ত অধিকার! শ্রাদ্ধের অধিকার! সংসারে কেবল ঐটুকুতে আমার প্রয়োজন আছে—আমি আর কোনো কাজেরই না।' বনোয়ারি গর্জিয়া উঠিল, "যাও যাও! আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না।"

নীলকণ্ঠ গেল কিন্তু তাহার পিছন হইতে বনোয়ারির মনে হইল, সে হাসিতে হাসিতে গেল। বনোয়ারির মনে হইল, বাড়ির সমস্ত চাকরবাকর এই অশ্রদ্ধিত, এই পরিত্যক্তকে লইয়া আপনাদের মধ্যে হাসিতামাশা করিতেছে। যে মানুষ বাড়ির অথচ বাড়ির নহে, তাহার মতো ভাগ্যকর্তৃক পরিহসিত আর কে আছে। পথের ভিক্ষুকও নহে।

বনোয়ারি সেই দলিলের তাড়া লইয়া বাহির হইল। হালদার-পরিবারের প্রতিবেশী ও প্রতিযোগী জমিদার ছিল প্রতাপপুরের বাঁড়ুজ্যে জমিদারেরা। বনোয়ারি স্থির করিল, 'এই দলিল-দস্তাবেজ তাহাদের হাতে দিব, বিষয়সম্পত্তি সমস্ত ছারখার হইয়া যাক।'

বাহির হইবার সময় হরিদাস উপরের তলা হইতে তাহার সুমধুর বালককণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিয়া কহিল, "জ্যাঠামশায়, তুমি বাহিরে যাইতেছ, আমিও তোমার সঙ্গে বাহিরে যাইব।"

বনোয়ারির মনে হইল, বালকের অশুভগ্রহ এই কথা তাহাকে দিয়া বলাইয়া লইল। 'আমি তো পথে বাহির হইয়াছি, উহাকেও আমার সঙ্গে বাহির করিব। যাবে যাবে, সব ছারখার হইবে।'

বাহিরের বাগান পর্যন্ত যাইতেই বনোয়ারি একটা বিষম গোলমাল শুনিতে পাইল। অদূরে হাটের সংলগ্ন একটি বিধবার কুটিরে আগুন লাগিয়াছে। বনোয়ারির চিরাভ্যাসক্রমে এ দৃশ্য দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার দলিলের তাড়া সে চাঁপাতলায় রাখিয়া আগুনের কাছে ছুটিল।

যখন ফিরিয়া আসিল, দেখিল, তাহার সেই কাগজের তাড়া নাই। মুহূর্তের মধ্যে হৃদয়ের শেল বিঁধাইয়া এই কথাটা মনে হইল, 'নীলকণ্ঠের কাছে আবার আমার হার হইল। বিধবার ঘর জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেলে তাহাতে ক্ষতি কী ছিল।' তাহার মনে হইল, চতুর নীলকণ্ঠই ওটা পুনর্বার সংগ্রহ করিয়াছে।

একেবারে ঝড়ের মতো সে কাছারিঘরে আসিয়া উপস্থিত। নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বনোয়ারিকে প্রণাম করিল। বনোয়ারির মনে হইল, ঐ বাক্সের মধ্যেই সে কাগজ লুকাইল। কোনোকিছু না বলিয়া একেবারে

সেই বাক্সটা খুলিয়া তাহার মধ্যে কাগজ ঘাঁটিতে লাগিল। তাহার মধ্যে হিসাবের খাতা এবং তাহারই জোগাড়ের সমস্ত নথি। বাক্স উপুড় করিয়া ঝাড়িয়া কিছুই মিলিল না।

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বনোয়ারি কহিল, "তুমি চাঁপাতলায় গিয়াছিলে?"

নীলকণ্ঠ বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, গিয়াছিলাম বই-কি। দেখিলাম, আপনি ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছেন, কী হইল তাহাই জানিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম।"

বনোয়ারি। আমার রুমালে-বাঁধা কাগজগুলা তুমিই লইয়াছ।

নীলকণ্ঠ নিতান্ত ভালোমানুষের মতো কহিল, "আজ্ঞা, না।"

বনোয়ারি। মিথ্যা কথা বলিতেছ। তোমার ভালো হইবে না, এখনি ফিরাইয়া দাও।

বনোয়ারি মিথ্যা তর্জন গর্জন করিল। কী জিনিস তাহার হারাইয়াছে তাহাও সে বলিতে পারিল না এবং সেই চোরাই মাল সম্বন্ধে তাহার কোনো জোর নাই জানিয়া সে মনে মনে অসাবধান মূঢ় আপনাকেই যেন ছিন্ন ছিন্ন করিতে লাগিল।

কাছারিতে এইরূপ পাগলামি করিয়া সে চাঁপাতলায় আবার খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিল। মনে মনে মাতৃদিব্য করিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল, 'যে করিয়া হউক এ কাগজ-গুলা পুনরায় উদ্ধার করিব তবে আমি ছাড়িব।' কেমন করিয়া উদ্ধার করিবে তাহা চিন্তা করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, কেবল ক্রুদ্ধ বালকের মতো বারবার মাটিতে পদাঘাত করিতে করিতে বলিল, 'উদ্ধার করিবই, করিবই, করিবই।'

শ্রান্তদেহে সে গাছতলায় বসিল। কেহ নাই, তাহার কেহ নাই এবং তাহার কিছুই নাই। এখন হইতে নিঃসম্বলে আপন ভাগ্যের সঙ্গে এবং সংসারের সঙ্গে তাহাকে লড়াই করিতে হইবে। তাহার পক্ষে মানসম্ভ্রম নাই, ভদ্রতা নাই, প্রেম নাই, স্নেহ নাই, কিছুই নাই। আছে কেবল মরিবার এবং মারিবার অধ্যবসায়।

এইরূপ মনে মনে ছটফট্ করিতে করিতে নিরতিশয় ক্লান্তিতে চাতালের উপর পড়িয়া কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যখন জাগিয়া উঠিল তখন হঠাৎ বুঝিতে পারিল না কোথায় সে আছে। ভালো করিয়া সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিয়া দেখে, তাহার শিয়রের কাছে হরিদাস বসিয়া। বনোয়ারিকে জাগিতে দেখিয়া হরিদাস বলিয়া উঠিল, "জ্যাঠামশায়, তোমার কী হারাইয়াছে বলো দেখি।"

বনোয়ারি স্তব্ধ হইয়া গেল। হরিদাসের এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না।

হরিদাস কহিল, "আমি যদি দিতে পারি আমাকে কী দিবে।"

বনোয়ারির মনে হইল, হয়তো আর-কিছু। সে বলিল, "আমার যাহা আছে সব তোকে দিব।"

এ কথা সে পরিহাস করিয়াই বলিল; সে জানে, তাহার কিছুই নাই।

তখন হরিদাস আপন কাপড়ের ভিতর হইতে বনোয়ারির রুমালে-মোড়া সেই কাগজের তাড়া বাহির করিল। এই রঙিন রুমালটাতে বাঘের ছবি আঁকা ছিল; সেই ছবি তাহার জ্যাঠা তাহাকে অনেকবার দেখাইয়াছে। এই রুমালটার প্রতি হরিদাসের বিশেষ লোভ। সেইজন্যই অগ্নিদাহের গোলমালে ভৃত্যেরা যখন বাহিরে ছুটিয়াছিল সেই অবকাশে বাগানে আসিয়া হরিদাস চাঁপাতলায় দূর হইতে এই রুমালটা দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল।

হরিদাসকে বনোয়ারি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; কিছুক্ষণ পরে তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, অনেকদিন পূর্বে সে তাহার এক নূতন-কেনা কুকুরকে শায়েস্তা করিবার জন্য তাহাকে বারম্বার চাবুক মারিতে বাধ্য হইয়াছিল। একবার তাহার চাবুক হারাইয়া গিয়াছিল, কোথাও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যখন চাবুকের আশা পরিত্যাগ করিয়া সে বসিয়া আছে এমন সময় দেখিল, সেই কুকুরটা কোথা হইতে চাবুকটা মুখে করিয়া মনিবের সম্মুখে আনিয়া পরমানন্দে লেজ নাড়িতেছে। আর-কোনোদিন কুকুরকে সে চাবুক মারিতে পারে নাই।

বনোয়ারি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, "হরিদাস, তুই কী চাস আমাকে বল্।"

হরিদাস কহিল, "আমি তোমার ঐ রুমালটা চাই, জ্যাঠামশায়।"

বনোয়ারি কহিল, "আয় হরিদাস, তোকে কাঁধে চড়াই।"

হরিদাসকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া বনোয়ারি তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। শয়নঘরে গিয়া দেখিল, কিরণ সারাদিন-রৌদ্রে-দেওয়া কম্বলখানি বারান্দা হইতে তুলিয়া আনিয়া ঘরের মেজের উপর পাতিতেছে। বনোয়ারির কাঁধের উপর হরিদাসকে দেখিয়া সে উদ্‌বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, "নামাইয়া দাও, নামাইয়া দাও। উহাকে তুমি ফেলিয়া দিবে।"

বনোয়ারি কিরণের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "আমাকে আর ভয় করিয়ো না, আমি ফেলিয়া দিব না।"

এই বলিয়া সে কাঁধ হইতে নামাইয়া হরিদাসকে কিরণের কোলের কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। তাহার পরে সেই কাগজগুলি লইয়া কিরণের হাতে দিয়া কহিল, "এগুলি হরিদাসের বিষয়সম্পত্তির দলিল। যত্ন করিয়া রাখিয়ো।"

কিরণ আশ্চর্য হইয়া কহিল, "তুমি কোথা হইতে পাইলে!"

বনোয়ারি কহিল, "আমি চুরি করিয়াছিলাম।"

তাহার পর হরিদাসকে বুকে টানিয়া কহিল, "এই নে বাবা, তোর জ্যাঠামশায়ের যে মূল্যবান সম্পত্তিটির প্রতি তোর লোভ পড়িয়াছে, এই নে।"

বলিয়া রুমালটি তাহার হাতে দিল।

তাহার পর আর-একবার ভালো করিয়া কিরণের দিকে তাকাইয়া দেখিল। দেখিল, সেই তন্বী এখন তো তন্বী নাই, কখন মোটা হইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউয়ের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমরুশতকের কবিতাগুলাও বনোয়ারির অন্য সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জন দেওয়াই ভালো।

সেই রাত্রেই বনোয়ারির আর দেখা নাই। কেবল সে একছত্র চিঠি লিখিয়া গেছে যে, সে চাকরি খুঁজিতে বাহির হইল।

বাপের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সে অপেক্ষা করিল না! দেশসুদ্ধ লোক তাই লইয়া তাহাকে ধিক্ ধিক্ করিতে লাগিল।

বৈশাখ ১৩২১

হৈমন্তী

কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেইজন্যই তাড়া।

আমি ছিলাম বর, সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল। আমার কাজ আমি করিয়াছি, এফ. এ. পাস করিয়া বৃত্তি পাইয়াছি। তাই প্রজাপতির দুই পক্ষ, কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ, ঘন ঘন বিচলিত হইয়া উঠিল।

আমাদের দেশে যে মানুষ একবার বিবাহ করিয়াছে বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো উদ্‌বেগ থাকে না। নরমাংসের স্বাদ পাইলে মানুষের সম্বন্ধে বাঘের যে দশা হয় স্ত্রী সম্বন্ধে তাহার ভাবটা সেইরূপ হইয়া উঠে। অবস্থা যেমনি ও বয়স যতই হউক, স্ত্রীর অভাব ঘটিবামাত্র তাহা পূরণ করিয়া লইতে তাহার কোনো দ্বিধা থাকে না। যত দ্বিধা ও দুশ্চিন্তা সে দেখি আমাদের নবীন ছাত্রদের। বিবাহের পৌনঃপুনিক প্রস্তাবে তাহাদের পিতৃপক্ষের পাকা চুল কলপের আশীর্বাদে পুনঃপুনঃ কাঁচা হইয়া উঠে, আর প্রথম ঘটকালির আঁচেই ইহাদের কাঁচা চুল ভাবনায় এক রাত্রে পাকিবার উপক্রম হয়।

সত্য বলিতেছি, আমার মনে এমন বিষম উদ্‌বেগ জন্মে নাই। বরঞ্চ বিবাহের কথায় আমার মনের মধ্যে যেন দক্ষিনে হাওয়া দিতে লাগিল। কৌতূহলী কল্পনার কিশলয়গুলির মধ্যে একটা যেন কানাকানি পড়িয়া গেল। যাহাকে বার্কের ফ্রেঞ্চ্‌ রেভোল্যুশনের নোট পাঁচ-সাত খাতা মুখস্থ করিতে হইবে, তাহার পক্ষে এ ভাবটা দোষের। আমার এ লেখা যদি টেক্‌স্‌ট্‌বুক-কমিটির অনুমোদিত হইবার কোনো আশঙ্কা থাকিত তবে সাবধান হইতাম।

কিন্তু, এ কী করিতেছি। এ কি একটি গল্প যে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম! এমন সুরে আমার লেখা শুরু হইবে এ আমি কি জানিতাম। মনে ছিল, কয় বৎসরের বেদনার যে মেঘ কালো হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বৈশাখসন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মতো প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করিয়া দিব। কিন্তু, না পারিলাম বাংলায় শিশুপাঠ্য বই লিখিতে, কারণ, সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই— আর, না পারিলাম কাব্য রচনা করিতে, কারণ, মাতৃভাষা আমার জীবনের মধ্যে এমন পুষ্পিত হইয়া উঠে নাই যাহাতে নিজের অন্তরকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি। সেইজন্যই দেখিতেছি, আমার ভিতরকার শ্মশানচারী সন্ন্যাসীটা অট্টহাস্যে আপনাকে আপনি পরিহাস করিতে বসিয়াছে। না করিয়া করিবে কী। তাহার যে অশ্রু শুকাইয়া গেছে। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রই তো জ্যৈষ্ঠের অশ্রুশূন্য রোদন।

আমার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়াছিল তাহার সত্য নামটা দিব না। কারণ, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার নামটি লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিবাদের কোনো আশঙ্কা নাই। যে তাম্রশাসনে তাহার নাম খোদাই করা আছে সেটা আমার হৃদয়পট।

কোনো কালে সে পট এবং সে নাম বিলুপ্ত হইবে, এমন কথা আমি মনে করিতে পারি না। কিন্তু, যে অমৃতলোকে তাহা অক্ষয় হইয়া রহিল সেখানে ঐতিহাসিকের আনাগোনা নাই।

আমার এ লেখায় তাহার যেমন হউক একটা নাম চাই। আচ্ছা, তাহার নাম দিলাম শিশির। কেননা, শিশিরে কান্নাহাসি একেবারে এক হইয়া আছে, আর শিশিরে ভোরবেলাটুকুর কথা সকালবেলায় আসিয়া ফুরাইয়া যায়।

শিশির আমার চেয়ে কেবল দুই বছরের ছোটো ছিল। অথচ, আমার পিতা যে গৌরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা নহে। তাঁহার পিতা ছিলেন উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী, দেশের প্রচলিত ধর্মকর্ম কিছুতে তাঁহার আস্থা ছিল না; তিনি কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। আমার পিতা উগ্রভাবে সমাজের অনুগামী; মানিতে তাঁহার বাধে এমন জিনিস আমাদের সমাজে, সদরে বা অন্দরে, দেউড়ি বা খিড়কির পথে, খুঁজিয়া পাওয়া দায়, কারণ, ইনিও কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। পিতামহ এবং পিতা উভয়েরই মতামত বিদ্রোহের দুই বিভিন্ন মূর্তি। কোনোটাই সরল স্বাভাবিক নহে। তবুও বড়ো বয়সের মেয়ের সঙ্গে বাবা যে আমার বিবাহ দিলেন তাহার কারণ, মেয়ের বয়স বড়ো বলিয়াই পণের অঙ্কটাও বড়ো। শিশির আমার শ্বশুরের একমাত্র মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল, কন্যার পিতার সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যতের গর্ভ পূরণ করিয়া তুলিতেছে।

আমার শ্বশুরের বিশেষ কোনো-একটা মতের বালাই ছিল না। তিনি পশ্চিমের এক পাহাড়ের কোনো রাজার অধীনে বড়ো কাজ করিতেন। শিশির যখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়। মেয়ে বৎসর-অন্তে এক-এক বছর করিয়া বড়ো হইতেছে, তাহা আমার শ্বশুরের চোখেই পড়ে নাই। সেখানে তাঁহার সমাজের লোক এমন কেহই ছিল না যে তাঁহাকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে।

শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইল; কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো, সমাজের ষোলো নহে। কেহ তাহাকে আপন বয়সের জন্য সতর্ক হইতে পরামর্শ দেয় নাই, সেও আপন বয়সটার দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

কলেজে তৃতীয় বৎসরে পা দিয়াছি, আমার বয়স উনিশ, এমন সময় আমার বিবাহ হইল। বয়সটা সমাজের মতে বা সমাজসংস্কারকের মতে উপযুক্ত কি না তাহা লইয়া তাহারা দুই পক্ষ লড়াই করিয়া রক্তারক্তি করিয়া মরুক, কিন্তু আমি বলিতেছি, সে বয়সটা পরীক্ষা পাস করিবার পক্ষে যত ভালো হউক বিবাহের সম্বন্ধ আসিবার পক্ষে কিছুমাত্র কম ভালো নয়।

বিবাহের অরুণোদয় হইল একখানি ফোটোগ্রাফের আভাসে। পড়া মুখস্থ করিতেছিলাম। একজন ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয়া আমার টেবিলের উপরে শিশিরের ছবিখানি রাখিয়া বলিলেন, "এইবার সত্যিকার পড়া পড়ো—একেবারে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া।"

কোনো-একজন আনাড়ি কারিগরের তোলা ছবি। মা ছিল না, সুতরাং কেহ তাহার চুল টানিয়া বাঁধিয়া, খোঁপায় জরি জড়াইয়া, সাহা বা মল্লিক কোম্পানির জবরজঙ জ্যাকেট পরাইয়া, বরপক্ষের চোখ ভুলাইবার জন্য জালিয়াতির চেষ্টা করে নাই। ভারি

একখানি সাদাসিধা মুখ, সাদাসিধা দুটি চোখ, এবং সাদাসিধা একটি শাড়ি। কিন্তু, সমস্তটি লইয়া কী যে মহিমা সে আমি বলিতে পারি না। যেমন-তেমন একখানি চৌকিতে বসিয়া, পিছনে একখানা ডোরা-দাগ-কাটা শতরঞ্চ ঝোলানো, পাশে একটা টিপাইয়ের উপরে ফুলদানিতে ফুলের তোড়া। আর, গালিচার উপরে শাড়ির বাঁকা পাড়টির নীচে দুখানি খালি পা।

পটের ছবিটির উপর আমার মনের সোনার কাঠি লাগিতেই সে আমার জীবনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সেই কালো দুটি চোখ আমার সমস্ত ভাবনার মাঝখানে কেমন করিয়া চাহিয়া রহিল। আর, সেই বাঁকা পাড়ের নিচেকার দুখানি খালি পা আমার হৃদয়কে আপন পদ্মাসন করিয়া লইল।

পঞ্জিকার পাতা উল্‌টাইতে থাকিল; দুটা-তিনটা বিবাহের লগ্ন পিছাইয়া যায়, শ্বশুরের ছুটি আর মেলে না। ও দিকে সামনে একটা অকাল চার-পাঁচটা মাস জুড়িয়া আমার আইবড় বয়সের সীমানাটাকে উনিশ বছর হইতে অনর্থক বিশ বছরের দিকে ঠেলিয়া দিবার চক্রান্ত করিতেছে! শ্বশুরের এবং তাঁহার মনিবের উপর রাগ হইতে লাগিল।

যা হউক, অকালের ঠিক পূর্বলগ্নটাতে আসিয়া বিবাহের দিন ঠেকিল। সেদিনকার সানাইয়ের প্রত্যেক তানটি যে আমার মনে পড়িতেছে। সেদিনকার প্রত্যেক মুহূর্তটি আমি আমার সমস্ত চৈতন্য দিয়া স্পর্শ করিয়াছি। আমার সেই উনিশ বছরের বয়সটি আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া থাক্‌।

বিবাহসভায় চারি দিকে হট্টগোল; তাহারই মাঝখানে কন্যার কোমল হাতখানি আমার হাতের উপর পড়িল। এমন আশ্চর্য আর কী আছে। আমার মন বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম।'

কাহাকে পাইলাম। এ যে দুর্লভ, এ যে মানবী, ইহার রহস্যের কি অন্ত আছে।

আমার শ্বশুরের নাম গৌরীশংকর। যে হিমালয়ে বাস করিতেন সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা। তাঁহার গাম্ভীর্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শুভ্র হইয়া ছিল। আর, তাঁহার হৃদয়ের ভিতরটিতে স্নেহের যে-একটি প্রস্রবণ ছিল তাহার সন্ধান যাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না।

কর্মক্ষেত্রে ফিরিবার পূর্বে আমার শ্বশুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, আমার মেয়েটিকে আমি সতেরো বছর ধরিয়া জানি, আর তোমাকে এই ক'টি দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল। যে ধন দিলাম, তাহার মূল্য যেন বুঝিতে পার, ইহার বেশি আশীর্বাদ আর নাই।"

তাঁহার বেহাই বেহান সকলেই তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "বেহাই, মনে কোনো চিন্তা রাখিয়ো না। তোমার মেয়েটি যেমন বাপকে ছাড়িয়া আসিয়াছে এখানে তেমনি বাপ মা উভয়কেই পাইল।"

তাহার পরে শ্বশুরমশায় মেয়ের কাছে বিদায় লইবার বেলা হাসিলেন; বলিলেন, "বুড়ি, চলিলাম। তোর একখানি মাত্র এই বাপ, আজ হইতে ইহার যদি কিছু খোওয়া যায় বা চুরি যায় বা নষ্ট হয় আমি তাহার জন্য দায়ী নই।"

মেয়ে বলিল, "তাই বই-কি। কোথাও একটু যদি লোকসান হয় তোমাকে তার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।"

অবশেষে নিত্য তাঁহার যে-সব বিষয়ে বিভ্রাট ঘটে বাপকে সে সম্বন্ধে সে বারবার সতর্ক করিয়া দিল। আহার সম্বন্ধে আমার শ্বশুরের যথেষ্ট সংযম ছিল না— গুটিকয়েক অপথ্য ছিল, তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি—বাপকে সে-সমস্ত প্রলোভন হইতে যথাসম্ভব ঠেকাইয়া রাখা মেয়ের এক কাজ ছিল। তাই আজ সে বাপের হাত ধরিয়া উদ্‌বেগের সহিত বলিল, "বাবা, তুমি আমার কথা রেখো—রাখবে?"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "মানুষ পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য, অতএব কথা না-দেওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ।"

তাহার পর বাপ চলিয়া আসিলে ঘরে কপাট পড়িল। তাহার পরে কী হইল কেহ জানে না।

বাপ ও মেয়ের অশ্রুহীন বিদ্যায়ব্যাপার পাশের ঘর হইতে কৌতূহলী অন্তঃপুরিকার দল দেখিল ও শুনিল। অবাক কাণ্ড! খোট্টার দেশে থাকিয়া খোট্টা হইয়া গেছে! মায়ামমতা একেবারে নাই!

আমার শ্বশুরের বন্ধু বনমালীবাবুই আমাদের বিবাহের ঘটকালি করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারেরও পরিচিত। তিনি আমার শ্বশুরকে বলিয়াছিলেন, "সংসারে তোমার তো ঐ একটি মেয়ে। এখন ইহাদেরই পাশে বাড়ি লইয়া এইখানেই জীবনটা কাটাও।"

তিনি বলিলেন, "যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিতে যাইবার মতো এমন বিড়ম্বনা আর নাই।"

সব-শেষে আমাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া অপরাধীর মতো সসংকোচে বলিলেন, "আমার মেয়েটির বই পড়িবার শখ, এবং লোকজনকে খাওয়াইতে ও বড়ো ভালোবাসে। এজন্য বেহাইকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে টাকা পাঠাইব। তোমার বাবা জানিতে পারিলে কি রাগ করিবেন।"

প্রশ্ন শুনিয়া কিছু আশ্চর্য হইলাম। সংসারে কোনো-একটা দিক হইতে অর্থ-সমাগম হইলে বাবা রাগ করিবেন, তাঁহার মেজাজ এত খারাপ তো দেখি নাই।

যেন ঘুষ দিতেছেন এমনিভাবে আমার হাতে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়াই আমার শ্বশুর দ্রুত প্রস্থান করিলেন; আমার প্রণাম লইবার জন্য সবুর করিলেন না। পিছন হইতে দেখিতে পাইলাম, এইবার পকেট হইতে রুমাল বাহির হইল।

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। মনে বুঝিলাম, ইঁহারা অন্য জাতের মানুষ।

বন্ধুদের অনেককেই তো বিবাহ করিতে দেখিলাম। মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীটিকে একেবারে এক গ্রাসে গলাধঃকরণ করা হয়। পাকযন্ত্রে পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বাদে এই পদার্থটির নানা গুণাগুণ প্রকাশ হইতে পারে এবং ক্ষণে ক্ষণে আভ্যন্তরিক উদ্‌বেগ উপস্থিত হইয়াও থাকে, কিন্তু রাস্তাটুকুতে কোথাও কিছুমাত্র বাধে না। আমি কিন্তু বিবাহসভাতেই বুঝিয়াছিলাম, দানের মন্ত্রে স্ত্রীকে যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে

সংসার চলে, কিন্তু পনেরো-আনা বাকি থাকিয়া যায়। আমার সন্দেহ হয়, অধিকাংশ লোকে স্ত্রীকে বিবাহমাত্র করে, পায় না, এবং জানেও না যে পায় নাই; তাহাদের স্ত্রীর কাছেও আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না। কিন্তু, সে যে আমার সাধনার ধন ছিল; সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।

শিশির—না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না। একে তো এটা তাহার নাম নয়, তাহাতে এটা তাহার পরিচয়ও নহে। সে সূর্যের মতো ধ্রুব; সে ক্ষণজীবিনী উষার বিদায়ের অশ্রুবিন্দুটি নয়। কী হইবে গোপনে রাখিয়া। তাহার আসল নাম হৈমন্তী।

দেখিলাম, এই সতেরো বছরের মেয়েটির উপরে যৌবনের সমস্ত আলো আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিয়া উঠে নাই। ঠিক যেন শৈলচূড়ার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বরফ এখনো গলিল না। আমি জানি, কী অকলঙ্ক শুভ্র সে, কী নিবিড় পবিত্র।

আমার মনে একটা ভাবনা ছিল যে, লেখাপড়া-জানা বড়ো মেয়ে, কী জানি কেমন করিয়া তাহার মন পাইতে হইবে। কিন্তু, অতি অল্প দিনেই দেখিলাম, মনের রাস্তার সঙ্গে বইয়ের দোকানের রাস্তার কোনো জায়গায় কোনো কাটাকাটি নাই। কবে যে তাহার সাদা মনটির উপরে একটু রঙ ধরিল, চোখে একটু ঘোর লাগিল, কবে যে তাহার সমস্ত শরীর মন যেন উৎসুক হইয়া উঠিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

এ তো গেল এক দিকের কথা। আবার অন্য দিকও আছে, সেটা বিস্তারিত বলিবার সময় আসিয়াছে।

রাজসংসারে আমার শ্বশুরের চাকরি। ব্যাঙ্কে যে তাঁহার কত টাকা জমিল সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি নানা প্রকার অঙ্কপাত করিয়াছে, কিন্তু কোনো অঙ্কটাই লাখের নীচে নামে নাই। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, তাহার পিতার দর যেমন-যেমন বাড়িল হৈমর আদরও তেমনি বাড়িতে থাকিল। আমাদের ঘরের কাজকর্ম রীতিপদ্ধতি শিখিয়া লইবার জন্য সে ব্যগ্র, কিন্তু মা তাহাকে অত্যন্ত স্নেহে কিছুতেই হাত দিতে দিলেন না। এমন-কি, হৈমর সঙ্গে পাহাড় হইতে যে দাসী আসিয়াছিল যদিও তাহাকে নিজেদের ঘরে ঢুকিতে দিতেন না তবু তাহার জাত সম্বন্ধে প্রশ্নমাত্র করিলেন না, পাছে বিশ্রী একটা উত্তর শুনিতে হয়।

এমনিভাবেই দিন চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু হঠাৎ একদিন বাবার মুখ ঘোর অন্ধকার দেখা গেল। ব্যাপারখানা এই—আমার বিবাহে আমার শ্বশুর পনেরো হাজার টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার গহনা দিয়াছিলেন। বাবা তাঁহার এক দালাল বন্ধুর কাছে খবর পাইয়াছেন, ইহার মধ্যে পনেরো হাজার টাকাই ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, তাহার সুদও নিতান্ত সামান্য নহে। লাখ টাকার গুজব তো একেবারেই ফাঁকি।

যদিও আমার শ্বশুরের সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধে আমার বাবার সঙ্গে তাঁহার কোনোদিন কোনো আলোচনাই হয় নাই, তবু বাবা জানি না কোন্ যুক্তিতে ঠিক করিলেন, তাঁহার বেহাই তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্বক প্রবঞ্চনা করিয়াছেন।

তার পরে, বাবার একটা ধারণা ছিল, আমার শ্বশুর রাজার প্রধানমন্ত্রী-গোছের একটা-কিছু। খবর লইয়া জানিলেন, তিনি সেখানকার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ। বাবা বলিলেন, অর্থাৎ ইস্কুলের হেড্‌মাস্টার— সংসারে ভদ্র পদ যতগুলো আছে তাহার মধ্যে সব চেয়ে ওঁচা। বাবার বড়ো আশা ছিল, শ্বশুর আজ বাদে কাল যখন কাজে অবসর লইবেন তখন আমিই রাজমন্ত্রী হইব।

এমন সময় রাস-উপলক্ষে দেশের কুটুম্বরা আমাদের কলিকাতার বাড়িতে আসিয়া জমা হইলেন। কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা কানাকানি পড়িয়া গেল। কানাকানি ক্রমে অস্ফুট হইতে স্ফুট হইয়া উঠিল। দূর সম্পর্কের কোনো-এক দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "পোড়া কপাল আমার! নাতবউ যে বয়সে আমাকেও হার মানাইল!"

আর-এক দিদিমাশ্রেণীয়া বলিলেন, "আমাদেরই যদি হার না মানাইবে তবে অপু বাহির হইতে বউ আনিতে যাইবে কেন।"

আমার মা খুব জোরের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, সে কী কথা। বউমার বয়স সবে এগারো বই তো নয়, এই আসছে ফাল্গুনে বারোয় পা দেবে। খোট্টার দেশে ডালরুটি খাইয়া মানুষ, তাই অমন বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

দিদিমারা বলিলেন, "বাছা, এখনো চোখে এত কম তো দেখি না। কন্যাপক্ষ নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে বয়স ভাঁড়াইয়াছে।"

মা বলিলেন, "আমরা যে কুষ্ঠি দেখিলাম।"

কথাটা সত্য। কিন্তু কোষ্ঠীতেই প্রমাণ আছে, মেয়ের বয়স সতেরো।

প্রবীণারা বলিলেন, "কুষ্ঠিতে কি আর ফাঁকি চলে না।"

এই লইয়া ঘোর তর্ক, এমন-কি, বিবাদ হইয়া গেল।

এমন সময়ে সেখানে হৈম আসিয়া উপস্থিত। কোনো-এক দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাতবউ, তোমার বয়স কত বলো তো।"

মা তাহাকে চোখ টিপিয়া ইশারা করিলেন। হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না; বলিল, "সতেরো।"

মা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি জানো না।"

হৈম কহিল, "আমি জানি, আমার বয়স সতেরো।"

দিদিমারা পরস্পর গা-টেপাটেপি করিলেন।

বধূর নির্বুদ্ধিতায় রাগিয়া উঠিয়া মা বলিলেন, "তুমি তো সব জান! তোমার বাবা যে বলিলেন, তোমার বয়স এগারো।"

হৈম চমকিয়া কহিল, "বাবা বলিয়াছেন? কখনো না।"

মা কহিলেন, "অবাক করিল। বেহাই আমার সামনে নিজের মুখে বলিলেন, আর মেয়ে বলে 'কখনো না'!" এই বলিয়া আর-একবার চোখ টিপিলেন।

এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল; স্বর আরও দৃঢ় করিয়া বলিল, "বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারেন না।"

মা গলা চড়াইয়া বলিলেন, "তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস?"

হৈম বলিল, "আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না।"

ইহার পরে মা যতই গালি দিতে লাগিলেন কথাটার কালী ততই গড়াইয়া ছড়াইয়া চারি দিকে লেপিয়া গেল।

মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন, "আইবড় মেয়ের বয়স সতেরো, এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা, তাই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের এখানে এ-সব চলিবে না, বলিয়া রাখিতেছি।"

হায় রে, তাঁহার বউমার প্রতি বাবার সেই মধুমাখা পঞ্চম স্বর আজ একেবারে এমন বাজখাঁই খাদে নাবিল কেমন করিয়া।

হৈম ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে কী বলিব।"

বাবা বলিলেন, "মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিয়ো, 'আমি জানি না— আমার শাশুড়ি জানেন'।"

কেমন করিয়া মিথ্যা বলিতে না হয় সেই উপদেশ শুনিয়া হৈম এমনভাবে চুপ করিয়া রহিল যে বাবা বুঝিলেন, তাঁহার সদুপদেশটা একেবারে বাজে খরচ হইল।

হৈমর দুর্গতিতে দুঃখ করিব কী, তাহার কাছে আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। সেদিন দেখিলাম, শরৎপ্রভাতের আকাশের মতো তাহার চোখের সেই সরল উদাস দৃষ্টি একটা কী সংশয়ে ম্লান হইয়া গেছে। ভীত হরিণীর মতো সে আমার মুখের দিকে চাহিল। ভাবিল, 'আমি ইহাদিগকে চিনি না।'

সেদিন একখানা শৌখিন-বাঁধাই-করা ইংরাজি কবিতার বই তাহার জন্য কিনিয়া আনিয়াছিলাম। বইখানি সে হাতে করিয়া লইল এবং আস্তে আস্তে কোলের উপর রাখিয়া দিল, একবার খুলিয়া দেখিল না।

আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, "হৈম, আমার উপর রাগ করিয়ো না। আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না। আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা।"

হৈম কিছু না বলিয়া একটুখানি হাসিল। সে হাসি বিধাতা যাহাকে দিয়াছেন তাহার কোনো কথা বলিবার দরকার নাই।

পিতার আর্থিক উন্নতির পর হইতে দেবতার অনুগ্রহকে স্থায়ী করিবার জন্য নূতন উৎসাহে আমাদের বাড়িতে পূজার্চনা চলিতেছে। এ-পর্যন্ত সে-সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বাড়ির বধূকে ডাক পড়ে নাই। নূতন বধূর প্রতি একদিন পূজা সাজাইবার আদেশ হইল; সে বলিল, "মা, বলিয়া দাও কী করিতে হইবে।"

ইহাতে কাহারও মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার কথা নয়, কারণ সকলেরই জানা ছিল মাতৃহীন প্রবাসে কন্যা মানুষ। কিন্তু, কেবলমাত্র হৈমকে লজ্জিত করাই এই আদেশের হেতু। সকলেই গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, এ কী কাণ্ড! এ কোন্ নাস্তিকের ঘরের মেয়ে। এবার এ সংসার হইতে লক্ষ্মী ছাড়িল, আর দেরি নাই।"

এই উপলক্ষে হৈমর বাপের উদ্দেশে যাহা-না-বলিবার তাহা বলা হইল। যখন হইতে কটু কথার হাওয়া দিয়াছে হৈম একেবারে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছে। এক দিনের জন্য কাহারও সামনে সে চোখের জলও ফেলে নাই। আজ তাহার বড়ো বড়ো দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনারা জানেন সে দেশে আমার বাবাকে সকলে ঋষি বলে?"

ঋষি বলে! ভারি একটা হাসি পড়িয়া গেল। ইহার পরে তাহার পিতার উল্লেখ করিতে হইলে প্রায়ই বলা হইত 'তোমার ঋষিবাবা'—এই মেয়েটির সকলের চেয়ে

ন্দরদের জায়গাটি যে কোথায় তাহা আমাদের সংসার বুঝিয়া লইয়াছিল।

বস্তুত, আমার শ্বশুর ব্রাহ্মও নন, খৃস্টানও নন, হয়তো বা নাস্তিকও না হইবেন। দেবার্চনার কথা কোনোদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই। মেয়েকে তিনি অনেক পড়াইয়াছেন-শুনাইয়াছেন, কিন্তু কোনো দিনের জন্য দেবতা সম্বন্ধে তিনি তাহাকে কোনো উপদেশ দেন নাই। বনমালীবাবু এ লইয়া তাঁহাকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা বুঝি না তাহা শিখাইতে গেলে কেবল কপটতা শেখানো হইবে।"

অন্তঃপুরে হৈমর একটি প্রকৃত ভক্ত ছিল, সে আমার ছোটো বোন নারানী। বউদিদিকে ভালোবাসে বলিয়া তাহাকে অনেক গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল। সংসার-যাত্রায় হৈমর সমস্ত অপমানের পালা আমি তাহার কাছেই শুনিতে পাইতাম। এক দিনের জন্যও আমি হৈমর কাছে শুনি নাই। এ-সব কথা সংকোচে সে মুখে আনিতে পারিত না। সে সংকোচ নিজের জন্য নহে।

হৈম তাহার বাপের কাছ হইতে যত চিঠি পাইত সমস্ত আমাকে পড়িতে দিত। চিঠিগুলি ছোটো কিন্তু রসে ভরা। সেও বাপকে যত চিঠি লিখিত সমস্ত আমাকে দেখাইত। বাপের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটিকে আমার সঙ্গে ভাগ করিয়া না লইলে তাহার দাম্পত্য যে পূর্ণ হইতে পারিত না। তাহার চিঠিতে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে কোনো নালিশের ইশারাটুকুও ছিল না। থাকিলে বিপদ ঘটিতে পারিত। নারানীর কাছে শুনিয়াছি, শ্বশুরবাড়ির কথা কী লেখে জানিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার চিঠি খোলা হইত।

চিঠির মধ্যে অপরাধের কোনো প্রমাণ না পাইয়া উপরওয়ালাদের মন যে শান্ত হইয়াছিল তাহা নহে। বোধ করি তাহাতে তাঁহারা আশাভঙ্গের দুঃখই পাইয়াছিলেন। বিষম বিরক্ত হইয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "এত ঘন ঘন চিঠিই বা কিসের জন্য। বাপই যেন সব, আমরা কি কেহ নই।" এই লইয়া অনেক অপ্রিয় কথা চলিতে লাগিল। আমি ক্ষুব্ধ হইয়া হৈমকে বলিলাম, "তোমার বাবার চিঠি আর-কাহাকেও না দিয়া আমাকেই দিয়ো। কলেজে যাইবার সময় আমি পোস্ট্ করিয়া দিব।"

হৈম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন।"

আমি লজ্জায় তাহার উত্তর দিলাম না।

বাড়িতে এখন সকলে বলিতে আরম্ভ করিল, "এইবার অপুর মাথা খাওয়া হইল। বি.এ. ডিগ্রি শিকায় তোলা রহিল। ছেলেরই বা দোষ কী।"

সে তো বটেই। দোষ সমস্তই হৈমর। তাহার দোষ যে তাহার বয়স সতেরো; তাহার দোষ যে আমি তাহাকে ভালোবাসি; তাহার দোষ যে বিধাতার এই বিধি, তাই আমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমস্ত আকাশ আজ বাঁশি বাজাইতেছে।

বি.এ. ডিগ্রি অকাতরচিত্তে আমি চুলায় দিতে পারিতাম। কিন্তু হৈমর কল্যাণে পণ করিলাম, পাস করিবই এবং ভালো করিয়াই পাস করিব। এ পণ রক্ষা করা আমার সে অবস্থায় যে সম্ভবপর বোধ হইয়াছিল তাহার দুইটি কারণ ছিল—এক তো হৈমর ভালোবাসার মধ্যে এমন একটি আকাশের বিস্তার ছিল যে, সংকীর্ণ আসক্তির মধ্যে সে মনকে জড়াইয়া রাখিত না, সেই ভালোবাসার চারি দিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া বহিত। দ্বিতীয়, পরীক্ষার জন্য যে বইগুলি পড়ার

প্রয়োজন তাহা হৈমর সঙ্গে একত্রে মিলিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।

পরীক্ষা পাসের উদ্‌যোগে কোমর বাঁধিয়া লাগিলাম। একদিন রবিবার মধ্যাহ্নে বাহিরের ঘরে বসিয়া মার্টিনোর চরিত্রতত্ত্ব বইখানার বিশেষ বিশেষ লাইনের মধ্য-পথগুলা ফাড়িয়া ফেলিয়া নীল পেন্‌সিলের লাঙল চালাইতেছিলাম, এমন সময় বাহিরের দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়িল।

আমার ঘরের সম্মুখে আঙিনার উত্তর দিকে অন্তঃপুরে উঠিবার একটা সিঁড়ি। তাহারই গায়ে গায়ে মাঝে মাঝে গরাদে-দেওয়া এক-একটা জানলা। দেখি, তাহারই একটি জানলায় হৈম চুপ করিয়া বসিয়া পশ্চিমের দিকে চাহিয়া। সে দিকে মল্লিকদের বাগানে কাঞ্চনগাছ গোলাপি ফুলে আচ্ছন্ন।

আমার বুকে ধক্‌ করিয়া একটা ধাক্কা দিল; মনের মধ্যে একটা অনবধানতার আবরণ ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। এই নিঃশব্দ গভীর বেদনার রূপটি আমি এতদিন এমন স্পষ্ট করিয়া দেখি নাই।

কিছু না, আমি কেবল তাহার বসিবার ভঙ্গীটুকু দেখিতে পাইতেছিলাম। কোলের উপরে একটি হাতের উপর আর-একটি হাত স্থির পড়িয়া আছে, মাথাটি দেয়ালের উপরে হেলানো, খোলা চুল বাম কাঁধের উপর দিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার বুকের ভিতরটা হুহু করিয়া উঠিল।

আমার নিজের জীবনটা এমনি কানায় কানায় ভরিয়াছে যে, আমি কোথাও কোনো শূন্যতা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আজ হঠাৎ আমার অত্যন্ত নিকটে অতি বৃহৎ একটা নৈরাশ্যের গহ্বর দেখিতে পাইলাম। কেমন করিয়া কী দিয়া আমি তাহা পূরণ করিব।

আমাকে তো কিছুই ছাড়িতে হয় নাই। না আত্মীয়, না অভ্যাস, না কিছু। হৈম যে সমস্ত ফেলিয়া আমার কাছে আসিয়াছে। সেটা কতখানি তাহা আমি ভালো করিয়া ভাবি নাই। আমাদের সংসারে অপমানের কণ্টকশয়নে সে বসিয়া; সে শয়ন আমিও তাহার সঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়াছি। সেই দুঃখে হৈমর সঙ্গে আমার যোগ ছিল, তাহাতে আমাদিগকে পৃথক করে নাই। কিন্তু, এই গিরিনন্দিনী সতেরো-বৎসর-কাল অন্তরে বাহিরে কত বড়ো একটা মুক্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে। কী নির্মল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ঋজু শুভ্র ও সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে হৈম যে কিরূপ নিরতিশয় ও নিষ্ঠুর-রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এতদিন তাহা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি নাই, কেননা সেখানে তাহার সঙ্গে আমার সমান আসন ছিল না।

হৈম যে অন্তরে অন্তরে মুহূর্তে মুহূর্তে মরিতেছিল। তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মুক্তি দিতে পারি না—তাহা আমার নিজের মধ্যে কোথায়? সেইজন্যই কলিকাতার গলিতে ঐ গরাদের ফাঁক দিয়া নির্বাক্‌ আকাশের সঙ্গে তাহার নির্বাক্‌ মনের কথা হয়; এবং এক-একদিন রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখি সে বিছানায় নাই, হাতের উপর মাথা রাখিয়া আকাশ-ভরা তারার দিকে মুখ তুলিয়া ছাতে শুইয়া আছে।

মার্টিনো পড়িয়া রহিল। ভাবিতে লাগিলাম, কী করি। শিশুকাল হইতে বাবার কাছে আমার সংকোচের অন্ত ছিল না, কখনো মুখামুখি তাঁহার কাছে দরবার

করিবার সাহস বা অভ্যাস আমার ছিল না। সেদিন থাকিতে পারিলাম না। লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে বলিয়া বসিলাম, "বউয়ের শরীর ভালো নয়, তাহাকে একবার বাপের কাছে পাঠাইলে হয়।"

বাবা তো একেবারে হতবুদ্ধি। মনে লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, হৈমই এইরূপ অভূতপূর্ব স্পর্ধায় আমাকে প্রবর্তিত করিয়াছে। তখনই তিনি উঠিয়া অন্তঃপুরে গিয়া হৈমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি বউমা, তোমার অসুখটা কিসের।"

হৈম বলিল, "অসুখ তো নাই।"

বাবা ভাবিলেন, এ উত্তরটা তেজ দেখাইবার জন্য।

কিন্তু, হৈমর শরীরও যে দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতেছিল তাহা আমরা প্রতিদিনের অভ্যাসবশতই বুঝি নাই। একদিন বনমালীবাবু তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ, এ কী। হৈমী, এ কেমন চেহারা তোর! অসুখ করে নাই তো?"

হৈম কহিল, "না।"

এই ঘটনার দিন-দশেক পরেই, বলা নাই, কহা নাই, হঠাৎ আমার শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত। হৈমর শরীরের কথাটা নিশ্চয় বনমালীবাবু তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন।

বিবাহের পর বাপের কাছে বিদায় লইবার সময় মেয়ে আপনার অশ্রু চাপিয়া নিয়াছিল। এবার মিলনের দিন বাপ যেমনি তাহার চিবুক ধরিয়া মুখটি তুলিয়া ধরিলেন অমনি হৈমর চোখের জল আর মানা মানিল না। বাপ একটি কথা বলিতে পারিলেন না; জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করিলেন না 'কেমন আছিস'। আমার শ্বশুর তাঁহার মেয়ের মুখে এমন-একটা কিছু দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল।

হৈম বাবার হাত ধরিয়া তাঁহাকে শোবার ঘরে লইয়া গেল। অনেক কথা যে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তাহার বাবারও যে শরীর ভালো দেখাইতেছে না!

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুড়ি, আমার সঙ্গে যাবি?"

হৈম কাঙালের মতো বলিয়া উঠিল, "যাব।"

বাপ বলিলেন, "আচ্ছা, সব ঠিক করিতেছি।"

শ্বশুর যদি অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হইয়া না থাকিতেন তাহা হইলে এ বাড়িতে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিতেন, এখানে তাঁহার আর সে দিন নাই। হঠাৎ তাঁহার আবির্ভাবকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবা তো ভালো করিয়া কথাই কহিলেন না। আমার শ্বশুরের মনে ছিল তাঁহার বেহাই একদা তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহার খুশি মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন। এ সত্যের অন্যথা হইতে পারে সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।

বাবা তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "বেহাই, আমি তো কিছু বলিতে পারি না, একবার তা হলে বাড়ির মধ্যে—"

বাড়ির-মধ্যের উপর বরাত দেওয়ার অর্থ কী আমার জানা ছিল। বুঝিলাম, কিছু হইবে না। কিছু হইলও না।

বউমার শরীর ভালো নাই! এত বড়ো অন্যায় অপবাদ!

শ্বশুরমশায় স্বয়ং একজন ভালো ডাক্তার আনিয়া পরীক্ষা করাইলেন। ডাক্তার বলিলেন, "বায়ু-পরিবর্তন আবশ্যক, নহিলে হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো হইতে পারে।"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো তো সকলেরই হইতে পারে।

এটা কি আবার একটা কথা।"

আমার শ্বশুর কহিলেন, "জানেন তো, উনি একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার, উঁহার কথাটা কি—"

বাবা কহিলেন, "অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি। দক্ষিণার জোরে সকল পণ্ডিতেরই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ডাক্তারেরই কাছে সব রোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।"

এই কথাটা শুনিয়া আমার শ্বশুর একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। হৈম বুঝিল, তাহার বাবার প্রস্তাব অপমানের সহিত অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাহার মন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

আমি আর সহিতে পারিলাম না। বাবার কাছে গিয়া বলিলাম, "হৈমকে আমি লইয়া যাইব।"

বাবা গর্জিয়া উঠিলেন, "বটে রে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বন্ধুরা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাহা বলিলাম তাহা করিলাম না কেন। স্ত্রীকে লইয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া গেলেই তো হইত। গেলাম না কেন? কেন! যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে। জান তোমরা? যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আর, আমিই তো সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রীপরিত্যাগের গুণবর্ণনা করিয়া মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতা-বিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে, সে কথা কে জানিত।

পিতায় কন্যায় আর-একবার বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত হইল। এইবারেও দুইজনেরই মুখে হাসি। কন্যা হাসিতে হাসিতেই ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "বাবা, আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব।"

বাপ হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, "ফের যদি আসি তবে সিঁধকাটি সঙ্গে করিয়াই আসিব।"

ইহার পরে হৈমর মুখে তাহার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর এক দিনের জন্যও দেখি নাই।

তাহারও পরে কী হইল সে কথা আর বলিতে পারিব না।

শুনিতেছি, মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয়তো একদিন মার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না, ইহাও সম্ভব হইতে পারে। কারণ—থাক্, আর কাজ কী।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

বোষ্টমী

আমি লিখিয়া থাকি অথচ লোকরঞ্জন আমার কলমের ধর্ম নয়, এইজন্য লোকেও আমাকে সদাসর্বদা যে রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকে তাহাতে কালীর ভাগই বেশি। আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে হয়; কপালক্রমে সেগুলি হিতকথা নয়, মনোহারী তো নহেই।

শরীরে যেখানটায় ঘা পড়িতে থাকে সে জায়গাটা যত তুচ্ছই হোক সমস্ত দেহটাকে বেদনার জোরে সেই ছাড়াইয়া যায়। যে লোক গালি খাইয়া মানুষ হয় সে আপনার স্বভাবকে যেন ঠেলিয়া একঝোঁকা হইয়া পড়ে—আপনার চারি দিককে ছাড়াইয়া আপনাকেই কেবল তাহার মনে পড়ে—সেটা আরামও নয়, কল্যাণও নয়। আপনাকে ভোলাটাই তো স্বস্তি।

আমাকে তাই ক্ষণে ক্ষণে নির্জনের খোঁজ করিতে হয়। মানুষের ঠেলা খাইতে খাইতে মনের চারি দিকে যে টোল খাইয়া যায়, বিশ্বপ্রকৃতির সেবানিপুণ হাতখানির গুণে তাহা ভরিয়া উঠে।

কলিকাতা হইতে দূরে নিভৃতে আমার একটি অজ্ঞাতবাসের আয়োজন আছে; আমার নিজ-চর্চার দৌরাত্ম্য হইতে সেইখানে অন্তর্ধান করিয়া থাকি। সেখানকার লোকেরা এখনো আমার সম্বন্ধে কোনো-একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছে নাই। তাহারা দেখিয়াছে—আমি ভোগী নই, পল্লীর রজনীকে কলিকাতার কলুষে আবিল করি না; আবার যোগীও নই, কারণ দূর হইতে আমার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ধনের লক্ষণ আছে; আমি পথিক নহি, পল্লীর রাস্তায় ঘুরি বটে কিন্তু কোথাও পৌঁছিবার দিকে আমার কোনো লক্ষ্যই নাই; আমি যে গৃহী এমন কথা বলাও শক্ত, কারণ ঘরের লোকের প্রমাণাভাব। এইজন্য পরিচিত জীবশ্রেণীর মধ্যে আমাকে কোনো-একটা প্রচলিত কোঠায় না ফেলিতে পারিয়া গ্রামের লোক আমার সম্বন্ধে চিন্তা করা একরকম ছাড়িয়া দিয়াছে, আমিও নিশ্চিন্ত আছি।

অল্পদিন হইল খবর পাইয়াছি, এই গ্রামে একজন মানুষ আছে যে আমার সম্বন্ধে কিছু-একটা মনে ভাবিয়াছে, অন্তত বোকা ভাবে নাই।

তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা হইল, তখন আষাঢ়মাসের বিকালবেলা। কান্না শেষ হইয়া গেলেও চোখের পল্লব ভিজা থাকিলে যেমন ভাবটা হয়, সকালবেলাকার বৃষ্টি-অবসানে সমস্ত লতাপাতা আকাশ ও বাতাসের মধ্যে সেই ভাবটা ছিল। আমাদের পুকুরের উঁচু পাড়িটার উপর দাঁড়াইয়া আমি একটি নধর-শ্যামল গাভীর ঘাস খাওয়া দেখিতেছিলাম। তাহার চিক্কণ দেহটির উপর রৌদ্র পড়িয়াছিল দেখিয়া ভাবিতে-ছিলাম, আকাশের আলো হইতে সভ্যতা আপনার দেহটাকে পৃথক্‌ করিয়া রাখিবার জন্য যে এত দর্জির দোকান বানাইয়াছে, ইহার মতো এমন অপব্যয় আর নাই।

এমন সময় হঠাৎ দেখি, একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার আঁচলে কতকগুলি ঠোঙার মধ্যে করবী গন্ধরাজ এবং আরও দুই-চার রকমের ফুল ছিল। তাহারই মধ্যে একটি আমার হাতে দিয়া ভক্তির সঙ্গে জোড় হাত করিয়া সে বলিল, "আমার ঠাকুরকে দিলাম।"

বলিয়া চলিয়া গেল।

আমি এমনি আশ্চর্য হইয়া গেলাম যে, তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতেই পাইলাম না।

ব্যাপারটা নিতান্তই সাদা অথচ আমার কাছে তাহা এমন করিয়া প্রকাশ হইল যে, সেই-যে গাভীটি বিকালবেলাকার ধূসর রৌদ্রে লেজ দিয়া পিঠের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে নববর্ষার রসকোমল ঘাসগুলি বড়ো বড়ো নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শান্ত আনন্দে খাইয়া বেড়াইতেছে তাহার জীবলীলাটি আমার কাছে বড়ো অপরূপ হইয়া দেখা দিল। এ কথা বলিলে লোকে হাসিবে, কিন্তু আমার মন ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল। আমি সহজ-আনন্দময় জীবনেশ্বরকে প্রণাম করিলাম। বাগানের আমগাছ হইতে পাতা-সমেত একটি কাঁচা আমের ডাল লইয়া সেই গাভীকে খাওয়াইলাম। আমার মনে হইল, আমি দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলাম।

ইহার পরবৎসর যখন সেখানে গিয়াছি তখন মাঘের শেষ। সেবার তখনো শীত ছিল। সকালের রৌদ্রটি পূবের জানলা দিয়া আমার পিঠে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে নিষেধ করি নাই। দোতলার ঘরে বসিয়া লিখিতেছিলাম, বেহারা আসিয়া খবর দিল, আনন্দী বোষ্টমী আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। লোকটা কে জানি না; অন্যমনস্ক হইয়া বলিলাম, "আচ্ছা, এইখানে নিয়ে আয়।"

বোষ্টমী পায়ের ধুলা লইয়া আমাকে প্রণাম করিল। দেখিলাম, সেই আমার পূর্বপরিচিত স্ত্রীলোকটি। সে সুন্দরী কি না সেটা লক্ষগোচর হইবার বয়স তাহার পার হইয়া গেছে। দোহারা, সাধারণ স্ত্রীলোকের চেয়ে লম্বা; একটি নিয়ত-ভক্তিতে তাহার শরীরটি নম্র, অথচ বলিষ্ঠ নিঃসংকোচ তাহার ভাব। সব চেয়ে চোখে পড়ে তাহার দুই চোখ। ভিতরকার কী-একটা শক্তিতে তাহার সেই বড়ো বড়ো চোখদুটি যেন কোন্ দূরের জিনিসকে কাছে করিয়া দেখিতেছে।

তাহার সেই দুই চোখ দিয়া আমাকে যেন ঠেলা দিয়া সে বলিল, "এ আবার কী কাণ্ড। আমাকে তোমার এই রাজসিংহাসনের তলায় আনিয়া হাজির করা কেন। তোমাকে গাছের তলায় দেখিতাম, সে যে বেশ ছিল।"

বুঝিলাম, গাছতলায় এ আমাকে অনেকদিন লক্ষ্য করিয়াছে কিন্তু আমি ইহাকে দেখি নাই। সর্দির উপক্রম হওয়াতে কয়েকদিন পথে ও বাগানে বেড়ানো বন্ধ করিয়া ছাদের উপরেই সন্ধ্যাকাশের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া থাকি; তাই কিছুদিন সে আমাকে দেখিতে পায় নাই।

একটুক্ষণ থামিয়া সে বলিল, "গৌর, আমাকে কিছু-একটা উপদেশ দাও।"

আমি মুশকিলে পড়িলাম। বলিলাম, "উপদেশ দিতে পারি না, নিতেও পারি না। চোখ মেলিয়া চুপ করিয়া যাহা পাই তাহা লইয়াই আমার কারবার। এই-যে তোমাকে দেখিতেছি, আমার দেখাও হইতেছে শোনাও হইতেছে।"

বোষ্টমী ভারি খুশি হইয়া 'গৌর গৌর' বলিয়া উঠিল। কহিল, "ভগবানের তো শুধু রসনা নয়, তিনি যে সর্বাঙ্গ দিয়া কথা কন।"

আমি বলিলাম, "চুপ করিলেই সর্বাঙ্গ দিয়া তাঁর সেই সর্বাঙ্গের কথা শোনা যায়। তাই শুনিতেই শহর ছাড়িয়া এখানে আসি।"

বোষ্টমী কহিল, "সেটা আমি বুঝিয়াছি, তাই তো তোমার কাছে আসিয়া বসিলাম।"

যাইবার সময় সে আমার পায়ের ধুলা লইতে গিয়া, দেখিলাম, আমার মোজাতে হাত ঠেকিয়া তাহার বড়ো বাধা বোধ হইল।

পরের দিন ভোরে সূর্য উঠিবার পূর্বে আমি ছাদে আসিয়া বসিয়াছি। দক্ষিণে বাগানের ঝাউগাছগুলার মাথার উপর দিয়া একেবারে দিক্‌সীমা পর্যন্ত মাঠ ধু ধু করিতেছে। পূর্বদিকে বাঁশবনে-ঘেরা গ্রামের পাশে আখের খেতের প্রান্ত দিয়া প্রতিদিন আমার সামনে সূর্য উঠে। গ্রামের রাস্তাটা গাছের ঘন ছায়ার ভিতর হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া খোলা মাঠের মাঝখান দিয়া বাঁকিয়া বহুদূরের গ্রামগুলির কাজ সারিতে চলিয়াছে।

সূর্য উঠিয়াছে কি না জানি না। একখানি শুভ্র কুয়াশার চাদর বিধবার ঘোমটার মতো গ্রামের গাছগুলির উপর টানা রহিয়াছে। দেখিতে পাইলাম বোষ্টমী সেই ভোরের ঝাপসা আলোর ভিতর দিয়া একটি সচল কুয়াশার মূর্তির মতো করতাল বাজাইয়া হরিনাম গান করিতে করিতে সেই পূব দিকের গ্রামের সমুখ দিয়া চলিয়াছে।

তন্দ্রাভাঙা চোখের পাতার মতো এক সময়ে কুয়াশাটা উঠিয়া গেল এবং ঐ-সমস্ত মাঠের ও ঘরের নানা কাজকর্মের মাঝখানে শীতের রৌদ্রটি গ্রামের ঠাকুরদাদার মতো আসিয়া বেশ করিয়া জমিয়া বসিল।

আমি তখন সম্পাদকের পেয়াদা বিদায় করিবার জন্য লিখিবার টেবিলে আসিয়া বসিয়াছি। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দের সঙ্গে একটা গানের সুর শোনা গেল। বোষ্টমী গুন্‌গুন্‌ করিতে করিতে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া কিছু দূরে মাটিতে বসিল। আমি লেখা হইতে মুখ তুলিলাম।

সে বলিল, "কাল আমি তোমার প্রসাদ পাইয়াছি।"

আমি বলিলাম, "সে কী কথা।"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যার সময় কখন তোমার খাওয়া হয় আমি সেই আশায় দরজার বাহিরে বসিয়া ছিলাম। খাওয়া হইলে চাকর যখন পাত্র লইয়া বাহিরে আসিল তাহাতে কী ছিল জানি না কিন্তু আমি খাইয়াছি।"

আমি আশ্চর্য হইলাম। আমার বিলাত যাওয়ার কথা সকলেই জানে। সেখানে কী খাইয়াছি না-খাইয়াছি তাহা অনুমান করা কঠিন নহে, কিন্তু গোবর খাই নাই। দীর্ঘকাল মাছমাংসে আমার রুচি নাই বটে কিন্তু আমার পাচকটির জাতিকুলের কথাটা প্রকাশ্য সভায় আলোচনা না করাই সংগত। আমার মুখে বিস্ময়ের লক্ষণ দেখিয়া বোষ্টমী বলিল, "যদি তোমার প্রসাদ খাইতেই না পারিব তবে তোমার কাছে আসিবার তো কোনো দরকার ছিল না।"

আমি বলিলাম, "লোকে জানিলে তোমার উপর তো তাদের ভক্তি থাকিবে না।"

সে বলিল, "আমি তো সকলকেই বলিয়া বেড়াইতেছি। শুনিয়া উহারা ভাবিল, আমার এইরকমই দশা।"

বোষ্টমী যে সংসারে ছিল, উহার কাছে তাহার খবর বিশেষ কিছু পাইলাম না। কেবল এইটুকু শুনিয়াছি, তাহার মায়ের অবস্থা বেশ ভালো এবং এখনো তিনি

বাঁচিয়া আছেন। মেয়েকে যে বহুলোক ভক্তি করিয়া থাকে সে খবর তিনি জানেন। তাঁহার ইচ্ছা, মেয়ে তাঁর কাছে গিয়া থাকে, কিন্তু আনন্দীর মন তাহাতে সায় দেয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার চলে কী করিয়া।"

উত্তরে শুনিলাম, তাহার ভক্তদের একজন তাহাকে সামান্য কিছু জমি দিয়াছে। তাহারই ফসলে সেও খায়, পাঁচজনে খায়, কিছুতে সে আর শেষ হয় না। বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "আমার তো সবই ছিল—সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছি, আবার পরের কাছে মাগিয়া সংগ্রহ করিতেছি, ইহার কী দরকার ছিল বলো তো।"

শহরে থাকিতে এ প্রশ্ন উঠিলে সহজে ছাড়িতাম না। ভিক্ষাজীবিতায় সমাজের কত অনিষ্ট তাহা বুঝাইতাম। কিন্তু, এ জায়গায় আসিলে আমার পুঁথিপড়া বিদ্যার সমস্ত ঝাঁজ একেবারে মরিয়া যায়। বোষ্টমীর কাছে কোনো তর্কই আমার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না; আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে আপনিই বলিয়া উঠিল, "না না, এই আমার ভালো। আমার মাগিয়া খাওয়া অন্নই অমৃত।"

তাহার কথার ভাবখানা আমি বুঝিলাম। প্রতিদিনই যিনি নিজে অন্ন জোগাইয়া দেন ভিক্ষার অন্নে তাঁহাকেই মনে পড়ে। আর, ঘরে মনে হয়, আমারই অন্ন আমি নিজের শক্তিতে ভোগ করিতেছি।

ইচ্ছা ছিল, তাহার স্বামীর ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু সে নিজে বলিল না, আমিও প্রশ্ন করিলাম না।

এখানকার যে পাড়ায় উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকে থাকে সে পাড়ার প্রতি বোষ্টমীর শ্রদ্ধা নাই। বলে, ঠাকুরকে উহারা কিছুই দেয় না, অথচ ঠাকুরের ভোগে উহারাই সব চেয়ে বেশি করিয়া ভাগ বসায়। গরিবরা ভক্তি করে আর উপবাস করিয়া মরে।

এ পাড়ার দুষ্কৃতির কথা অনেক শুনিয়াছি, তাই বলিলাম, "এই-সকল দুর্মতিদের মাঝখানে থাকিয়া ইহাদের মতিগতি ভালো করো, তাহা হইলেই তো ভগবানের সেবা হইবে।"

এই রকমের সব উঁচু দরের উপদেশ অনেক শুনিয়াছি এবং অন্যকে শুনাইতেও ভালোবাসি। কিন্তু, বোষ্টমীর ইহাতে তাক্ লাগিল না। আমার মুখের দিকে তাহার উজ্জ্বল চক্ষুদুটি রাখিয়া সে বলিল, "তুমি বলিতেছ, ভগবান পাপীর মধ্যেও আছেন, তাই উহাদের সঙ্গ করিলেও তাঁহারই পূজা করা হয়। এই তো?"

আমি কহিলাম, "হাঁ।"

সে বলিল, "উহারা যখন বাঁচিয়া আছে তখন তিনিও উহাদের সঙ্গে আছেন বই-কি। কিন্তু, আমার তাহাতে কী। আমার তো পূজা ওখানে চলিবে না; আমার ভগবান যে উহাদের মধ্যে নাই। তিনি যেখানে আমি সেখানেই তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াই।"

বলিয়া সে আমাকে প্রণাম করিল। তাহার কথাটা এই যে, শুধু মত লইয়া কী হইবে, সত্য যে চাই। ভগবান সর্বব্যাপী, এটা একটা কথা—কিন্তু যেখানে আমি তাঁহাকে দেখি সেখানেই তিনি আমার সত্য।

এত বড়ো বাহুল্য কথাটাও কোনো কোনো লোকের কাছে বলা আবশ্যক যে, আমাকে উপলক্ষ করিয়া বোষ্টমী যে ভক্তি করে আমি তাহা গ্রহণও করি না, ফিরাইয়াও

দিই না।

এখনকার কালের ছোঁয়াচ আমাকে লাগিয়াছে। আমি গীতা পড়িয়া থাকি এবং বিদ্বান লোকদের দ্বারস্থ হইয়া তাহাদের কাছে ধর্মতত্ত্বের অনেক সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। কেবল শুনিয়া শুনিয়াই বয়স বহিয়া যাইবার জো হইল, কোথাও তো কিছু প্রত্যক্ষ দেখিলাম না। এতদিন পরে নিজের দৃষ্টির অহংকার ত্যাগ করিয়া এই শাস্ত্রহীনা স্ত্রীলোকের দুই চক্ষুর ভিতর দিয়া সত্যকে দেখিলাম। ভক্তি করিবার ছলে শিক্ষা দিবার এ কী আশ্চর্য প্রণালী।

পরদিন সকালে বোষ্টমী আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া দেখিল, তখনো আমি লিখিতে প্রবৃত্ত। বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোমাকে আমার ঠাকুর এত মিথ্যা খাটাইতেছেন কেন। যখনি আসি দেখিতে পাই লেখা লইয়াই আছ!"

আমি বলিলাম, "যে লোকটা কোনো কর্মেরই নয় ঠাকুর তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেন না, পাছে সে মাটি হইয়া যায়। যত রকমের বাজে কাজ করিবার ভার তাহারই উপরে।"

আমি যে কত আবরণে আবৃত তাহাই দেখিয়া সে অধৈর্য হইয়া উঠে। আমার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে অনুমতি লইয়া দোতলায় চড়িতে হয়, প্রণাম করিতে আসিয়া হাতে ঠেকে মোজাজোড়া, সহজ দুটো কথা বলা এবং শোনার প্রয়োজন কিন্তু আমার মনটা কোন্ লেখার মধ্যে তলাইয়া।

হাত জোড় করিয়া সে বলিল, "গৌর, আজ ভোরে বিছানায় যেমনি উঠিয়া বসিয়াছি অমনি তোমার চরণ পাইলাম। আহা, সেই তোমার দুখানি পা, কোনো ঢাকা নাই—সে কী ঠান্ডা। কী কোমল। কতক্ষণ মাথায় ধরিয়া রাখিলাম। সে তো খুব হইল। তবে আর আমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কী। প্রভু, এ আমার মোহ নয় তো? ঠিক করিয়া বলো।"

লিখিবার টেবিলের উপর ফুলদানিতে পূর্বদিনের ফুল ছিল। মালী আসিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া নূতন ফুল সাজাইবার উদ্‌যোগ করিল।

বোষ্টমী যেন ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাস্? এ ফুলগুলি হইয়া গেল? তোমার আর দরকার নাই? তবে দাও দাও, আমাকে দাও।"

এই বলিয়া ফুলগুলি অঞ্জলিতে লইয়া, কতক্ষণ মাথা নত করিয়া, একান্ত স্নেহে এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "তুমি চাহিয়া দেখ না বলিয়াই এ ফুল তোমার কাছে মলিন হইয়া যায়। যখন দেখিবে তখন তোমার লেখাপড়া সব ঘুচিয়া যাইবে।"

এই বলিয়া সে বহু যত্নে ফুলগুলি আপন আঁচলের প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "আমার ঠাকুরকে আমি লইয়া যাই।"

কেবল ফুলদানিতে রাখিলেই যে ফুলের আদর হয় না, তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। আমার মনে হইল, ফুলগুলিকে যেন ইস্কুলের পড়া-না-পারা ছেলেদের মতো প্রতিদিন আমি বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া রাখি।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যখন ছাদে বসিয়াছি বোষ্টমী আমার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। কহিল, "আজ সকালে নাম শুনাইবার সময় তোমার প্রসাদী ফুলগুলি ঘরে ঘরে দিয়া আসিয়াছি। আমার ভক্তি দেখিয়া বেণী চক্রবর্তী হাসিয়া বলিল, 'পাগলি,

কাকে ভক্তি করিস তুই? বিশ্বের লোকে যে তাকে মন্দ বলে।' হাঁগো, সকলে নাকি তোমাকে গালি দেয়?"

কেবল এক মুহূর্তের জন্য মনটা সংকুচিত হইয়া গেল। কালীর ছিটা এত দূরেও ছড়ায়!

বোষ্টমী বলিল, "বেণী ভাবিয়াছিল, আমার ভক্তিটাকে এক ফুঁয়ে নিবাইয়া দিবে। কিন্তু, এ তো তেলের বাতি নয়, এ যে আগুন! আমার গৌর, ওরা তোমাকে গালি দেয় কেন গো।"

আমি বলিলাম, "আমার পাওনা আছে বলিয়া। আমি হয়তো একদিন লুকাইয়া উহাদের মন চুরি করিবার লোভ করিয়াছিলাম।"

বোষ্টমী কহিল, "মানুষের মনে বিষ যে কত সে তো দেখিলে। লোভ আর টিঁকিবে না।"

আমি বলিলাম, "মনে লোভ থাকিলেই মারের মুখে থাকিতে হয়। তখন নিজেকে মারিবার বিষ নিজের মনই জোগায়। তাই আমার ওঝা আমারই মনটাকে নির্বিষ করিবার জন্য এত কড়া করিয়া ঝাড়া দিতেছেন।"

বোষ্টমী কহিল, "দয়াল ঠাকুর মারিতে মারিতে তবে মারকে খেদান। শেষ পর্যন্ত যে সহিতে পারে সেই বাঁচিয়া যায়।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় অন্ধকার ছাদের উপর সন্ধ্যাতারা উঠিয়া আবার অস্ত গেল; বোষ্টমী তাহার জীবনের কথা আমাকে শুনাইল।—

আমার স্বামী বড়ো সাদা মানুষ। কোনো কোনো লোকে মনে করিত, তাঁহার বুঝিবার শক্তি কম। কিন্তু, আমি জানি, যাহারা সাদা করিয়া বুঝিতে পারে তাহারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে।

ইহাও দেখিয়াছি, তাঁহার চাষবাস জমিজমার কাজে তিনি যে ঠকিতেন তাহা নহে। বিষয়কাজ এবং ঘরের কাজ দুইই তাঁহার গোছালো ছিল। ধান-চাল-পাটের সামান্য যে একটু ব্যাবসা করিতেন কখনো তাহাতে লোকসান করেন নাই। কেননা, তাঁহার লোভ অল্প। যেটুকু তাঁহার দরকার সেটুকু তিনি হিসাব করিয়া চলিতেন; তার চেয়ে বেশি যা তাহা তিনি বুঝিতেনও না, তাহাতে হাতও দিতেন না।

আমার বিবাহের পূর্বেই আমার শ্বশুর মারা গিয়াছিলেন এবং আমার বিবাহের অল্পদিন পরেই শাশুড়ির মৃত্যু হয়। সংসারে আমাদের মাথার উপরে কেহই ছিল না।

আমার স্বামী মাথার উপরে একজন উপরওয়ালাকে না বসাইয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন-কি, বলিতে লজ্জা হয়, আমাকে যেন তিনি ভক্তি করিতেন। তবু আমার বিশ্বাস, তিনি আমার চেয়ে বুঝিতেন বেশি, আমি তাঁহার চেয়ে বলিতাম বেশি।

তিনি সকলের চেয়ে ভক্তি করিতেন তাঁহার গুরুঠাকুরকে। শুধু ভক্তি নয়, সে ভালোবাসা—এমন ভালোবাসা দেখা যায় না।

গুরুঠাকুর তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু কম। কী সুন্দর রূপ তাঁর।

বলিতে বলিতে বোষ্টমী ক্ষণকাল থামিয়া তাহার সেই দূরবিহারী চক্ষুদুটিকে বহু দূরে পাঠাইয়া দিল এবং গুন্‌গুন্‌ করিয়া গাহিল—

অরুণকিরণখানি তরুণ অমৃতে ছানি
কোন্‌ বিধি নিরমিল দেহা।

এই গুরুঠাকুরের সঙ্গে বালককাল হইতে তিনি খেলা করিয়াছেন; তখন হইতেই তাঁহাকে আপন মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

তখন আমার স্বামীকে ঠাকুর বোকা বলিয়াই জানিতেন। সেইজন্য তাঁহার উপর বিস্তর উপদ্রব করিয়াছেন। অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিয়া পরিহাস করিয়া তাঁহাকে যে কত নাকাল করিয়াছেন তাহার সীমা নাই।

বিবাহ করিয়া এ সংসারে যখন আসিয়াছি তখন গুরুঠাকুরকে দেখি নাই। তিনি তখন কাশীতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন। আমার স্বামীই তাঁহাকে সেখানকার খরচ জোগাইতেন।

গুরুঠাকুর যখন দেশে ফিরিলেন তখন আমার বয়স বোধ করি আঠারো হইবে।

পনেরো বছর বয়সে আমার একটি ছেলে হইয়াছিল। বয়স কাঁচা ছিল বলিয়াই আমার সেই ছেলেটিকে আমি যত্ন করিতে শিখি নাই, পাড়ার সই-সাঙাতিদের সঙ্গে মিলিবার জন্যই তখন আমার মন ছুটিত। ছেলের জন্য ঘরে বাঁধা থাকিতে হয় বলিয়া এক-একসময় তাহার উপরে আমার রাগ হইত।

হায় রে, ছেলে যখন আসিয়া পৌঁছিয়াছে মা তখনো পিছাইয়া পড়িয়া আছে, এমন বিপদ আর কী হইতে পারে। আমার গোপাল আসিয়া দেখিল তখনো তাহার জন্য ননী তৈরি নাই, তাই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেছে—আমি আজও মাঠে ঘাটে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।

ছেলেটি ছিল বাপের নয়নের মণি। আমি তাহাকে যত্ন করিতে শিখি নাই বলিয়া তাহার বাপ কষ্ট পাইতেন। কিন্তু, তাঁহার হৃদয় যে ছিল বোবা, আজ পর্যন্ত তাঁহার দুঃখের কথা কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন নাই।

মেয়েমানুষের মতো তিনি ছেলের যত্ন করিতেন। রাত্রে ছেলে কাঁদিলে আমার অল্পবয়সের গভীর ঘুম তিনি ভাঙাইতে চাহিতেন না। নিজে রাত্রে উঠিয়া দুধ গরম করিয়া খাওয়াইয়া কতদিন খোকাকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারি নাই। তাঁহার সকল কাজই এমনি নিঃশব্দে। পূজাপার্বণে জমিদারদের বাড়িতে যখন যাত্রা বা কথা হইত তিনি বলিতেন, "আমি রাত জাগিতে পারি না, তুমি যাও, আমি এখানেই থাকি।" তিনি ছেলেটিকে লইয়া না থাকিলে আমার যাওয়া হইবে না, এইজন্য তাঁহার ছুতা।

আশ্চর্য এই, তবু ছেলে আমাকেই সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসিত। সে যেন বুঝিত, সুযোগ পাইলেই আমি তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইব, তাই সে যখন আমার কাছে থাকিত তখনও ভয়ে ভয়ে থাকিত। সে আমাকে অল্প পাইয়াছিল বলিয়াই আমাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কিছুতেই মিটিতে চাহিত না।

আমি যখন নাহিবার জন্য ঘাটে যাইতাম তাহাকে সঙ্গে লইবার জন্য সে আমাকে রোজ বিরক্ত করিত। ঘাটে সঙ্গিনীদের সঙ্গে আমার মিলনের জায়গা, সেখানে ছেলেকে

লইয়া তাহার খবরদারি করিতে আমার ভালো লাগিত না। সেজন্য পারতপক্ষে তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিতাম না।

সেদিন শ্রাবণ মাস। থাকে থাকে ঘন কালো মেঘে দুই-প্রহর বেলাটাকে একেবারে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া রাখিয়াছে। স্নানে যাইবার সময় খোকা কান্না জুড়িয়া দিল। নিস্তারিণী আমাদের হেঁসেলের কাজ করিত, তাহাকে বলিয়া গেলাম, "বাছা, ছেলেকে দেখিয়ো, আমি ঘাটে একটা ডুব দিয়া আসি গে।"

ঘাটে ঠিক সেই সময়টিতে আর-কেহ ছিল না। সঙ্গিনীদের আসিবার অপেক্ষায় আমি সাঁতার দিতে লাগিলাম। দিঘিটা প্রাচীন কালের; কোন্ রানী কবে খনন করাইয়াছিলেন তাই ইহার নাম রানীসাগর। সাঁতার দিয়া এই দিঘি এপার-ওপার করা মেয়েদের মধ্যে কেবল আমিই পারিতাম। বর্ষায় তখন কূলে কূলে জল। দিঘি যখন প্রায় অর্ধেকটা পার হইয়া গেছি এমন সময় পিছন হইতে ডাক শুনিতে পাইলাম, "মা!" ফিরিয়া দেখি, খোকা ঘাটের সিঁড়িতে নামিতে নামিতে আমাকে ডাকিতেছে। চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আর আসিস নে, আমি যাচ্ছি।" নিষেধ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে সে আরও নামিতে লাগিল। ভয়ে আমার হাতে পায়ে যেন খিল ধরিয়া আসিল, পার হইতে আর পারিই না। চোখ বুজিলাম। পাছে কী দেখিতে হয়। এমন সময় পিছল ঘাটে সেই দিঘির জলে খোকার হাসি চিরদিনের মতো থামিয়া গেল। পার হইয়া আসিয়া সেই মায়ের কোলের কাঙাল ছেলেকে জলের তলা হইতে তুলিয়া কোলে লইলাম, কিন্তু আর সে 'মা' বলিয়া ডাকিল না।

আমার গোপালকে আমি এতদিন কাঁদাইয়াছি, সেই-সমস্ত অনাদর আজ আমার উপর ফিরিয়া আসিয়া আমাকে মারিতে লাগিল। বাঁচিয়া থাকিতে তাহাকে বরাবর যে ফেলিয়া চলিয়া গেছি, আজ তাই সে দিনরাত আমার মনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল।

আমার স্বামীর বুকে যে কতটা বাজিল সে কেবল তাঁর অন্তর্যামীই জানেন। আমাকে যদি গালি দিতেন তো ভালো হইত; কিন্তু তিনি তো কেবল সহিতেই জানেন, কহিতে জানেন না।

এমনি করিয়া আমি যখন একরকম পাগল হইয়া আছি, এমন সময় গুরুঠাকুর দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

যখন ছেলেবয়সে আমার স্বামী তাঁহার সঙ্গে একত্রে খেলাধুলা করিয়াছেন তখন সে এক ভাব ছিল। এখন আবার দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর যখন তাঁর ছেলেবয়সের বন্ধু বিদ্যালাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার 'পরে আমার স্বামীর ভক্তি একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কে বলিবে খেলার সাথি, ইঁহার সামনে তিনি যেন একেবারে কথা কহিতে পারিতেন না।

আমার স্বামী আমাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাঁহার গুরুকে অনুরোধ করিলেন। গুরু আমাকে শাস্ত্র শুনাইতে লাগিলেন। শাস্ত্রের কথায় আমার বিশেষ ফল হইয়াছিল বলিয়া মনে তো হয় না। আমার কাছে সে-সব কথার যা-কিছু মূল্য সে তাঁহারই মুখের কথা বলিয়া। মানুষের কণ্ঠ দিয়াই ভগবান তাঁহার অমৃত মানুষকে পান করাইয়া থাকেন; অমন সুধাপাত্র তো তাঁর হাতে আর নাই। আবার, ঐ মানুষের কণ্ঠ দিয়াই তো সুধা তিনিও পান করেন।

গুরুর প্রতি আমার স্বামীর অজস্র ভক্তি আমাদের সংসারকে সর্বত্র মৌচাকের ভিতরকার মধুর মতো ভরিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের আহারবিহার ধনজন সমস্তই এই ভক্তিতে ঠাসা ছিল, কোথাও ফাঁক ছিল না। আমি সেই রসে আমার সমস্ত মন লইয়া ডুবিয়া তবে সান্ত্বনা পাইয়াছি। তাই দেবতাকে আমার গুরুর রূপেই দেখিতে পাইলাম।

তিনি আসিয়া আহার করিবেন এবং তার পর তাঁর প্রসাদ পাইব, প্রতিদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই এই কথাটি মনে পড়িত, আর সেই আয়োজনে লাগিয়া যাইতাম। তাঁহার জন্য তরকারি কুটিতাম, আমার আঙুলের মধ্যে আনন্দধ্বনি বাজিত। ব্রাহ্মণ নই, তাঁহাকে নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইতে পারিতাম না, তাই আমার হৃদয়ের সব ক্ষুধাটা মিটিত না।

তিনি যে জ্ঞানের সমুদ্র, সে দিকে তো তাঁর কোনো অভাব নাই। আমি সামান্য রমণী, আমি তাঁহাকে কেবল একটু খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া খুশি করিতে পারি, তাহাতেও এত দিকে এত ফাঁক ছিল।

আমার গুরুসেবা দেখিয়া আমার স্বামীর মন খুশি হইতে থাকিত এবং আমার উপরে তাঁহার ভক্তি আরও বাড়িয়া যাইত। তিনি যখন দেখিতেন আমার কাছে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার জন্য গুরুর বিশেষ উৎসাহ, তখন তিনি ভাবিতেন, গুরুর কাছে বুদ্ধিহীনতার জন্য তিনি বরাবর অশ্রদ্ধা পাইয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী এবার বুদ্ধির জোরে গুরুকে খুশি করিতে পারিল এই তাঁহার সৌভাগ্য।

এমন করিয়া চার-পাঁচ বছর কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা চোখে দেখিতে পাইলাম না।

সমস্ত জীবনই এমনি করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু, গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্যামীর কাছে ধরা পড়িল। তার পর এক দিনে একটি মুহূর্তে সমস্ত উলটপালট হইয়া গেল।

সেদিন ফাল্গুনের সকালবেলায় ঘাটে যাইবার ছায়াপথে স্নান সারিয়া ভিজা কাপড়ে ঘরে ফিরিতেছিলাম। পথের একটি বাঁকে আমতলায় গুরুঠাকুরের সঙ্গে দেখা। তিনি কাঁধে একখানি গামছা লইয়া কোন্‌-একটা সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে স্নানে যাইতেছেন।

ভিজা কাপড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে লজ্জায় একটু পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি জড়োসড়ো হইয়া মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মুখের 'পরে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "তোমার দেহখানি সুন্দর।"

ডালে ডালে রাজ্যের পাখি ডাকিতেছিল, পথের ধারে ধারে ঝোপে-ঝাপে ভাঁটি ফুল ফুটিয়াছে, আমের ডালে বোল ধরিতেছে। মনে হইল সমস্ত আকাশ-পাতাল পাগল হইয়া আলুথালু হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া বাড়ি গেলাম কিছু জ্ঞান নাই। একেবারে সেই ভিজা কাপড়েই ঠাকুরঘরে ঢুকিলাম, চোখে যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না— সেই ঘাটের পথের ছায়ার উপরকার আলোর চুম্‌কিগুলি আমার চোখের উপর কেবলই নাচিতে লাগিল।

সেদিন গুরু আহার করিতে আসিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "আন্দী নাই কেন।"

আমার স্বামী আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

ওগো, আমার সে পৃথিবী আর নাই, আমি সে সূর্যের আলো আর খুঁজিয়া পাইলাম না। ঠাকুরঘরে আমার ঠাকুরকে ডাকি, সে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে।

দিন কোথায় কেমন করিয়া কাটিল ঠিক জানি না। রাত্রে স্বামীর সঙ্গে দেখা হইবে। তখন যে সমস্ত নীরব এবং অন্ধকার। তখনি আমার স্বামীর মন যেন তারার মতো ফুটিয়া উঠে। সেই আঁধারে এক-একদিন তাঁহার মুখে একটা-আধটা কথা শুনিয়া হঠাৎ বুঝিতে পারি, এই সাদা মানুষটি যাহা বোঝেন তাহা কতই সহজে বুঝিতে পারেন।

সংসারের কাজ সারিয়া আসিতে আমার দেরি হয়। তিনি আমার জন্য বিছানার বাহিরে অপেক্ষা করেন। প্রায়ই তখন আমাদের গুরুর কথা কিছু-না-কিছু হয়।

অনেক রাত করিলাম। তখন তিনপ্রহর হইবে, ঘরে আসিয়া দেখি, আমার স্বামী তখনো খাটে শোন নাই, নীচে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আমি অতি সাবধানে শব্দ না করিয়া তাঁহার পায়ের তলায় শুইয়া পড়িলাম। ঘুমের ঘোরে একবার তিনি পা ছুঁড়িলেন, আমার বুকের উপর আসিয়া লাগিল। সেইটেই আমি তাঁর শেষ দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

পরদিন ভোরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙিল আমি তখন উঠিয়া বসিয়া আছি। জানলার বাহিরে কাঁঠালগাছটার মাথার উপর দিয়া আঁধারের এক ধারে অল্প একটু রঙ ধরিয়াছে; তখনো কাক ডাকে নাই।

আমি স্বামীর পায়ের কাছে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন এবং আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "আর আমি সংসার করিব না।"

স্বামী বোধ করি ভাবিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না। আমি বলিলাম, "আমার মাথার দিব্য, তুমি অন্য স্ত্রী বিবাহ করো। আমি বিদায় লইলাম।"

স্বামী কহিলেন, "তুমি এ কী বলিতেছ। তোমাকে সংসার ছাড়িতে কে বলিল।"

আমি বলিলাম, "গুরুঠাকুর।"

স্বামী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, "গুরুঠাকুর! এমন কথা তিনি কখন বলিলেন।"

আমি বলিলাম, "আজ সকালে যখন স্নান করিয়া ফিরিতেছিলাম তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তখনি বলিলেন।"

স্বামীর কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন আদেশ কেন করিলেন।"

আমি বলিলাম, "জানি না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো, পারেন তো তিনিই বুঝাইয়া দিবেন।"

স্বামী বলিলেন, "সংসারে থাকিয়াও তো সংসার ত্যাগ করা যায়, আমি সেই কথা গুরুকে বুঝাইয়া বলিব।"

আমি বলিলাম, "হয়তো গুরু বুঝিতে পারেন, কিন্তু আমার মন বুঝিবে না। আমার সংসার করা আজ হইতে ঘুচিল।"

স্বামী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আকাশ যখন ফরসা হইল তিনি বলিলেন, "চলো-না, দুজনে একবার তাঁর কাছেই যাই।"

আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম, "তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হইবে না।"

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি মুখ নামাইলাম। তিনি আর কোনো কথা বলিলেন না।

আমি জানি, আমার মনটা তিনি এক রকম করিয়া দেখিয়া লইলেন।

পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সব চেয়ে ভালোবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।

এই বলিয়া সে গড় করিয়া প্রণাম করিল।

আষাঢ় ১৩২১

স্ত্রীর পত্র

শ্রীচরণকমলেষু

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখি নি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি— মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি, চিঠি লেখবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায় নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সম্বন্ধ কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই, সে তোমার দেহ-মনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে। তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জানত না, সেই শিশুবয়সে আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠলুম। পাড়ার সব মেয়েরাই বলতে লাগল, "মৃণাল মেয়ে কি না, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত।" চুরিবিদ্যাতে যম পাকা, দামি জিনিসের 'পরেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে বসেছি।

যেদিন তোমাদের দূরসম্পর্কের মামা তোমার বন্ধু নীরদকে নিয়ে কনে দেখতে এলেন তখন আমার বয়স বারো। দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলায় শেয়াল ডাকে। স্টেশন থেকে সাত ক্রোশ শ্যাকরা গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পালকি করে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছনো যায়। সেদিন তোমাদের কী হয়রানি। তার উপরে আমাদের বাঙাল দেশের রান্না— সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেন নি।

তোমাদের বড়োবউয়ের রূপের অভাব মেজোবউকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট করে আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন। বাংলাদেশে পিলে যকৃৎ অম্লশূল এবং কনের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না; তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বুক দুর্ দুর্ করতে লাগল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন। শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। মেয়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু সেই রূপের গুমর তো মেয়ের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে দামই দেবে সেই তার দাম। তাই তো হাজার রূপে গুণেও মেয়েমানুষের সংকোচ কিছুতে ঘোচে না।

সমস্ত বাড়ির, এমন-কি, সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল— আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিল না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজতে লাগল— তোমাদের বাড়িতে এসে উঠলুম। আমার খুঁৎগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন, মোটের উপরে আমি সুন্দরী বটে। সে কথা শুনে আমার বড়ো জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু, আমার রূপের দরকার কী ছিল তাই ভাবি। রূপ-জিনিসটাকে যদি কোনো সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন তা হলে ওর আদর থাকত; কিন্তু, ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে সে কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নি। কিন্তু, আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিঁকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্‌বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু, কী করব বলো। তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে। তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা; অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।

আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজোবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি; আমি যে কবি সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সবচেয়ে যেটা আমার মনে জাগছে সে তোমাদের গোয়ালঘর। অন্দরমহলের সিঁড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোরু থাকে, সামনের উঠোনটুকু ছাড়া তাদের আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে তাদের জাবনা দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ; উপবাসী গোরুগুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবলা করে দিত। আমার প্রাণ কাঁদত। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে— তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম সেদিন সেই দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত শহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মতো আমার চোখে ঠেকল। যতদিন নতুন বউ ছিলুম নিজে না খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়াতুম; যখন বড়ো হলুম তখন গোরুর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমার গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ

প্রকাশ করতে লাগলেন।

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকত তা হলে সেই আমার জীবনে যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু সত্য, সমস্ত এনে দিত; তখন মেজোবউ থেকে একেবারে মা হয়ে বসতুম। মা যে এক সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্ব-সংসারের। মা হবার দুঃখটুকু পেলুম, কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না।

মনে আছে, ইংরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছে। ঘরে সাজসজ্জা-আসবাবের অভাব নেই। আর অন্দরটা যেন পশমের কাজের উলটো পিঠ; সে দিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সে দিকে আলো মিট্‌মিট্ করে জ্বলে; হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে; উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না; দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু, ডাক্তার একটা ভুল করেছিল; সে ভেবেছিল, এটা বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়। ঠিক উলটো; অনাদর-জিনিসটাই ছাইয়ের মতো, সে ছাই আগুনকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অন্যায্য বলে মনে হয় না। সেইজন্যে তার বেদনা নেই। তাই তো মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি, মেয়েমানুষকে দুঃখ পেতেই হবে এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয় তা হলে যত দূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো; আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।

যেমন করেই রাখ, দুঃখ যে আছে এ কথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসে নি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো, মনে ভয়ই হল না। জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদরে যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তা হলে আলগা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়সুদ্ধ আমি তেমনি করে উঠে আসতুম। বাঙালির মেয়ে তো কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু, এমন মরায় বাহাদুরিটা কী। মরতে লজ্জা হয়, আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।

আমার মেয়েটি তো সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম এবং গোরুবাছুর নিয়ে পড়লুম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত কেটে যেত; আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু, বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথ গাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালে সেইটুকু থেকে ইঁটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল; তার পর থেকে [illegible] শুরু হল।

বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড়ো জায়ের বোন বিন্দু তার খুড়তুতো [illegible] অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে, তোমরা সেদিন ভাবলে, এ আবার কোথাকার আপদ। আমার পোড়া স্বভাব, কী করব

বলো—দেখলুম, তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ, সেইজন্যেই এই নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একেবারে কোমর বেঁধে দাঁড়ালো। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া—সে কত বড়ো অপমান। দায়ে প'ড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল তাকে কি এক পাশে ঠেলে রাখা যায়।

তার পরে দেখলুম আমার বড়ো জায়ের দশা। তিনি নিতান্ত দরদে প'ড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন। কিন্তু, যখন দেখলেন স্বামীর অনিচ্ছা তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন, যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই, যেন একে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।

তাঁর এই সংকট দেখে আমার মন আরও ব্যথিত হয়ে উঠল। দেখলুম, বড়ো জা সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়াপরার এমনি মোটা রকমের ব্যবস্থা করলেন এবং বাড়ির সর্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমনভাবে নিযুক্ত করলেন যে আমার কেবল দুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর, অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সস্তা।

আমাদের বড়ো জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিল না, রূপও না, টাকাও না। আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে তো সমস্তই জান। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে যত দূর সম্ভব সংকুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেন।

কিন্তু, তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড়ো মুশকিল হয়েছে। আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারি নে। আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর-কারও খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয়—তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছ।

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুম। দিদি বললেন, "মেজোবউ গরিবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বসলেন।" আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম, এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজে যে স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হালকা হল। আমার বড়ো জা বিন্দুর বয়স থেকে দু-চারটে অঙ্ক বাদ দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু, তার বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিল না, এ কথা লুকিয়ে বললে, অন্যায় হত না। তুমি তো জান, সে দেখতে এতই মন্দ ছিল যে, পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেজেটার জন্যই লোকে উদ্‌বিগ্ন হত। কাজেই পিতা-[illegible] অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিয়ে করবার মতো মনের [illegible]রই বা কজন লোকের ছিল।

বিন্দু বড়ো ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এল। যেন আমার গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগলে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মাবার কোনো শর্ত ছিল না; তাই সে কেবলই পাশ কাটিয়ে, চোখ এড়িয়ে চলত। তার বাপের বাড়িতে তার খুড়তুতো

ভাইরা তাকে এমন একটি কোণও ছেড়ে দিতে চায় নি যে কোণে একটা অনাবশ্যক জিনিস পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জনা ঘরের আশে-পাশে অনায়াসে স্থান পায়, কেননা মানুষ তাকে ভুলে যায়; কিন্তু অনাবশ্যক মেয়েমানুষ যে একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শক্ত, সেইজন্য আঁস্তাকুড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিন্দুর খুড়তুতো ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জো নেই। কিন্তু, তারা বেশ আছে।

তাই, বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আনলুম তার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। তার ভয় দেখে আমার বড়ো দুঃখ হল। আমার ঘরে যে তার একটুখানি জায়গা আছে সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিলুম।

কিন্তু, আমার ঘর শুধু তো আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হল না। দু-চারদিন আমার কাছে থাকতেই তার গায়ে লাল-লাল কী উঠল। হয়তো সে ঘামাচি, নয় তো আর-কিছু হবে; তোমরা বললে বসন্ত। কেননা, ও যে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাক্তার এসে বললে, আর দুই-একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু, সেই দুই-একদিনের সবুর সইবে কে। বিন্দু তো তার ব্যামোর লজ্জাতেই মরবার জো হল। আমি বললুম, বসন্ত হয় তো হোক্, আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাকব, আর-কাউকে কিছু করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্তি ধরেছ, এমন-কি বিন্দুর দিদিও যখন অত্যন্ত বিরক্তির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাঁসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করছেন, এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলে। বললে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছে। কেননা, ও যে বিন্দু।

অনাদরে মানুষ হবার একটা মস্ত গুণ, শরীরটাকে তাতে একেবারে অজর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চায় না; মরার সদর রাস্তাগুলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল; কিছুই হল না। কিন্তু, এটা বেশ বোঝা গেল; পৃথিবীর সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন। আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি বিষম।

আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙল তখন ওকে আর-এক গেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালোবাসতে শুরু করলে যে আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালোবাসার এরকম মূর্তি সংসারে তো কোনোদিন দেখি নি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে-পুরুষের মধ্যে। আমার যে রূপ ছিল সে কথা আমার মনে করবার কোনো কারণ বহুকাল ঘটে নি—এত দিন পরে সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বলত, "দিদি, তোমার এই মুখখানি আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় নি।" যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দুই হাত দিয়ে নাড়তে-চাড়তে তার ভারি ভালো লাগত। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের তো দরকার ছিল না। কিন্তু, বিন্দু আমাকে অস্থির করে রোজই কিছু-না-কিছু সাজ করাত। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠল।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তর দিকের পাঁচিলের

গায়ে নর্দমার ধারে কোনো গতিকে একটা গাবগাছ জন্মেছে। যেদিন দেখতুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠেছে, সেইদিন জানতুম, ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে। আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি বুঝলুম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে— সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।

বিন্দুর ভালোবাসার দুঃসহ বেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। এক-একবার তার উপর রাগ হত সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু তার এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখি নি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।

এ দিকে, বিন্দুর মতো মেয়েকে আমি যে এতটা আদরযত্ন করছি এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে খুঁৎখুঁৎ-খিট্‌খিটের অন্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি গেল সেদিন, সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনো রকমের হাত ছিল এ কথার আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হল না। যখন স্বদেশী হাঙ্গামায় লোকের বাড়ি-তল্লাসি হতে লাগল তখন তোমরা অনায়াসে সন্দেহ করে বসলে যে, বিন্দু পুলিসের পোষা মেয়ে-চর। তার আর-কোনো প্রমাণ ছিল না; কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি করত— তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাশ করলে, ও মেয়েও একেবারে সংকোচে যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠত। এই-সকল কারণেই ওর জন্যে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখলুম। সেটা তোমাদের ভালো লাগে নি। বিন্দুকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলে যে, আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচ-সিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর, মতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুশি হও নি। আমাকে খুশি না করলেও চলে আর তোমাদের খুশি না করলেই নয়, এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্যন্ত আমার ঘটে এল না।

এ দিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রত হয়ে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য হই, তোমরা জোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দাও নি। আমি বেশ বুঝি, তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় কর। বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ না।

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় করতে না পেরে তোমরা প্রজাপতি-দেবতার শরণাপন্ন হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড়ো জা বললেন, "বাঁচলুম। মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা করলেন।"

বর কেমন তা জানি নে; তোমাদের কাছে শুনলুম, সকল বিষয়েই ভালো। বিন্দু

আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল; বললে, "দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন।"

আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, "বিন্দু, তুই ভয় করিস নে— শুনেছি তোর বর ভালো।"

বিন্দু বললে, "বর যদি ভালো হয়, আমার কী আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে।"

বরপক্ষেরা বিন্দুকে তো দেখতে আসবার নামও করলে না। বড়দিদি তাতে বড়ো নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু, দিনরাত্রে বিন্দুর কান্না আর থামতে চায় না। সে তার কী কষ্ট, সে আমি জানি। বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি, কিন্তু ওর বিবাহ বন্ধ হোক এ কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বলব। আমি যদি মারা যাই তো ওর কী দশা হবে।

একে তো মেয়ে, তাতে কালো মেয়ে; কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে।

বিন্দু বললে, "দিদি, বিয়ের আর পাঁচ দিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কি।"

আমি তাকে খুব ধমকে দিলুম; কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি কোনো সহজভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তা হলে আমি আরাম বোধ করতুম।

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তার দিদিকে গিয়ে বললে, "দিদি, আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বলবে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।"

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু, শুধু হৃদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছে। তিনি বললেন, "জানিস তো বিন্দি, পতিই হচ্ছে স্ত্রীলোকের গতি মুক্তি সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না।"

আসল কথা হচ্ছে, কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই— বিন্দুকে বিবাহ করতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হোক।

আমি চেয়েছিলুম, বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু, তোমরা ব'লে বসলে, বরের বাড়িতেই হওয়া চাই— সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি বুঝলুম, বিন্দুর বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরচ করতে হয় তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চুপ করে যেতে হল। কিন্তু, একটি কথা তোমরা কেউ জান না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাই নি, কেননা তা হলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন— আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেন নি। দোহাই ধর্মের, সেজন্যে তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।

যাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, "দিদি, আমাকে তোমরা তা হলে নিতান্তই ত্যাগ করলে?"

আমি বললুম, "না বিন্দি, তোর যেমন দশাই হোক্-না কেন, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না।"

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিল তাকে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলায় কয়লা রাখবার ঘরের এক পাশে বাস করতে দিয়েছিলুম। সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইয়ে আসতুম; তোমার চাকরদের প্রতি দুই-একদিন নির্ভর করে দেখেছি, তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি, বিন্দু এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

বিন্দুর স্বামী পাগল।

"সত্যি বলছিস, বিন্দি?"

"এত বড়ো মিথ্যা কথা তোমার কাছে বলতে পারি, দিদি? তিনি পাগল। শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না—কিন্তু, তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মতো ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্বেই কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।"

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়লুম। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ দয়া করে না। বলে, 'ও তো মেয়েমানুষ বই তো নয়। ছেলে হোক-না পাগল, সে তো পুরুষ বটে।'

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু এক-একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিল, কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল। বিন্দু দুপুরবেলায় পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী থালাসুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে, বিন্দু স্বয়ং রানী রাসমণি; বেহারাটা নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রানীকে তার নিজের থালায় ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দু তো ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শুতে বললে, বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরও ভয়ানক। বিন্দুকে ঘরে ঢুকতে হল। স্বামী সে রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু, ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বললুম, "এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দু, তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক্, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।"

তোমরা বললে, "বিন্দু মিথ্যা কথা বলছে।"

আমি বললুম, "ও কখনো মিথ্যা বলে নি।"

তোমরা বললে, "কেমন করে জানলে।"

আমি বললুম, "আমি নিশ্চয় জানি।"

তোমরা ভয় দেখালে, "বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিস-কেস করলে মুশকিলে পড়তে হবে।"

আমি বললুম, "ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে এ কথা কি আদালত শুনবে না।"

তোমরা বললে, "তবে কি এই নিয়ে আদালত করতে হবে নাকি। কেন, আমাদের দায় কিসের।"

আমি বললুম, "আমি নিজের গয়না বেচে যা করতে পারি করব।"

তোমরা বললে, "উকিলবাড়ি ছুটবে নাকি।"

এ কথার জবাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কী করব।

ও দিকে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ি থেকে ওর ভাসুর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বলছে, সে থানায় খবর দেবে।

আমার যে কী জোর আছে জানি নে—কিন্তু, কসাইয়ের হাত থেকে যে গোরু প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার অশ্রয় নিয়েছে তাকে পুলিসের তাড়ায় আবার সেই কসাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে, এ কথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্ধা করে বললুম, "তা, দিক্ থানায় খবর।"

এই ব'লে মনে করলুম, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি বিন্দু নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদপ্রতিবাদ যখন চলছিল, তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাসুরের কাছে ধরা দিয়েছে। বুঝেছে, এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেলবে।

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দুঃখ আরও বাড়ালে। তার শাশুড়ির তর্ক এই যে, তার ছেলে তো ওকে খেয়ে ফেলছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয়। তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড়ো জা বললেন, "ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কী করব। তা পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটে!"

কুষ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে, সতীসাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল। জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচ বোধ হয় নি; সেইজন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাথা হেঁট হয় নি। বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেল, কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিল না। আমি তো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন। তোমাদের এই-সব ধর্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না।

আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আসবে না। কিন্তু, আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিলুম যে তাকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোটো ভাই শরৎ কলকাতায় কলেজে পড়ছিল। তোমরা জানই তো যত রকমের ভলান্টিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইঁদুর মারা, দামোদরের বন্যায়

ছোটো, এতেই তার এত উৎসাহ যে উপরি উপরি দুবার সে এফ. এ. পরীক্ষায় ফেল করেও কিছুমাত্র দমে যায় নি। তাকে আমি ডেকে বললুম, "বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে, শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না, লিখলেও আমি পাব না।"

এরকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম, বিন্দুকে ডাকাতি করে আনতে কিম্বা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তা হলে সে বেশি খুশি হত।

শরতের সঙ্গে আলোচনা করছি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বললে, "আবার কী হাঙ্গামা বাধিয়েছ।"

আমি বললুম, "সেই যা সব-গোড়ায় বাধিয়েছিলুম, তোমাদের ঘরে এসেছিলুম—কিন্তু, সে তো তোমাদেরই কীর্তি।"

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, "বিন্দুকে আবার এনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ?"

আমি বললুম, "বিন্দু যদি আসত তা হলে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে রাখতুম। কিন্তু সে আসবে না, তোমাদের ভয় নেই।"

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরও বেড়ে উঠল। আমি জানতুম, শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভয় ছিল, ওর 'পরে পুলিসের দৃষ্টি আছে—কোন্ দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মামলায় পড়বে তখন তোমাদের সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না।

তোমার কাছে শুনলুম বিন্দু আবার পালিয়েছে, তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাসুর খোঁজ করতে এসেছে। শুনে আমার বুকের মধ্যে শেল বিঁধল। হতভাগিনীর যে কী অসহ্য কষ্ট তা বুঝলুম, অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেই।

শরৎ খবর নিতে ছুটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বললে, "বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু তারা তুমুল রাগ করে তখনই আবার তাকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। এর জন্যে তাদের খেসারত এবং গাড়িভাড়া দণ্ড যা ঘটেছে তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরে নি।"

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বললুম, আমিও যাব।

আমার হঠাৎ এমন ধর্মে মন হয়েছে দেখে তোমরা এত খুশি হয়ে উঠলে যে, কিছুমাত্র আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোন্দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

বুধবারে আমার যাবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হল। আমি শরৎকে ডেকে বললুম, "যেমন করে হোক, বিন্দুকে বুধবারে পুরী যাবার গাড়িতে তোকে তুলে দিতে হবে।"

শরতের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল; সে বললে, "ভয় নেই দিদি, আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্যন্ত চলে যাব—ফাঁকি দিয়ে জগন্নাথ দেখা হয়ে যাবে।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল। তার মুখ দেখেই আমার বুকে দমে গেল। আমি বললুম, "কী শরৎ? সুবিধা হল না বুঝি?"

সে বললে, "না।"

আমি বললুম, "রাজি করাতে পারলি নে?"

সে বললে, "আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির যে ভাইপোটার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলুম তার কাছে খবর পেলুম, তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল। কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট করেছে।"

যাক্, শান্তি হল।

দেশসুদ্ধ লোক চটে উঠল। বলতে লাগল, মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাশান হয়েছে।

তোমরা বললে, এ-সমস্ত নাটক করা! তা হবে। কিন্তু, নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন আর বাঙালি বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দিটার এমনি পোড়া কপাল বটে! যতদিন বেঁচে ছিল রূপে গুণে কোনো যশ পায় নি—মরবার বেলাও যে একটু ভেবে চিন্তে এমন একটা নতুন ধরনে মরবে যাতে দেশের পুরুষরা খুশি হয়ে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না! মরেও লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু, সে কান্নার মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। যাই হোক্-না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে। মরেছে বই তো না; বেঁচে থাকলে কী না হতে পারত।

আমি তীর্থে এসেছি। বিন্দুর আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হত তা হলেও হয়তো মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধ্বী বড়ো জায়ের মতো পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাই নে—আমার এ চিঠি সেজন্যে নয়।

কিন্তু, আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ-নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তার পরে এও দেখেছি, ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক্-না কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়ো। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্—সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম, জগতের মধ্যে যা-কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন। এই গলির মধ্যকার চারি-দিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্‌বুদটা এমন ভয়ংকর বাধা কেন। তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে ক'রে যেমন করেই ডাক দিক-না কেন, এক মুহূর্তের জন্যে কেন আমি এই অন্দরমহলটার এইটুকু মাত্র চৌকাঠ পেরতে পারি নে। তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইঁটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা; কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি, এর সমস্ত বাঁধা মার—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশবন্ধনেরই হবে জিত—আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু, মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল—কোথায় রে রাজমিস্ত্রির গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া। কোন্ দুঃখে কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে। ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে! ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোর! তোর মেজোবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না।

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিল। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।

তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি—ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল—তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয় নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু—তাতে তার যা হবার তা হোক।'

এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

তোমাদের চরণতলাশ্রয়চ্ছিন্ন
মৃণাল

শ্রাবণ ১৩২১

ভাইফোঁটা

শ্রাবণ মাসটা আজ যেন এক রাত্রে একেবারে দেউলে হইয়া গেছে। সমস্ত আকাশে কোথাও একটা ছেঁড়া মেঘের টুকরাও নাই।

আশ্চর্য এই যে, আমার সকালটা আজ এমন করিয়া কাটিতেছে। আমার বাগানের মেহেদি-বেড়ার প্রান্তে শিরীষগাছের পাতাগুলো ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিতেছে, আমি তাহা তাকাইয়া দেখিতেছি। সর্বনাশের যে মাঝ-দরিয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি এটা যখন দূরে ছিল তখন ইহার কথা কল্পনা করিয়া কত শীতের রাত্রে সর্বাঙ্গে ঘাম দিয়াছে, কত গ্রীষ্মের দিনে হাত-পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হিম হইয়া গেছে। কিন্তু, আজ সমস্ত ভয়ভাবনা হইতে এমনি ছুটি পাইয়াছি যে, ঐ-যে আতাগাছের ডালে একটা গিরগিটি স্থির হইয়া শিকার লক্ষ্য করিতেছে সেটার দিকেও আমার চোখ রহিয়াছে।

সর্বস্ব খোয়াইয়া পথে দাঁড়াইব, এটা তত কঠিন না— কিন্তু, আমাদের বংশে যে সততার খ্যাতি আজ তিন-পুরুষ চলিয়া আসিয়াছে সেটা আমারই জীবনের উপর আছাড় খাইয়া চুরমার হইতে চলিল সেই লজ্জাতেই আমার দিনরাত্রি স্বস্তি ছিল না। এমন-কি আত্মহত্যার কথাও অনেকবার ভাবিয়াছি। কিন্তু, আজ যখন আর পর্দা রহিল না, খাতাপত্রের গুহাগহ্বর হইতে অখ্যাতিগুলো কালো ক্রিমির মতো কিল্‌বিল্‌ করিয়া বাহির হইয়া আদালত হইতে খবরের কাগজময় ছড়াইয়া পড়িল, তখন আমার একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। পিতৃপুরুষের সুনামটাকে টানিয়া বেড়াইবার দায় হইতে রক্ষা পাইলাম। সবাই জানিল, আমি জুয়াচোর। বাঁচা গেল।

উকিলে উকিলে ছেঁড়াছিঁড়ি করিয়া সকল কথাই বাহির করিবে, কেবল সকলের চেয়ে বড়ো কলঙ্কের কথাটা আদালতে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই— কারণ, স্বয়ং ধর্ম ছাড়া তার আর-কোনো ফরিয়াদি অবশিষ্ট নাই। এইজন্য সেইটে প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়াই আজ কলম ধরিলাম।

আমার পিতামহ উদ্ধব দত্ত তাঁর প্রভুবংশকে বিপদের দিনে নিজের সম্পত্তি দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। সেই হইতে আমাদের দারিদ্র্যই অন্য লোকের ধনের চেয়ে মাথা উঁচু করিয়াছে। আমার পিতা সনাতন দত্ত ডিরোজিয়োর ছাত্র। মদের সম্বন্ধে তাঁর যেমন অদ্ভুত নেশা ছিল সত্যের সম্বন্ধে ততোধিক। মা আমাদের একদিন নাপিত-ভায়ার গল্প বলিয়াছিলেন শুনিয়া পরদিন হইতে সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ির ভিতরে যাওয়া তিনি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরে পড়িবার ঘরে শুইতাম। সেখানে দেয়াল জুড়িয়া ম্যাপগুলো সত্য কথা বলিত, তেপান্তর মাঠের খবর দিত না, এবং সাত সমুদ্র তেরো নদীর গল্পটাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া রাখিত। সততা সম্বন্ধেও তাঁর শুচিবায়ু প্রবল ছিল। আমাদের জবাবদিহির অন্ত ছিল না। একদিন একজন 'হকার' দাদাকে কিছু জিনিস বেচিয়াছিল। তারই কোনো-একটা মোড়কের একখানা দড়ি লইয়া খেলা করিতেছিলাম। বাবার হুকুমে সেই দড়ি হকারকে ফিরাইয়া দিবার জন্য রাস্তায় আমাকে ছুটিতে হইয়াছিল।

আমরা সাধুতার জেলখানায় সততার লোহার বেড়ি পরিয়া মানুষ। মানুষ

বলিলে একটু বেশি বলা হয়— আমরা ছাড়া আর সকলেই মানুষ, কেবল আমরা মানুষের দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের খেলা ছিল কঠিন, ঠাট্টা বন্ধ, গল্প নীরস, বাক্য স্বল্প, হাসি সংযত, ব্যবহার নিখুঁত। ইহাতে বাল্যলীলায় মস্ত যে-একটা ফাঁক পড়িয়াছিল লোকের প্রশংসায় সেটা ভর্তি হইত। আমাদের মাস্টার হইতে মুদি পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করিত, দত্তবাড়ির ছেলেরা সত্যযুগ হইতে হঠাৎ পথ ভুলিয়া আসিয়াছে।

পাথর দিয়া নিরেট করিয়া বাঁধানো রাস্তাতেও একটু ফাঁক পাইলেই প্রকৃতি তার মধ্য হইতে আপনার প্রাণশক্তির সবুজ জয়পতাকা তুলিয়া বসে। আমার নবীন জীবনে সকল তিথিই একাদশী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু উহারই মধ্যে উপবাসের একটা কোন্‌ ফাঁকে আমি একটুখানি সুধার স্বাদ পাইয়াছিলাম।

যে কয়জনের ঘরে আমাদের যাওয়া-আসার বাধা ছিল না তার মধ্যে একজন ছিলেন অখিলবাবু। তিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক; বাবা তাঁকে বিশ্বাস করিতেন। তাঁর মেয়ে ছিল অনসূয়া, আমার চেয়ে ছয় বছরের ছোটো। আমি তার শাসনকর্তার পদ লইয়াছিলাম।

তার শিশুমুখের সেই ঘন কালো চোখের পল্লব আমার মনে পড়ে। সেই পল্লবের ছায়াতে এই পৃথিবীর আলোর সমস্ত প্রখরতা তার চোখে যেন কোমল হইয়া আসিয়াছিল। কী স্নিগ্ধ করিয়াই সে মুখের দিকে চাহিত। পিঠের উপরে দুলিতেছে তার সেই বেণীটি সেও আমার মনে পড়ে; আর মনে পড়ে সেই দুইখানি হাত— কেন জানি না, তার মধ্যে বড়ো একটি করুণা ছিল। সে যেন পথে চলিতে আর-কারও হাত ধরিতে চায়; তার সেই কচি আঙুলগুলি যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কার মুঠার মধ্যে ধরা দিবার জন্য পথ চাহিয়া আছে।

ঠিক সেদিন এমন করিয়া তাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম এ কথা বলিলে বেশি বলা হইবে। কিন্তু, আমরা সম্পূর্ণ বুঝিবার আগেও অনেকটা বুঝি। অগোচরে মনের মধ্যে অনেক ছবি আঁকা হইয়া যায়— হঠাৎ একদিন কোনো-এক দিক হইতে আলো পড়িলে সেগুলা চোখে পড়ে।

অনুর মনের দরজায় কড়া পাহারা ছিল না। সে যা-তা বিশ্বাস করিত। একে তো সে তার বুড়ি দাসীর কাছ হইতে বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সমস্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তা আমার সেই ম্যাপ-টাঙানো পড়িবার ঘরের জ্ঞানভাণ্ডারের আবর্জনার মধ্যেও ঠাঁই পাইবার যোগ্য নয়; তার পরে সে আবার নিজের কল্পনার যোগেও কত কী যে সৃষ্টি করিত তার ঠিকানা নাই। এইখানে কেবলই তাকে আমার শাসন করিতে হইত। কেবলই বলিতে হইত, "অনু, এ-সমস্ত মিথ্যা কথা, তা জান! ইহাতে পাপ হয়।" শুনিয়া অনুর দুই চোখে কালো পল্লবের ছায়ার উপর আবার একটা ভয়ের ছায়া পড়িত। অনু যখন তার ছোটো বোনের কান্না থামাইবার জন্য কত কী বাজে কথা বলিত— তাকে ভুলাইয়া দুধ খাওয়াইবার সময় যেখানে পাখি নাই সেখানেও পাখি আছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে উড়ো খবর দিবার চেষ্টা করিত, আমি তাকে ভয়ংকর গম্ভীর হইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছি; বলিয়াছি, "উহাকে যে মিথ্যা বলিতেছ পরমেশ্বর সমস্ত শুনিতেছেন, এখনই তাঁর কাছে তোমার মাপ চাওয়া উচিত।"

এমনি করিয়া আমি তাকে যত শাসন করিয়াছি সে আমার শাসন মানিয়াছে। সে

নিজেকে যতই অপরাধী মনে করিত আমি ততই খুশি হইতাম। কড়া শাসনে মানুষের ভালো করিবার সুযোগ পাইলে, নিজে যে অনেক শাসনে ভালো হইয়াছি সেটার একটা দাম ফিরিয়া পাওয়া যায়। অনুও আমাকে নিজের এবং পৃথিবীর অধিকাংশের তুলনায় অদ্ভুত ভালো বলিয়া জানিত।

ক্রমে বয়স বাড়িয়াছে, ইস্কুল হইতে কলেজে গিয়াছি। অখিলবাবুর স্ত্রীর মনে মনে ইচ্ছা ছিল, আমার মতো ভালো ছেলের সঙ্গে অনুর বিবাহ দেন। আমারও মনে এটা ছিল, কোনো কন্যার পিতার চোখ এড়াইবার মতো ছেলে আমি নই। কিন্তু একদিন শুনিলাম বি. এল. পাস-করা একটি টাটকা মুন্‌সেফের সঙ্গে অনুর সম্বন্ধ পাকা হইয়াছে। আমরা গরিব—আমি তো জানিতাম, সেটাতেই আমাদের দাম বাড়িয়াছে। কিন্তু, কন্যার পিতার হিসাবের প্রণালী স্বতন্ত্র।

বিসর্জনের প্রতিমা ডুবিল। একেবারে জীবনের কোন্‌ আড়ালে সে পড়িয়া গেল। শিশুকাল হইতে যে আমার সকলের চেয়ে পরিচিত সে এক দিনের মধ্যেই এই হাজার-লক্ষ অপরিচিত মানুষের সমুদ্রের মধ্যে তলাইয়া গেল। সেদিন মনে যে কী বাজিল তাহা মনই জানে। কিন্তু, বিসর্জনের পরেও কি চিনিয়াছিলাম সে আমার দেবীর প্রতিমা? তা নয়। অভিমান সেদিন ঘা খাইয়া আরও ঢেউ খেলাইয়া উঠিয়াছিল। অনুকে তো চিরকাল ছোটো করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি; সেদিন আমার যোগ্যতার তুলনায় তাকে আরও ছোটো করিয়া দেখিলাম। আমার শ্রেষ্ঠতার যে পূজা হইল না, সেদিন এইটেই সংসারে সকলের চেয়ে বড়ো অকল্যাণ বলিয়া জানিয়াছি।

যাক, এটা বোঝা গেল, সংসারে শুধু সৎ হইয়া কোনো লাভ নাই। পণ করিলাম এমন টাকা করিব যে একদিন অখিলবাবুকে বলিতে হইবে, 'বড়ো ঠকান ঠকিয়াছি।' খুব কষিয়া কাজের লোক হইবার জোগাড় করিলাম।

কাজের লোক হইবার সব চেয়ে বড়ো সরঞ্জাম নিজের 'পরে অগাধ বিশ্বাস; সে পক্ষে আমার কোনোদিন কোনো কমতি ছিল না। এ জিনিসটা ছোঁয়াচে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে অধিকাংশ লোকেই তাকে বিশ্বাস করে। কেজো বুদ্ধিটা যে আমার স্বাভাবিক এবং অসাধারণ সেটা সকলেই মানিয়া লইতে লাগিল।

কেজো সাহিত্যের বই এবং কাগজে আমার শেল্‌ফ্‌ এবং টেবিল ভরিয়া উঠিল। বাড়ি-মেরামত, ইলেক্‌ট্রিক আলো ও পাখার কৌশল, কোন্‌ জিনিসের কত দর, বাজারদর ওঠাপড়ার গূঢ়তত্ত্ব, এক্‌স্‌চেঞ্জের রহস্য, প্ল্যান, এস্টিমেট প্রভৃতি বিদ্যায় আসর জমাইবার মতো ওস্তাদি আমি একরকম মারিয়া লইয়াছিলাম।

কিন্তু, অহরহ কাজের কথা বলি অথচ কিছুতে কোনো কাজেই নামি না, এমনভাবে অনেক দিন কাটিল। আমার ভক্তরা যখনই আমাকে কোনো-একটা স্বদেশী কোম্পানিতে যোগ দিবার প্রস্তাব করিত আমি বুঝাইয়া দিতাম, যতগুলা কারবার চলিতেছে কোনোটার কাজের ধারা বিশুদ্ধ নহে, সকলেরই মধ্যে গলদ বিস্তর—তা ছাড়া, সততা বাঁচাইয়া চলিতে হইলে ওদের কাছে ঘেঁষিবার জো নাই। সততার লাগামে একটু-আধটু ঢিল না দিলে ব্যাবসা চলে না, এমন কথা আমার কোনো বন্ধু বলাতে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে।

মৃত্যুকাল পর্যন্ত সর্বাঙ্গসুন্দর প্ল্যান এস্টিমেট এবং প্রস্পেক্টস লিখিয়া আমার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতাম। কিন্তু, বিধির বিপাকে প্ল্যান করা ছাড়িয়া কাজ

করায় লাগিলাম। এক তো পিতার মৃত্যু হওয়াতে আমার ঘাড়েই সংসারের দায় চাপিল; তার পরে আর-এক উপসর্গ আসিয়া জুটিল, সে কথাও বলিতেছি।

প্রসন্ন বলিয়া একটি ছেলে আমার সঙ্গে পড়িত। সে যেমন মুখর তেমনি নিন্দুক। আমাদের পৈতৃক সততার খ্যাতিটাকে লইয়া খোঁচা দিবার সে ভারি সুযোগ পাইয়াছিল। বাবা আমার নাম দিয়াছিলেন সত্যধন। প্রসন্ন আমাদের দারিদ্র্য লক্ষ্য করিয়া বলিত, "বাবা দিবার বেলা দিলেন মিথ্যাধন, আর নামের বেলা দিলেন সত্যধন, তার চেয়ে ধনটাকে সত্য দিয়া নামটাকে মিথ্যা দিলে লোকসান হইত না।" প্রসন্নর মুখটাকে বড়ো ভয় করিতাম।

অনেক দিন তার দেখাই ছিল না। ইতিমধ্যে সে বর্মায় লুধিয়ানায় শ্রীরঙ্গপত্তনে নানা রকম-বেরকমের কাজ করিয়া আসিয়াছে। সে হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া আমাকে পাইয়া বসিল। যার ঠাট্টাকে চিরদিন ভয় করিয়া আসিয়াছি তার শ্রদ্ধা পাওয়া কি কম আরাম।

প্রসন্ন কহিল, "ভাই, আমার এই কথা রইল, দেখে নিয়ো, একদিন তুমি যদি দ্বিতীয় মতি শীল বা দুর্গাচরণ লা' না হও তবে আমি বউবাজারের মোড় হইতে বাগবাজারের মোড় পর্যন্ত বরাবর সমানে নাকে খত দিতে রাজি আছি।"

প্রসন্নর মুখে এত বড়ো কথাটা যে কতই বড়ো তাহা প্রসন্নর সঙ্গে যারা এক ক্লাসে না পড়িয়াছে তারা বুঝিতেই পারিবে না। তার উপরে প্রসন্ন পৃথিবীটাকে খুব করিয়া চিনিয়া আসিয়াছে; উহার কথার দাম আছে।

সে বলিল, "কাজ বোঝে এমন লোক আমি ঢের দেখিয়াছি দাদা—কিন্তু তারাই সব চেয়ে পড়ে বিপদে। তারা বুদ্ধির জোরেই কিস্তি মাত করিতে চায়, ভুলিয়া যায় যে মাথার উপরে ধর্ম আছেন—কিন্তু তোমাতে যে মণিকাঞ্চনযোগ। ধর্মকেও শক্ত করিয়া ধরিয়াছ, আবার কর্মের [illegible]

[illegible] স্থির করিয়াছিল, বাণিজ্য [illegible] দেশের মুক্তি নাই, এবং [illegible] বুঝিয়াছিল যে, কেবলমাত্র মূলধনটার জোগাড় হইলেই উকিল মোক্তার [illegible] শিক্ষক ছাত্র [illegible] বাপ-দাদা সকলেই এক দিনেই সকলপ্রকার [illegible] চালাইতে পারে।

[illegible] বলিলাম, "আমার সম্বল নাই [illegible]।"

[illegible] "বিলক্ষণ। তোমার পৈতৃক [illegible] অভাব কী।"

[illegible] মনে [illegible] প্রসন্ন হবে বুঝি [illegible] দিন ধরিয়া [illegible] সঙ্গে একটা [illegible]

[illegible] তাহা নয় দাদা। সততাই [illegible] লক্ষ্মীর সোনার পদ্ম। লোকের বিশ্বাসের উপরই কারবার চলে, টাকায় নয়।"

পিতার আমল হইতেই আমাদের বাড়িতে পাড়ার কোনো কোনো বিধবা মেয়ে টাকা গচ্ছিত রাখিত। তারা সুদের আশা করিত না; কেবল এই বলিয়া নিশ্চিন্ত ছিল যে, মেয়েমানুষের সর্বত্রই ঠকিবার আশঙ্কা আছে, কেবল আমাদের ঘরেই নাই।

সেই গচ্ছিত টাকা লইয়া স্বদেশী এজেন্সি খুলিলাম। কাপড় কাগজ কালী বোতাম সাবান যতই আনাই বিক্রি হইয়া যায়—একেবারে পঙ্গপালের মতো খরিদ্দার

আসিতে লাগিল।

একটা কথা আছে—বিদ্যা যতই বাড়ে ততই জানা যায় যে, কিছুই জানি না। টাকারও সেই দশা। টাকা যতই বাড়ে ততই মনে হয়, টাকা নাই বলিলেই হয়। আমার মনের সেইরকম অবস্থায় প্রসন্ন বলিল—ঠিক যে বলিল তাহা নয়, আমাকে দিয়া বলাইয়া লইল যে, খুচরা-দোকানদারির কাজে জীবন দেওয়াটা জীবনের বাজে খরচ। পৃথিবী জুড়িয়া যে-সব ব্যাবসা সেই তো ব্যাবসা। দেশের ভিতরেই যে টাকা খাটে সে টাকা ঘানির বলদের মতো অগ্রসর হয় না, কেবল ঘুরিয়া মরে।

প্রসন্ন এমনি ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া উঠিল যেন এমন নূতন অথচ গভীর জ্ঞানের কথা সে জীবনে আর কখনো শোনে নাই। তার পরে আমি তাকে ভারতবর্ষে তিসির ব্যাবসার সাত বছরের হিসাব দেখাইলাম। কোথায় তিসি কত পরিমাণে যায়; কোথায় কত দর; দর সব চেয়ে উঠেই বা কত, নামেই বা কত; মাঠে ইহার দম কত, জাহাজের ঘাটে ইহার দাম কত; চাষাদের ঘর হইতে কিনিয়া একদম সমুদ্রপারে চালান করিতে পারিলে এক লক্ষে কত লাভ হওয়া উচিত—কোথাও বা তাহা রেখা কাটিয়া, কোথাও বা তাহা শতকরা হিসাবের অঙ্কে ছকিয়া, কোথাও বা অনুলোম-প্রণালীতে, কোথাও বা প্রতিলোম-প্রণালীতে, লাল এবং কালো কালীতে, অতি পরিষ্কার অক্ষরে লম্বা কাগজের পাঁচ-সাত পৃষ্ঠা ভর্তি করিয়া যখন প্রসন্নর হাতে দিলাম তখন সে আমার পায়ের ধুলো লইতে যায় আর-কি।

সে বলিল, "মনে বিশ্বাস ছিল, আমি এ-সব কিছু কিছু বুঝি; কিন্তু আজ হইতে দাদা, তোমার সাক্‌রেদ হইলাম।"

আবার একটু প্রতিবাদও করিল। বলিল, "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য—মনে আছে তো? কী জানি, হিসাবে ভুল থাকিতেও পারে।"

আমার রোখ চড়িয়া গেল। ভুল যে নাই কাগজে কাগজে তাহার অকাট্য প্রমাণ বাড়িয়া চলিল। লোকসান যত প্রকারের হইতে পারে সমস্তকে সার বাঁধিয়া খাড়া করিয়াও, মুনফাকে কোনোমতেই শতকরা বিশ-পঁচিশের নীচে নামাইতে পারা গেল না।

এমনি করিয়া দোকানদারির সরু খাল বাহিয়া কারবারের সমুদ্রে গিয়া যখন পড়া গেল তখন যেন সেটা নিতান্ত আমারই জেদ-বশত ঘটিল, এমনি একটা ভাব দেখা দিল। দায়িত্ব আমারই।

একে দত্তবংশের সততা, তার উপরে সুদের লোভ; গচ্ছিত টাকা ফাঁপিয়া উঠিল। মেয়েরা গহনা বেচিয়া টাকা দিতে লাগিল।

কাজে প্রবেশ করিয়া আর দিশা পাই না। প্ল্যানে যেগুলো দিব্য লাল এবং কালো কালীর রেখায় ভাগ করা, কাজের মধ্যে সে বিভাগ খুঁজিয়া পাওয়া দায়। আমার প্ল্যানের রসভঙ্গ হয়, তাই কাজে সুখ পাই না। অন্তরাত্মা স্পষ্ট বুঝিতে লাগিল, কাজ করিবার ক্ষমতা আমার নাই; অথচ সেটা কবুল করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। কাজটা স্বভাবত প্রসন্নর হাতেই পড়িল, অথচ আমিই যে কারবারের হর্তাকর্তা বিধাতা এ ছাড়া প্রসন্নর মুখে আর কথাই নাই। তার মৎলব এবং আমার স্বাক্ষর, তার দক্ষতা এবং আমার পৈতৃক খ্যাতি, এই দুইয়ে মিলিয়া ব্যাবসাটা চার পা তুলিয়া যে কোন্ পথে ছুটিতেছে ঠাহর করিতেই পারিলাম না।

দেখিতে দেখিতে এমন জায়গায় আসিয়া পড়িলাম যেখানে তলও পাই না, কূলও দেখি না। তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া যদি সত্য খবরটা ফাঁস করি তবে সততা রক্ষা হয়, কিন্তু সততার খ্যাতি রক্ষা হয় না। গচ্ছিত টাকার সুদ জোগাইতে লাগিলাম, কিন্তু সেটা মুনফা হইতে নয়। কাজেই সুদের হার বাড়াইয়া গচ্ছিতের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিলাম।

আমার বিবাহ অনেকদিন হইয়াছে। আমি জানিতাম, ঘরকন্না ছাড়া আমার স্ত্রীর আর কোনো-কিছুতেই খেয়াল নাই। হঠাৎ দেখি, অগস্ত্যের মতো এক গণ্ডূষে টাকার সমুদ্র শুষিয়া লইবার লোভ তারও আছে। আমি জানি না, কখন আমারই মনের মধ্য হইতে এই হাওয়াটা আমাদের সমস্ত পরিবারে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের চাকর দাসী দারোয়ান পর্যন্ত আমাদের কারবারে টাকা ফেলিতেছে। আমার স্ত্রীও আমাকে ধরিয়া পড়িল, সে কিছু কিছু গহনা বেচিয়া আমার কারবারে টাকা খাটাইবে। আমি ভর্ৎসনা করিলাম, উপদেশ দিলাম। বলিলাম, লোভের মতো রিপু নাই।—স্ত্রীর টাকা লই নাই।

আরও একজনের টাকা আমি লইতে পারি নাই।

অনু একটি ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। যেমন কৃপণ তেমনি ধনী বলিয়া তার স্বামীর খ্যাতি ছিল। কেহ বলিত, দেড় লক্ষ টাকা তার জমা আছে; কেহ বলিত আরও অনেক বেশি। লোকে বলিত, কৃপণতায় অনু তার স্বামীর সহধর্মিণী। আমি ভাবিতাম, 'তা হবেই তো। অনু তো তেমন শিক্ষা এবং সঙ্গ পায় নাই।'

এই টাকা কিছু খাটাইয়া দিবার জন্য সে আমাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিল। লোভ হইল, দরকারও খুব ছিল, কিন্তু ভয়ে তার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করিতে গেলাম না।

একবার যখন একটা বড়ো হুণ্ডির মেয়াদ আসন্ন এমন সময়ে প্রসন্ন আসিয়া বলিল, "অখিলবাবুর মেয়ের টাকাটা এবার না লইলে নয়।"

আমি বলিলাম, "যে রকম দশা সিঁধ কাটাও আমার দ্বারা সম্ভব, কিন্তু ও টাকাটা লইতে পারিব না।"

প্রসন্ন কহিল, "যখন হইতে তোমার ভরসা গেছে তখন হইতেই কারবারে লোকসান চলিতেছে। কপাল ঠুকিয়া লাগিলেই কপালের জোরও বাড়ে।"

কিছুতেই রাজি হইলাম না।

পরদিন প্রসন্ন আসিয়া কহিল, "দক্ষিণ হইতে এক বিখ্যাত মারাঠি গণৎকার আসিয়াছে, তাহার কাছে কুষ্ঠি লইয়া চলো।"

সনাতন দত্তর বংশে কুষ্ঠি মিলাইয়া ভাগ্যপরীক্ষা! দুর্বলতার দিনে মানব-প্রকৃতির ভিতরকার সাবেক-কেলে বর্বরটা বল পাইয়া উঠে। যাহা দৃষ্ট তাহা যখন ভয়ংকর তখন যাহা অদৃষ্ট তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। বুদ্ধিকে বিশ্বাস করিয়া কোনো আরাম পাইতেছিলাম না, তাই নির্বুদ্ধিতার শরণ লইলাম; জন্মক্ষণ ও সন-তারিখ লইয়া গনাইতে গেলাম।

শুনিলাম, আমি সর্বনাশের শেষ কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু, এইবার বৃহস্পতি অনুকূল—এখন তিনি আমাকে কোনো-একটি স্ত্রীলোকের ধনের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া অতুল ঐশ্বর্য মিলাইয়া দিবেন।

ইহার মধ্যে প্রসন্নর হাত আছে, এমন সন্দেহ করিতে পারিতাম। কিন্তু, সন্দেহ করিতে কোনোমতেই ইচ্ছা হইল না। বাড়ি ফিরিয়া আসিলে প্রসন্ন আমার হাতে একখানা বই দিয়া বলিল, "খোলো দেখি।" খুলিতেই যে পাতা বাহির হইল তাহাতে ইংরাজিতে লেখা, বাণিজ্যে আশ্চর্য সফলতা।

সেইদিনই অনুকে দেখিতে গেলাম।

স্বামীর সঙ্গে মফঃস্বলে ফিরিবার সময় বারবার ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়িয়া অনুর এখন এমন দশা যে ডাক্তাররা ভয় করিতেছে, তাকে ক্ষয়রোগে ধরিয়াছে। কোনো ভালো জায়গায় যাইতে বলিলে সে বলে, "আমি তো আজ বাদে কাল মরিবই, কিন্তু আমার সুবোধের টাকা আমি নষ্ট করিব কেন।"—এমনি করিয়া সে সুবোধকে ও সুবোধের টাকাটিকে নিজের প্রাণ দিয়া পালন করিতেছে।

আমি গিয়া দেখিলাম, অনুর রোগটি তাকে এই পৃথিবী হইতে তফাত করিয়া দিয়াছে। আমি যেন তাকে অনেক দূর হইতে দেখিতেছি। তার দেহখানি একেবারে স্বচ্ছ হইয়া ভিতর হইতে একটি আভা বাহির হইতেছে। যা-কিছু স্থূল সমস্ত ক্ষয় করিয়া তার প্রাণটি মৃত্যুর বাহির-দরজায় স্বর্গের আলোতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর, সেই তার করুণ দুটি চোখের ঘন পল্লব! চোখের নীচে কালী পড়িয়া মনে হইতেছে, যেন তার দৃষ্টির উপরে জীবনান্তকালের সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। আমার সমস্ত মন স্তব্ধ হইয়া গেল, আজ তাহাকে দেবী বলিয়া মনে হইল।

আমাকে দেখিয়া অনুর মুখের উপর একটি শান্ত প্রসন্নতা ছড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, "কাল রাত্রে আমার অসুখ যখন বাড়িয়াছিল তখন হইতে তোমার কথাই ভাবিতেছি। আমি জানি, আমার আর বেশি দিন নাই। পরশু ভাইফোঁটার দিন, সেদিন আমি তোমাকে শেষ ভাইফোঁটা দিয়া যাইব।"

টাকার কথা কিছুই বলিলাম না। সুবোধকে ডাকাইয়া আনিলাম। তার বয়স সাত। চোখদুটি মায়েরই মতো। সমস্তটা জড়াইয়া তার কেমন-একটি ক্ষণিকতার ভাব, পৃথিবী যেন তাকে পুরা পরিমাণ স্তন্য দিতে ভুলিয়া গেছে। কোলে টানিয়া তার কপাল চুম্বন করিলাম। সে চুপ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল, "কী হইল।"

আমি বলিলাম, "আজ আর সময় হইল না।"

সে কহিল, "মেয়াদের আর নয় দিন মাত্র বাকি।"

অনুর সেই মুখখানি, সেই মৃত্যুসরোবরের পদ্মটি, দেখিয়া অবধি সর্বনাশকে আমার তেমন ভয়ংকর বলিয়া মনে হইতেছিল না।

কিছুকাল হইতে হিসাবপত্র দেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কূল দেখা যাইত না বলিয়া ভয়ে চোখ বুজিয়া থাকিতাম। মরিয়া হইয়া সই করিয়া যাইতাম, বুঝিবার চেষ্টা করিতাম না।

ভাইফোঁটার সকালবেলায় একখানা হিসাবের চুম্বক ফর্দ লইয়া জোর করিয়া প্রসন্ন আমাকে কারবারের বর্তমান অবস্থাটা বুঝাইয়া দিল। দেখিলাম, মূলধনের সমস্ত তলা একেবারে ক্ষইয়া গেছে। এখন কেবলই ধারের টাকায় জল সেঁচিয়া না চলিলে নৌকাডুবি হইবে।

কৌশলে টাকার কথাটা পাড়িবার উপায় ভাবিতে ভাবিতে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণে

চলিলাম। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। এখন হতবুদ্ধির তাড়ায় বৃহস্পতিবারকেও ভয় না করিয়া পারি না। যে মানুষ হতভাগা, নিজের বুদ্ধি ছাড়া আর-কিছুকেই না মানিতে তার ভরসা হয় না। যাবার বেলায় মনটা বড়ো খারাপ হইল।

অনুর জ্বর বাড়িয়াছে। দেখিলাম, সে বিছানায় শুইয়া। নীচে মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়া সুবোধ ইংরাজি ছবির কাগজ হইতে ছবি কাটিয়া আটা দিয়া একটা খাতায় আঁটিতেছিল।

বারবেলা বাঁচাইবার জন্য সময়ের অনেক আগে আসিয়াছিলাম। কথা ছিল, আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে আনিব। কিন্তু, অনুর সম্বন্ধে আমার স্ত্রীর মনের কোণে বোধ করি একটুখানি ঈর্ষা ছিল, তাই সে আসিবার সময় ছুতা করিল, আমিও পীড়াপীড়ি করিলাম না।

অনু জিজ্ঞাসা করিল, "বউদিদি এলেন না?"

আমি বলিলাম, "শরীর ভালো নাই।"

অনু একটু নিশ্বাস ফেলিল, আর কিছু বলিল না।

আমার মধ্যে একদিন যেটুকু মাধুর্য দেখা দিয়াছিল সেইটিকে আপনার সোনার আলোয় গলাইয়া শরতের আকাশ সেই রোগীর বিছানার উপর বিছাইয়াছিল। কত কথা আজ উঠিয়া পড়িল। সেই-সব অনেক দিনের অতি ছোটো কথা আমার আসন্ন সর্বনাশকে ছাড়াইয়া আজ কত বড়ো হইয়া উঠিল। কারবারের হিসাব ভুলিয়া গেলাম।

ভাইফোঁটার খাওয়া খাইলাম। আমার কপালে সেই মরণের যাত্রী দীর্ঘায়ু-কামনার ফোঁটা পরাইয়া আমার পায়ের ধুলা লইল। আমি গোপনে চোখ মুছিলাম।

ঘরে আসিয়া বসিলে সে একটি টিনের বাক্স আমার কাছে আনিয়া রাখিল। বলিল, "সুবোধের জন্য এই যা-কিছু এতদিন আগলাইয়া রাখিয়াছি তোমাকে দিলাম, আর সেই সঙ্গে সুবোধকেও তোমার হাতে দিলাম। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।"

আমি বলিলাম, "অনু, দোহাই তোমার, টাকা আমি লইব না। সুবোধের দেখা-শুনার কোনো ত্রুটি হইবে না, কিন্তু টাকা আর-কারও কাছে রাখিয়ো।"

অনু কহিল, "এই টাকা লইবার জন্য কত লোক হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। তুমি কি তাদের হাতেই দিতে বল।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। অনু বলিল, "একদিন আড়াল হইতে শুনিয়াছি, ডাক্তার বলিয়াছে সুবোধের যেরকম শরীরের লক্ষণ ওর বেশিদিন বাঁচার আশা নাই। শুনিয়া অবধি ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে আমার মরিতে দেরি হয়। আজ অন্তত আশা লইয়া মরিব যে, ডাক্তারের কথা ভুল হইতেও পারে। সাতচল্লিশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজে জমিয়াছে—আরও কিছু এ দিকে ও দিকে আছে। ঐ টাকা হইতে সুবোধের পথ্য ও চিকিৎসা ভালো করিয়াই চলিতে পারিবে। আর, যদি ভগবান অল্প বয়সেই উহাকে টানিয়া লন তবে এই টাকা উহার নামে একটা-কোনো ভালো কাজে লাগাইয়ো।"

আমি কহিলাম, "অনু, আমাকে তুমি যত বিশ্বাস কর আমি নিজেকে তত বিশ্বাস করি না।"

শুনিয়া অনু একটুমাত্র হাসিল। আমার মুখে এমন কথা মিথ্যা বিনয়ের মতো শোনায়।

বিদায়কালে অনু বাক্স খুলিয়া কোম্পানির কাগজ ও কয়েক কেতা নোট বুঝাইয়া দিল। তার উইলে দেখিলাম লেখা আছে, অপুত্রক ও নাবালক অবস্থায় সুবোধের মৃত্যু হইলে আমিই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

আমি বলিলাম, "আমার স্বার্থের সঙ্গে তোমার সম্পত্তি কেন এমন করিয়া জড়াইলে।"

অনু কহিল, "আমি যে জানি, আমার ছেলের স্বার্থে তোমার স্বার্থ কোনোদিন বাধিবে না।"

আমি কহিলাম, "কোনো মানুষকেই এতটা বিশ্বাস করা কাজের দস্তুর নয়।"

অনু কহিল, "আমি তোমাকে জানি, ধর্মকে জানি, কাজের দস্তুর বুঝিবার আমার শক্তি নাই।"

বাক্সের মধ্যে গহনা ছিল, সেগুলি দেখাইয়া সে বলিল, "সুবোধ যদি বাঁচে ও বিবাহ করে, তবে বউমাকে এই গহনা ও আমার আশীর্বাদ দিয়ো। আর, এই পান্নার কণ্ঠীটি বড়দিদিকে দিয়া বলিয়ো, আমার মাথার দিব্য, তিনি যেন গ্রহণ করেন।"

এই বলিয়া অনু যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। এই আমি তার শেষ প্রণাম পাইয়াছি। ইহার দুই দিন পরেই সন্ধ্যার সময় হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ হইয়া তার মৃত্যু হইল—আমাকে খবর দিবার সময় পাইল না।

ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ সারিয়া, টিনের বাক্স হাতে, গাড়ি হইতে বাড়ির দরজায় যেমনি নামিলাম দেখি, প্রসন্ন অপেক্ষা করিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, খবর ভালো তো?"

আমি বলিলাম, "এ টাকায় কেহ হাত দিতে পারিবে না।"

প্রসন্ন কহিল, "কিন্তু—"

আমি বলিলাম, "সে জানি না—যা হয় তা হোক, এ টাকা আমার ব্যবসায়ে লাগিবে না।"

প্রসন্ন বলিল, "তবে তোমার অন্ত্যেষ্টিসংকারে লাগিবে।"

অনুর মৃত্যুর পর সুবোধ আমার বাড়িতে আসিয়া আমার ছেলে নিত্যধনকে সঙ্গী পাইল।

যারা গল্পের বই পড়ে মনে করে, মানুষের মনের বড়ো বড়ো পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটে। ঠিক উল্টা। টিকার আগুন ধরিতে সময় লাগে কিন্তু বড়ো বড়ো আগুন হুহু করিয়া ধরে। আমি এ কথা যদি বলি যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুবোধের উপর আমার মনের একটা বিদ্বেষ দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল, তবে সবাই তার বিস্তারিত কৈফিয়ত চাহিবে। সুবোধ অনাথ, সে বড়ো ক্ষীণপ্রাণ, সে দেখিতেও সুন্দর, সকলের উপরে সুবোধের মা স্বয়ং অনু—কিন্তু তার কথাবার্তা, চলাফেরা, খেলাধুলা, সমস্তই যেন আমাকে দিনরাত খোঁচা দিতে লাগিল।

আসল, সময়টা বড়ো খারাপ পড়িয়াছিল। সুবোধের টাকা কিছুতেই লইব না পণ ছিল, অথচ ও টাকাটা না লইলে নয় এমনি অবস্থা। শেষকালে একদিন মহা বিপদে পড়িয়া কিছু লইলাম। ইহাতে আমার মনের কল এমনি বিগড়াইয়া গেল

যে, সুবোধের কাছে মুখ দেখানো আমার দায় হইল। প্রথমটা উহাকে এড়াইতে থাকিলাম, তার পর উহার উপরে বিষম রাগিতে আরম্ভ করিলাম।

রাগিবার প্রথম উপলক্ষ হইল উহার স্বভাব। আমি নিজে ব্যস্তবাগীশ, সব কাজ তাড়াহুড়ো করা আমার অভ্যাস। কিন্তু, সুবোধের কী এক রকমের ভাব, উহাকে প্রশ্ন করিলে হঠাৎ যেন উত্তর করিতেই পারে না—যেখানে সে আছে সেখানে যেন সে নাই, যেন সে আর কোথাও। রাস্তার ধারের জানলার গরাদে ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়; কী দেখে, কী ভাবে, তা সেই জানে। আমার এটা অসহ্য বোধ হয়। সুবোধ বহুকাল হইতে রুগ্‌ণ মায়ের কাছে মানুষ, সমবয়সী খেলার সঙ্গী কেউ ছিল না; তাই সে বরাবর আপনার মনকে লইয়াই আপনি খেলা করিয়াছে। এই-সব ছেলের মুশকিল এই যে, ইহারা যখন শোক পায় তখন ভালো করিয়া কাঁদিতেও জানে না, শোক ভুলিতেও জানে না। এইজন্যই সুবোধকে ডাকিলে হঠাৎ সাড়া পাওয়া যাইত না, এবং কাজ করিতে বলিলে সে ভুলিয়া যাইত। তার জিনিসপত্র সে কেবলই হারাইত, তাহা লইয়া বকিলে চুপ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত—যেন সেই চাহিয়া থাকাই তার কান্না। আমি বলিতে লাগিলাম, 'এর দৃষ্টান্ত যে আমার ছেলের পক্ষে বড়ো খারাপ।' আবার মুশকিল এই যে, ইহাকে দেখিয়া অবধি নিত্যর ইহাকে ভারি ভালো লাগিয়াছে; তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরকম বলিয়াই ইহার প্রতি টানও যেন তার বেশি হইল।

পরের স্বভাব সংশোধন আমার কৌলিক কাজ; ইহাতে আমার পটুতাও যেমন উৎসাহও তেমনি। সুবোধের স্বভাবটা কর্মপটু নয় বলিয়াই আমি তাকে খুব কষিয়া কাজ করাইতে লাগিলাম। যতবারই সে ভুল করিত ততবারই নিজেকে দিয়া তার সে ভুল শোধরাইয়া লইতাম।

আবার তার আর-এক অভ্যাস, সেটা তার মায়েরও ছিল—সে আপনাকে এবং আপনার চারি দিককে নানারকম করিয়া কল্পনা করিত। জানলার সামনেই যে জামরুল গাছ ছিল সেটাকে সে কী-একটা অদ্ভুত নাম দিয়াছিল; স্ত্রীর কাছে শুনিয়াছি একলা দাঁড়াইয়া সেই গাছটার সঙ্গে সে কথা কহিত। বিছানাটাকে মাঠ, আর বালিশগুলাকে গোরুর পাল মনে করিয়া শোবার ঘরে বসিয়া রাখালি করাটা যে কত মিথ্যা, ইহা তার নিজের মুখে কবুল করাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি—সে জবাবই করে না। আমি যতই তাকে শাসন করি আমার কাছে তার ত্রুটি ততই বাড়িয়া চলে। আমাকে দেখিলেই সে থতমত খাইয়া যায়; আমার মুখের সাদা কথাটাও সে বুঝিতে পারে না।

আর কিছু নয়, হৃদয় যদি রাগ করিতে শুরু করে এবং নিজেকে সামলাইবার মতো বাহির হইতে কোনো ধাক্কা যদি সে না পায় তবে রাগটা আপনাকে আপনিই বাড়াইয়া চলে, নূতন কারণের অপেক্ষা রাখে না। যদি এমন মানুষকে দু-চারবার মূর্খ বলি যার জবাব দিবার সাধ্য নাই তবে সেই দু-চারবার বলাটাই পঞ্চম বারকার বলাটাকে সৃষ্টি করে, কোনো উপকরণের দরকার হয় না। সুবোধের উপর কেবলই বিরক্ত হইয়া ওঠা আমার মনের এমনি অভ্যাস হইয়াছিল যে, সেটা ত্যাগ করা আমার সাধ্যই ছিল না।

এমনি করিয়া পাঁচ বছর কাটিল। সুবোধের বয়স যখন বারো তখন তার

কোম্পানির কাগজ এবং গহনাপত্র গলিয়া গিয়া আমার হিসাবের খাতায় গোটাকতক কালীর অঙ্কে পরিণত হইল।

মনকে বুঝাইলাম, অনু তো উইলে আমাকেই টাকা দিয়াছে। মাঝখানে সুবোধ আছে বটে, কিন্তু ও তো ছায়া, নাই বলিলেই হয়। যে টাকাটা নিশ্চয়ই পাইব সেটাকে আগেভাগে খরচ করিলে অধর্ম হয় না।

অল্প বয়স হইতেই আমার বাতের ব্যামো ছিল। কিছুদিন হইতে সেইটে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। যারা কাজের লোক তাদের স্থির করিয়া রাখিলে তারা চারি দিকের সমস্ত লোককে অস্থির করিয়া তোলে। সে কয়দিন আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, সুবোধ, বাড়ির চাকরবাকর, কারও শান্তি ছিল না।

এ দিকে আমার পরিচিত যে কয়জন বিধবা আমার কাছে টাকা রাখিয়াছিল কয়েক মাস তাদের সুদ বন্ধ। পূর্বে এমন কখনো ঘটিতে দিই নাই। এইজন্য তারা উদ্‌বিগ্ন হইয়া আমাকে তাগিদ করিতেছে। আমি প্রসন্নকে তাগিদ করি, সে কেবলই দিন ফিরায়। অবশেষে যেদিন নিশ্চিত দিবার কথা সেদিন সকাল হইতে পাওনাদাররা বসিয়া আছে, প্রসন্নর দেখা নাই।

নিত্যকে বলিলাম, "সুবোধকে ডাকিয়া দাও।"

সে বলিল, "সুবোধ শুইয়া আছে।"

আমি মহা রাগিয়া বলিলাম, "শুইয়া আছে! এখন বেলা এগারোটা, এখন সে শুইয়া আছে!"

সুবোধ ভয়ে ভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, "প্রসন্নকে যেখানে পাও ডাকিয়া আনো।"

সর্বদা আমার ফাইফরমাশ খাটিয়া সুবোধ এ-সকল কাজে পাকা হইয়াছিল। কাকে কোথায় সন্ধান করিতে হইবে, সমস্তই তার জানা।

বেলা একটা হইল, দুটা হইল, তিনটা হইল, সুবোধ আর ফেরে না। এ দিকে যারা ধন্না দিয়া বসিয়া আছে তাদের ভাষার তাপ এবং বেগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোনোমতেই সুবোধটার গড়িমসি চাল ঘুচাইতে পারিলাম না। যত দিন যাইতেছে ততই তার ঢিলামি আরও যেন বাড়িয়া উঠিতেছে। আজকাল সে বসিতে পারিলে উঠিতে চায় না, নড়িতে-চড়িতে তার সাত দিন লাগে। এক-একদিন দেখি, বিকালে পাঁচটার সময়েও সে বিছানায় গড়াইতেছে; সকালে তাকে বিছানা হইতে জোর করিয়া উঠাইয়া দিতে হয়; চলিবার সময় যেন পায়ে পায়ে জড়াইয়া চলে। আমি সুবোধকে বলিতাম, জন্মকুঁড়ে, কুঁড়েমির মহামহোপাধ্যায়। সে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিত। একদিন তাকে বলিয়াছিলাম, "বল্ দেখি প্রশান্ত মহাসাগরের পরে কোন্ মহাসাগর।" যখন সে জবাব দিতে পারিল না আমি বলিলাম, "সে হচ্ছে তুমি, আলস্য-মহাসাগর।" পারৎপক্ষে সুবোধ কোনোদিন আমার কাছে কাঁদে না; কিন্তু সেদিন তার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মার গালি সব সহিতে পারিত, কিন্তু বিদ্রূপ তার মর্মে গিয়া বাজিত।

বেলা গেল। রাত হইল। ঘরে কেহ বাতি দিল না। আমি ডাকাডাকি করিলাম, কেহ সাড়া দিল না। বাড়িসুদ্ধ সকলের উপর আমার রাগ হইল। তার পরে হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল, হয়তো প্রসন্ন সুদের টাকা সুবোধের হাতে দিয়াছে, সুবোধ

তাই লইয়া পালাইয়াছে। আমার ঘরে সুবোধের যে আরাম ছিল না সে আমি জানিতাম। ছেলেবেলা হইতে আরাম জিনিসটাকে অন্যায় বলিয়াই জানি, বিশেষত ছোটো ছেলের পক্ষে। তাই এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো পরিতাপ ছিল না। কিন্তু, তাই বলিয়া সুবোধ যে টাকা লইয়া পলাইয়া যাইতে পারে, ইহা চিন্তা করিয়া আমি তাকে কপট অকৃতজ্ঞ বলিয়া মনে মনে গালি দিতে লাগিলাম। এই বয়সেই চুরি আরম্ভ করিল, ইহার গতি কী হইবে। আমার কাছে থাকিয়া, আমাদের বাড়িতে বাস করিয়াও ইহার এমন শিক্ষা হইল কী করিয়া। সুবোধ যে টাকা চুরি করিয়া পালাইয়াছে এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। ইচ্ছা হইল, পশ্চাতে ছুটিয়া তাকে যেখানে পাই ধরিয়া আনি, এবং আপাদমস্তক একবার কষিয়া প্রহার করি।

এমন সময় আমার অন্ধকার ঘরে সুবোধ আসিয়া প্রবেশ করিল। তখন আমার এমন রাগ হইয়াছে যে চেষ্টা করিয়াও আমার কণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না।

সুবোধ বলিল, "টাকা পাই নাই।"

আমি তো সুবোধকে টাকা আনিতে বলি নাই, তবে সে কেন বলিল 'টাকা পাই নাই'। নিশ্চয় টাকা পাইয়া চুরি করিয়াছে— কোথাও লুকাইয়াছে। এই-সমস্ত ভালো-মানুষ ছেলেরাই মিট্‌মিটে শয়তান।

আমি বহু কষ্টে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলাম, "টাকা বাহির করিয়া দে!"

সেও উদ্ধত হইয়া বলিল, "না, দিব না, তুমি কী করিতে পারো করো।"

আমি আর কিছুতেই আপনাকে সামলাইতে পারিলাম না। হাতের কাছে লাঠি ছিল, সজোরে তার মাথা লক্ষ্য করিয়া মারিলাম। সে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তখন আমার ভয় হইল। নাম ধরিয়া ডাকিলাম, সে সাড়া দিল না। কাছে গিয়া যে দেখিব আমার সে শক্তি রহিল না। কোনো মতেই উঠিতে পারিলাম না। হাৎড়াইতে গিয়া দেখি, জাজিম ভিজিয়া গেছে। এ যে রক্ত! ক্রমে রক্ত ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে আমি যেখানে ছিলাম তার চারি দিক রক্তে ভিজিয়া উঠিল। আমার খোলা জানলার বাহির হইতে সন্ধ্যাতারা দেখা যাইতেছিল; আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলাম; আমার হঠাৎ কেমন মনে হইল, সন্ধ্যাতারাটি ভাইফোঁটার সেই চন্দনের ফোঁটা। সুবোধের উপর আমার এতদিনকার যে অন্যায় বিদ্বেষ ছিল সে কোথায় এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া গেল। সে যে অনুর হৃদয়ের ধন; মায়ের কোল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সে যে আমার হৃদয়ে পথ খুঁজিতে আসিয়াছিল। আমি এ কী করিলাম। এ কী করিলাম। ভগবান, আমাকে এ কী বুদ্ধি দিলে। আমার টাকার কী দরকার ছিল। আমার সমস্ত কারবার ভাসাইয়া দিয়া সংসারে কেবল এই রুগ্‌ণ বালকটির কাছে যদি ধর্ম রাখিতাম তাহা হইলে যে আমি রক্ষা পাইতাম।

ক্রমে ভয় হইতে লাগিল পাছে কেহ আসিয়া পড়ে, পাছে ধরা পড়ি। প্রাণপণে ইচ্ছা করিতে লাগিলাম, কেহ যেন না আসে, আলো যেন না আনে; এই অন্ধকার যেন মুহূর্তের জন্য না ঘোচে, যেন কাল সূর্য না ওঠে, যেন বিশ্বসংসার একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া এমনিতরো নিবিড় কালো হইয়া আমাকে আর এই ছেলেটিকে চিরদিন ঢাকিয়া রাখে।

পায়ের শব্দ শুনিলাম। মনে হইল, কেমন করিয়া পুলিস খবর পাইয়াছে। কী মিথ্যা কৈফিয়ত দিব তাড়াতাড়ি সেইটে ভাবিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মন

একেবারেই ভাবিতে পারিল না।

ধড়াস্ করিয়া দরজাটা পড়িল, ঘরে কে প্রবেশ করিল।

আমি আপাদমস্তক চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, তখনো রৌদ্র আছে। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; সুবোধ ঘরে ঢুকিতেই আমার ঘুম ভাঙিয়াছে।

সুবোধ হাটখোলা বড়োবাজার বেলেঘাটা প্রভৃতি যেখানে যেখানে প্রসন্নর দেখা পাইবার সম্ভাবনা ছিল সমস্ত দিন ধরিয়া সব জায়গায় খুঁজিয়াছে। যে করিয়াই হউক তাহাকে যে আনিতে পারে নাই, এই অপরাধের ভয়ে তার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। এত দিন পরে দেখিলাম, কী সুন্দর তার মুখখানি, কী করুণায় ভরা তার দুইটি চোখ।

আমি বলিলাম, "আয় বাবা সুবোধ, আয় আমার কোলে আয়!"

সে আমার কথা বুঝিতেই পারিল না; ভাবিল, আমি বিদ্রূপ করিতেছি। ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল এবং খানিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মুহূর্তে আমার বাতের পংগুতা কোথায় চলিয়া গেল। আমি ছুটিয়া গিয়া কোলে করিয়া তাহাকে বিছানায় আনিয়া ফেলিলাম। কুঁজায় জল ছিল, তার মুখে মাথায় ছিটা দিয়া কিছুতেই তার চৈতন্য হইল না।

ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম।

ডাক্তার আসিয়া তার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "এ যে একেবারে ক্লান্তির চরম সীমায় আসিয়াছে। কী করিয়া এমন হওয়া সম্ভব হইল।"

আমি বলিলাম, "আজ কোনো কারণে সমস্ত দিন উহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।"

তিনি বলিলেন, "এ তো এক দিনের কাজ নয়। বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার ক্ষয় চলিতেছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই।"

উত্তেজক ঔষধ ও পথ্য দিয়া ডাক্তার তার চৈতন্যসাধন করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিলেন, "বহু যত্নে যদি দৈবাৎ বাঁচিয়া যায় তো বাঁচিবে, কিন্তু ইহার শরীরে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া গেছে। বোধ করি শেষ-কয়েক দিন এ ছেলে কেবলমাত্র মনের জোরে চলাফেরা করিয়াছে।"

আমি আমার রোগ ভুলিয়া গেলাম। সুবোধকে আমার বিছানায় শোয়াইয়া দিনরাত তার সেবা করিতে লাগিলাম। ডাক্তারের যে ফি দিব এমন টাকা আমার ঘরে নাই। স্ত্রীর গহনার বাক্স খুলিলাম। সেই পান্নার কণ্ঠীটি তুলিয়া লইয়া স্ত্রীকে দিয়া বলিলাম, "এইটি তুমি রাখো।" বাকি সবগুলি লইয়া বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া আসিলাম।

কিন্তু, টাকায় তো মানুষ বাঁচে না। উহার প্রাণ যে আমি এতদিন ধরিয়া দলিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছি। যে স্নেহের অন্ন হইতে উহাকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি আজ যখন তাহা হৃদয় ভরিয়া তাহাকে আনিয়া দিলাম তখন সে আর তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। শূন্য হাতে তার মার কাছে সে ফিরিয়া গেল।

ভাদ্র ১৩২১

শেষের রাত্রি

"মাসি!"

"ঘুমোও যতীন, রাত হল যে।"

"হোক-না রাত, আমার দিন তো বেশি নেই। আমি বলছিলুম, মণিকে তার বাপের বাড়ি— ভুলে যাচ্ছি, ওর বাপ এখন কোথায়—"

"সীতারামপুরে।"

"হাঁ, সীতারামপুরে। সেইখানে মণিকে পাঠিয়ে দাও, আরও কতদিন ও রোগীর সেবা করবে! ওর শরীর তো তেমন শক্ত নয়।"

"শোনো একবার! এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে বউ বাপের বাড়ি যেতে চাইবেই বা কেন।"

"ডাক্তারেরা কী বলেছে সে কথা কি সে—"

"তা সে নাই জানল— চোখে তো দেখতে পাচ্ছে। সেদিন বাপের বাড়ি যাবার কথা যেমন একটু ইশারায় বলা অমনি বউ কেঁদে অস্থির।"

মাসির এই কথাটার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল সে কথা বলা আবশ্যক। মণির সঙ্গে সেদিন তাঁর এই প্রসঙ্গে যে আলাপ হইয়াছিল সেটা নিম্নলিখিত-মতো।

"বউ, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছু খবর এসেছে বুঝি? তোমার জাঠতুতো ভাই অনাথকে দেখলুম যেন।"

"হাঁ, মা ব'লে পাঠিয়েছেন, আসছে শুক্রবারে আমার ছোটো বোনের অন্নপ্রাশন। তাই ভাবছি—"

"বেশ তো বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিয়ে দাও, তোমার মা খুশি হবেন।"

"ভাবছি আমি যাব। আমার ছোটো বোনকে তো দেখি নি, দেখতে ইচ্ছে করে।"

"সে কী কথা। যতীনকে একলা ফেলে যাবে! ডাক্তার কী বলেছে শুনেছ তো?"

"ডাক্তার তো বলছিল, এখনো তেমন বিশেষ—"

"তা যাই বলুক, ওর এই দশা দেখে যাবে কী ক'রে।"

"আমার তিন ভাইয়ের পরে এই একটি বোন, বড়ো আদরের মেয়ে— শুনেছি ধুম ক'রে অন্নপ্রাশন হবে— আমি না গেলে মা ভারি—"

"তোমার মায়ের ভাব বাছা, আমি বুঝতে পারি নে। কিন্তু, যতীনের এই সময়ে তুমি যদি যাও তোমার বাবা রাগ করবেন, সে আমি ব'লে রাখছি।"

"তা জানি। তোমাকে এক লাইন লিখে দিতে হবে মাসি, যে, কোনো ভাবনার কথা নেই— আমি গেলে বিশেষ কোনো—"

"তুমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই সে কি জানি নে। কিন্তু, তোমার বাপকে যদি লিখতেই হয়, আমার মনে যা আছে সব খুলেই লিখব।"

"আচ্ছা বেশ— তুমি লিখো না। আমি ওঁকে গিয়ে বললেই উনি—"

"দেখো বউ, অনেক সয়েছি— কিন্তু, এই নিয়ে যদি তুমি যতীনের কাছে যাও

কিছুতেই সইব না। তোমার বাবা তোমাকে ভালোরকমই চেনেন, তাঁকে ভোলাতে পারবে না।"

এই বলিয়া মাসি চলিয়া আসিলেন। মণি খানিক ক্ষণের জন্য রাগ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

পাশের বাড়ি হইতে সই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কী সই, গোসা কেন।"

"দেখো দেখি ভাই, আমার একমাত্র বোনের অন্নপ্রাশন—এরা আমাকে যেতে দিতে চায় না।"

"ওমা, সে কী কথা। যাবে কোথায়। স্বামী যে রোগে শুষছে!"

"আমি তো কিছুই করি নে, করতে পারিও নে। বাড়িতে সবাই চুপচাপ, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এমন ক'রে আমি থাকতে পারি নে, তা বলছি।"

"তুমি ধন্যি মেয়েমানুষ যাহোক!"

"তা, আমি ভাই, তোমাদের মতো লোক-দেখানে ভান করতে পারি নে। পাছে কেউ কিছু মনে করে ব'লে মুখ গুজড়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা আমার কর্ম নয়।"

"তা, কী করবে শুনি।"

"আমি যাবই, আমাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না।"

"ইস্, তেজ দেখে আর বাঁচি নে!—চললুম, আমার কাজ আছে।"

২

বাপের বাড়ি যাইবার প্রসঙ্গে মণি কাঁদিয়াছে—এই খবরে যতীন বিচলিত হইয়া বালিশটাকে পিঠের কাছে টানিয়া তুলিল এবং একটু উঠিয়া হেলান দিয়া বসিল। বলিল, "মাসি, এই জানলাটা আর একটু খুলে দাও, আর এই আলোটা এ ঘরে দরকার নেই।"

জানলা খুলিতেই স্তব্ধ রাত্রি অনন্ত তীর্থপথের পথিকের মতো রোগীর দরজার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কত যুগের কত মৃত্যুকালের সাক্ষী ঐ তারাগুলি যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন এই বৃহৎ অন্ধকারের পটের উপর তাহার মণির মুখখানি দেখিতে পাইল। সেই মুখের ডাগর দুটি চক্ষু মোটা মোটা জলের ফোঁটায় ভরা—সে জল আর শেষ হইল না, চিরকালের জন্য ভরিয়া রহিল।

অনেক ক্ষণ সে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া মাসি নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাবিলেন, যতীনের ঘুম আসিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "মাসি, তোমরা কিন্তু বরাবর মনে করে এসেছ মণির মন চঞ্চল, আমাদের ঘরে ওর মন বসে নি। কিন্তু, দেখো—"

"না বাবা, ভুল বুঝেছিলুম—সময় হলেই মানুষকে চেনা যায়।"

"মাসি!"

"যতীন, ঘুমোও বাবা।"

"আমাকে একটু ভাবতে দাও, একটু কথা কইতে দাও। বিরক্ত হোয়ো না, মাসি।"

"আচ্ছা, বলো বাবা।"

"আমি বলছিলুম, মানুষের নিজের মন নিজে বুঝতেই কত সময় লাগে। একদিন যখন মনে করতুম আমরা কেউ মণির মন পেলুম না, তখন চুপ করে সহ্য করেছি। তোমরা তখন—"

"না বাবা, অমন কথা বোলো না— আমিও সহ্য করেছি।"

"মন তো মাটির ঢেলা নয়, কুড়িয়ে নিলেই তো নেওয়া যায় না। আমি জানতুম, মণি নিজের মন এখনো বোঝে নি; কোনো-একটা আঘাতে যেদিন বুঝবে সেদিন আর—"

"ঠিক কথা, যতীন।"

"সেইজন্যেই ওর ছেলেমানুষিতে কোনোদিন কিছু মনে করি নি।"

মাসি এ কথার কোনো উত্তর করিলেন না; কেবল মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কতদিন তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, যতীন বারান্দায় আসিয়া রাত কাটাইয়াছে, বৃষ্টির ছাট আসিয়াছে তবু ঘরে যায় নাই। কতদিন সে মাথা ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া; একান্ত ইচ্ছা, মণি আসিয়া মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দেয়। মণি তখন সখীদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার আয়োজন করিতেছে। তিনি যতীনকে পাখা করিতে আসিয়াছেন, সে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই বিরক্তির মধ্যে কত বেদনা তাহা তিনি জানিতেন। কতবার তিনি যতীনকে বলিতে চাহিয়াছেন, 'বাবা, তুমি ঐ মেয়েটার দিকে অত বেশি মন দিয়ো না— ও একটু চাহিতে শিখুক— মানুষকে একটু কাঁদানো চাই।' কিন্তু এ-সব কথা বলিবার নহে, বলিলেও কেহ বোঝে না। যতীনের মনে নারীদেবতার একটি পীঠস্থান ছিল, সেইখানে সে মণিকে বসাইয়াছে। সেই তীর্থক্ষেত্রে নারীর অমৃতপাত্র চিরদিন তাহার ভাগ্যে শূন্য থাকিতে পারে, এ কথা মনে করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। তাই পূজা চলিতেছিল, অর্ঘ্য ভরিয়া উঠিতেছিল. বরলাভের আশা পরাভব মানিতেছিল না।

মাসি যখন আবার ভাবিতেছিলেন যতীন ঘুমাইয়াছে এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "আমি জানি, তুমি মনে করেছিলে, মণিকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারি নি। তাই তার উপর রাগ করতে। কিন্তু, মাসি, সুখ জিনিসটা ঐ তারাগুলির মতো— সমস্ত অন্ধকার লেপে রাখে না, মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে যায়। জীবনে কত ভুল করি, কত ভুল বুঝি, তবু তার ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জ্বলে নি। কোথা থেকে আমার মনের ভিতরটি আজ এমন আনন্দে ভরে উঠেছে!"

মাসি আস্তে আস্তে যতীনের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া যে জল পড়িতেছিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

"আমি ভাবছি মাসি, ওর অল্প বয়স, ও কী নিয়ে থাকবে।"

"অল্প বয়স কিসের যতীন? এ তো ওর ঠিক বয়স। আমরাও তো বাছা, অল্প বয়সেই দেবতাকে সংসারের দিকে ভাসিয়ে অন্তরের মধ্যে বসিয়েছি— তাতে ক্ষতি হয়েছে কী। তাও বলি, সুখেরই বা এত বেশি দরকার কিসের।"

"মাসি, মণির মনটি যেই জাগবার সময় হল অমনি আমি—"

"ভাব' কেন, যতীন। মন যদি জাগে তবে সেই কি কম ভাগ্য।"

হঠাৎ অনেক দিনের শোনা একটা বাউলের গান যতীনের মনে পড়িয়া গেল—

ওরে মন, যখন জাগলি না রে
তখন মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙল রে ঘুম,
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে॥

"মাসি, ঘড়িতে ক'টা বেজেছে।"

"ন'টা বাজবে।"

"সবে ন'টা? আমি ভাবছিলুম বুঝি দুটো তিনটে কি ক'টা হবে। সন্ধ্যার পর থেকেই আমার দুপুর রাত আরম্ভ হয়। তবে তুমি আমার ঘুমের জন্যে অত ব্যস্ত হয়েছিলে কেন।"

"কালও সন্ধ্যার পর এইরকম কথা কইতে কইতে কত রাত পর্যন্ত তোমার আর ঘুম এল না, তাই আজ তোমাকে সকাল-সকাল ঘুমোতে বলছি।"

"মণি কি ঘুমিয়েছে।"

"না, সে তোমার জন্যে মসুরির ডালের সুপ তৈরি ক'রে তবে ঘুমোতে যায়।"

"বলো কী মাসি, মণি কি তবে—"

"সেই তো তোমার জন্যে সব পথ্যি তৈরি করে দেয়। তার কি বিশ্রাম আছে।"

"আমি ভাবতুম, মণি বুঝি—"

"মেয়েমানুষের কি আর এ-সব শিখতে হয়। দায়ে পড়লেই আপনি করে নেয়।"

"আজ দুপুরবেলা মৌরলা মাছের যে ঝোল হয়েছিল তাতে বড়ো সুন্দর একটি স্বাদ ছিল। আমি ভাবছিলুম তোমারই হাতের তৈরি।"

"কপাল আমার! মণি কি আমাকে কিছু করতে দেয়। তোমার গামছা তোয়ালে নিজের হাতে কেচে শুকিয়ে রাখে। জানে যে, কোথাও কিছু নোংরা তুমি দেখতে পার না। তোমার বাইরের বৈঠকখানা যদি একবার দেখ তবে দেখতে পাবে, মণি দুবেলা সমস্ত ঝেড়ে মুছে কেমন তক্‌তকে ক'রে রেখে দিয়েছে; আমি যদি তোমার এ ঘরে ওকে সর্বদা আসতে দিতুম তা হলে কি আর রক্ষা থাকত। ও তো তাই চায়।"

"মণির শরীর বুঝি—"

"ডাক্তাররা বলে, রোগীর ঘরে ওকে সর্বদা আনাগোনা করতে দেওয়া কিছু নয়। ওর মন বড়ো নরম কি না, তোমার কষ্ট দেখলে দুদিনে যে শরীর ভেঙে পড়বে।"

"মাসি, ওকে তুমি ঠেকিয়ে রাখ কী ক'রে।"

"আমাকে ও বড্ড মানে বলেই পারি। তবু বারবার গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হয়—ঐ আমার আর-এক কাজ হয়েছে।"

আকাশের তারাগুলি যেন করুণাবিগলিত চোখের জলের মতো জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতে লাগিল। যে জীবন আজ বিদায় লইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যতীন তাহাকে মনে মনে কৃতজ্ঞতার প্রণাম করিল—এবং সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া অন্ধকারের ভিতর হইতে যে দক্ষিণ হাত বাড়াইয়া দিয়াছে যতীন স্নিগ্ধ বিশ্বাসের সহিত তাহার উপরে

আপনার রোগক্লান্ত হাতটি রাখিল।

একবার নিশ্বাস ফেলিয়া, একটুখানি উস্‌খুস করিয়া যতীন বলিল, "মাসি, মণি যদি জেগেই থাকে তা হলে একবার যদি তাকে—"

"এখনি ডেকে দিচ্ছি, বাবা।"

"আমি বেশি ক্ষণ তাকে এ ঘরে রাখতে চাই নে— কেবল পাঁচ মিনিট— দুটো-একটা কথা যা বলবার আছে—"

মাসি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মণিকে ডাকিতে আসিলেন। এ দিকে যতীনের নাড়ী দ্রুত চলিতে লাগিল। যতীন জানে, আজ পর্যন্ত সে মণির সঙ্গে ভালো করিয়া কথা জমাইতে পারে নাই। দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা, এক সঙ্গে আলাপ চলা বড়ো কঠিন। মণি তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে অনর্গল বকিতেছে হাসিতেছে, দূর হইতে তাহাই শুনিয়া যতীনের মন কতবার ঈর্ষায় পীড়িত হইয়াছে। যতীন নিজেকেই দোষ দিয়াছে— সে কেন অমন সামান্য যাহা-তাহা লইয়া কথা কহিতে পারে না। পারে না যে তাহাও তো নহে, নিজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যতীন সামান্য বিষয় লইয়াই কি আলাপ করে না। কিন্তু, পুরুষের যাহা-তাহা তো মেয়েদের যাহা-তাহার সঙ্গে ঠিক মেলে না। বড়ো কথা একলাই একটানা বলিয়া যাওয়া চলে, অন্য পক্ষ মন দিল কি না খেয়াল না করিলেই হয়; কিন্তু তুচ্ছ কথায় নিয়ত দুই পক্ষের যোগ থাকা চাই। বাঁশি একাই বাজিতে পারে, কিন্তু দুইয়ের মিল না থাকিলে করতালের খচমচ জমে না। এইজন্য কত সন্ধ্যাবেলায় যতীন মণির সঙ্গে যখন খোলা বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে, দুটো-চারটে টানাবোনা কথার পরেই কথার সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া ফাঁক হইয়া গেছে; তাহার পরে সন্ধ্যার নীরবতা যেন লজ্জায় মরিতে চাহিয়াছে। যতীন বুঝিতে পারিয়াছে, মণি পালাইতে পারিলে বাঁচে; মনে মনে কামনা করিয়াছে, এখনই কোনো-একজন তৃতীয় ব্যক্তি যেন আসিয়া পড়ে। কেননা, দুই জনে কথা কহা কঠিন, তিন জনে সহজ।

মণি আসিলে আজ কেমন করিয়া কথা আরম্ভ করিবে যতীন তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে গেলে কথাগুলো কেমন অস্বাভাবিক-রকম বড়ো হইয়া পড়ে— সে-সব কথা চলিবে না। যতীনের আশঙ্কা হইতে লাগিল আজকের রাত্রের পাঁচ মিনিটও ব্যর্থ হইবে। অথচ, তাহার জীবনের এমনতরো নিরালা পাঁচ মিনিট আর ক'টাই বা বাকি আছে।

৩

"একি বউ, কোথাও যাচ্ছ নাকি।"

"সীতারামপুরে যাব।"

"সে কী কথা। কার সঙ্গে যাবে।"

"অনাথ নিয়ে যাচ্ছে।"

"লক্ষ্মী মা আমার, তুমি যেয়ো, আমি তোমাকে বারণ করব না— কিন্তু আজ নয়।"

"টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ্‌ করা হয়ে গেছে।"

"তা হোক, ও লোকসান গায়ে সইবে—তুমি কাল সকালেই চলে যেয়ো—আজ যেয়ো না।"

"মাসি, আমি তোমাদের তিথি বার মানি নে, আজ গেলে দোষ কী।"

"যতীন তোমাকে ডেকেছে, তোমার সঙ্গে তার একটু কথা আছে।"

"বেশ তো, এখনো সময় আছে—আমি তাঁকে বলে আসছি।"

"না, তুমি বলতে পারবে না যে যাচ্ছ।"

"তা বেশ, কিছু বলব না, কিন্তু আমি দেরি করতে পারব না। কালই অন্নপ্রাশন—আজ যদি না যাই তো চলবে না।"

"আমি জোড়হাত করছি বউ, আমার কথা আজ এক দিনের মতো রাখো। আজ মন একটু শান্ত করে যতীনের কাছে এসে বোসো—তাড়াতাড়ি কোরো না।"

"তা, কী করব বলো, গাড়ি তো আমার জন্যে বসে থাকবে না। অনাথ চলে গেছে—দশ মিনিট পরে সে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। এই বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা সেরে আসি গে।"

"না, তবে থাক্—তুমি যাও। এমন করে তার কাছে যেতে দেব না। ওরে অভাগিনী, তুই যাকে এত দুঃখ দিলি সে তো সব বিসর্জন দিয়ে আজ বাদে কাল চলে যাবে—কিন্তু, যত দিন বেঁচে থাকবি এ দিনের কথা তোকে চিরদিন মনে রাখতে হবে—ভগবান আছেন, ভগবান আছেন, সে কথা একদিন বুঝবি।"

"মাসি, তুমি অমন ক'রে শাপ দিয়ো না বলছি।"

"ওরে বাপ রে, আর কেন বেঁচে আছিস রে বাপ! পাপের যে শেষ নেই—আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলুম না।"

মাসি একটু দেরি করিয়া রোগীর ঘরে গেলেন। আশা করিলেন যতীন ঘুমাইয়া পড়িবে। কিন্তু, ঘরে ঢুকিতেই দেখিলেন, বিছানার উপর যতীন নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল। মাসি বললেন, "এই এক কাণ্ড ক'রে বসেছে।"

"কী হয়েছে। মণি এল না? এত দেরি করলে কেন, মাসি।"

"গিয়ে দেখি, সে তোমার দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে ব'লে কান্না। আমি বলি, হয়েছে কি, আরও তো দুধ আছে। কিন্তু, অসাবধান হয়ে তোমার খাবার দুধ পুড়িয়ে ফেলেছে, বউয়ের এ লজ্জা আর কিছুতেই যায় না। আমি তাকে অনেক ঠাণ্ডা ক'রে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি। আজ আর তাকে আনলুম না। সে একটু ঘুমোক।"

মণি আসিল না বলিয়া যতীনের বুকের মধ্যে যেমন বাজিল তেমনি সে আরামও পাইল। তাহার মনে আশঙ্কা ছিল যে, পাছে মণি সশরীরে আসিয়া মণির ধ্যান-মাধুরীটুকুর প্রতি জুলুম করিয়া যায়। কেননা, তাহার জীবনে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। দুধ পুড়াইয়া ফেলিয়া মণির কোমল হৃদয় অনুতাপে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহারই রসটুকুতে তাহার হৃদয় ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

"মাসি!"

"কী বাবা।"

"আমি বেশ জানছি, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু, আমার মনে কোনো খেদ নেই। তুমি আমার জন্যে শোক কোরো না।"

"না বাবা, আমি শোক করব না। জীবনেই যে মঙ্গল আর মরণে যে নয় এ কথা আমি মনে করি নে।"

"মাসি, তোমাকে সত্য বলছি, মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্ছে।"

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া যতীন দেখিতেছিল, তাহার মণিই আজ মৃত্যুর বেশ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে আজ অক্ষয় যৌবনে পূর্ণ—সে গৃহিণী, সে জননী; সে রূপসী, সে কল্যাণী। তাহারই এলোচুলের উপরে ঐ আকাশের তারাগুলি লক্ষ্মীর স্বহস্তের আশীর্বাদের মালা। তাহাদের দুজনের মাথার উপরে এই অন্ধকারের মঙ্গলবস্ত্রখানি মেলিয়া ধরিয়া আবার যেন নূতন করিয়া শুভদৃষ্টি হইল। রাত্রির এই বিপুল অন্ধকার ভরিয়া গেল মণির অনিমেষ প্রেমের দৃষ্টিপাতে। এই ঘরের বধূ মণি, এই একটুখানি মণি, আজ বিশ্বরূপ ধরিল; জীবনমরণের সংগমতীর্থে ঐ নক্ষত্রবেদীর উপরে সে বসিল; নিস্তব্ধ রাত্রি মঙ্গলঘটের মতো পুণ্য-ধারায় ভরিয়া উঠিল। যতীন জোড়হাত করিয়া মনে মনে কহিল, 'এত দিনের পর ঘোমটা খুলিল, এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আবরণ ঘুচিল। অনেক কাঁদাইয়াছ—সুন্দর, হে সুন্দর, তুমি আর ফাঁকি দিতে পারিবে না।

৪

"কষ্ট হচ্ছে মাসি, কিন্তু যত কষ্ট মনে করছ তার কিছুই নয়। আমার সঙ্গে আমার কষ্টের ক্রমশই যেন বিচ্ছেদ হয়ে আসছে। বোঝাই নৌকার মতো এতদিন সে আমার জীবন-জাহাজের সঙ্গে বাঁধা ছিল; আজ যেন বাঁধন কাটা পড়েছে, সে আমার সব বোঝা নিয়ে দূরে ভেসে চলল। এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাকে যেন আর আমার ব'লে মনে হচ্ছে না—এ দুদিন মণিকে একবারও দেখি নি, মাসি।"

"পিঠের কাছে আর-একটা বালিশ দেব কি যতীন।"

"আমার মনে হচ্ছে মাসি, মণিও যেন চলে গেছে। আমার বাঁধন-ছেঁড়া দুঃখের নৌকাটির মতো।"

"বাবা, একটু বেদানার রস খাও, তোমার গলা শুকিয়ে আসছে।"

"আমার উইলটা কাল লেখা হয়ে গেছে—সে কি আমি তোমাকে দেখিয়েছি—ঠিক মনে পড়ছে না।"

"আমার দেখবার দরকার নেই, যতীন।"

"মা যখন মারা যান আমার তো কিছুই ছিল না। তোমার খেয়ে তোমার হাতে আমি মানুষ। তাই বলছিলুম—"

"সে আবার কী কথা। তোমার তো কেবল এই একখানা বাড়ি আর সামান্য কিছু সম্পত্তি ছিল। বাকি সবই তো তোমার নিজের রোজগার।"

"কিন্তু, এই বাড়িটা—"

"কিসের বাড়ি আমার! কত দালান তুমি বাড়িয়েছ, আমার সেটুকু কোথায় আছে খুঁজেই পাওয়া যায় না।"

"মণি তোমাকে ভিতরে ভিতরে খুব—"

"সে কি জানি নে যতীন। তুই এখন ঘুমো।"

"আমি মণিকে সব লিখে দিলুম বটে, কিন্তু তোমারই সব রইল মাসি। ও তো তোমাকে কখনো অমান্য করবে না।"

"সেজন্য অত ভাবছ কেন, বাছা।"

"তোমার আশীর্বাদেই আমার সব, তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনো-দিন মনে কোরো না—"

"ও কী কথা যতীন। তোমার জিনিস তুমি মণিকে দিয়েছ ব'লে আমি মনে করব! আমার এমনি পোড়া মন! তোমার জিনিস ওর নামে লিখে দিয়ে যেতে পারছ বলে তোমার যে সুখ সেই তো আমার সকল সুখের বেশি, বাপ।"

"কিন্তু. তোমাকেও আমি—"

"দেখ্ যতীন, এইবার আমি রাগ করব। তুই চলে যাবি, আর তুই আমাকে টাকা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে যাবি!"

"মাসি, টাকার চেয়ে আরও বড়ো যদি কিছু তোমাকে—"

"দিয়েছিস যতীন, ঢের দিয়েছিস। আমার শূন্য ঘর ভ'রে ছিলি, এ আমার অনেক জন্মের ভাগ্য। এতদিন তো বুক ভ'রে পেয়েছি, আজ আমার পাওনা যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তো নালিশ করব না। দাও, সব লিখে দাও, লিখে দাও—বাড়িঘর, জিনিসপত্র, ঘোড়াগাড়ি, তালুক-মুলুক—যা আছে সব মণির নামে লিখে দাও—এ-সব বোঝা আমার সইবে না।"

"তোমার ভোগে রুচি নেই—কিন্তু, মণির বয়স অল্প, তাই—"

"ও কথা বলিস নে, ও কথা বলিস নে। ধনসম্পদ দিতে চাস দে, কিন্তু ভোগ করা—"

"কেন ভোগ করবে না মাসি।"

"না গো না, পারবে না, পারবে না! আমি বলছি, ওর মুখে রুচবে না! গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে, কিছুতে কোনো রস পাবে না।"

যতীন চুপ করিয়া রহিল। তাহার অভাবে সংসারটা মণির কাছে একেবারে বিস্বাদ হইয়া যাইবে এ কথা সত্য কি মিথ্যা, সুখের কি দুঃখের, তাহা সে যেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। আকাশের তারা যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া কানে কানে বলিল, 'এমনিই বটে—আমরা তো হাজার হাজার বছর হইতে দেখিয়া আসিলাম, সংসার-জোড়া এই-সমস্ত আয়োজন এত বড়োই ফাঁকি।'

যতীন গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দেবার মতো জিনিস তো আমরা কিছুই দিয়ে যেতে পারি নে।"

"কম কী দিয়ে যাচ্ছ বাছা। এই ঘরবাড়ি-টাকাকড়ির ছল করে তুমি ওকে যে কী দিয়ে গেলে তার মূল্য ও কি কোনোদিন বুঝবে না। যা তুমি দিয়েছ তাই মাথা পেতে নেবার শক্তি বিধাতা ওকে দিন, এই আশীর্বাদ ওকে করি।"

"আর-একটু বেদানার রস দাও, আমার গলা শুকিয়ে এসেছে। মণি কি কাল এসেছিল—আমার ঠিক মনে পড়ছে না।"

"এসেছিল। তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। শিয়রের কাছে বসে বসে অনেক ক্ষণ

বাতাস ক'রে তার পরে ধোবাকে তোমার কাপড় দিতে গেল।"

"আশ্চর্য! বোধ হয় আমি ঠিক সেই সময়ে স্বপ্ন দেখছিলুম, যেন মণি আমার ঘরে আসতে চাচ্ছে—দরজা অল্প একটু ফাঁক হয়েছে—ঠেলাঠেলি করছে, কিন্তু কিছুতেই সেইটুকুর বেশি আর খুলছে না। কিন্তু, মাসি, তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করছ—ওকে দেখতে দাও যে আমি মরছি—নইলে মৃত্যুকে হঠাৎ সইতে পারবে না।"

"বাবা, তোমার পায়ের উপরে এই পশমের শালটা টেনে দিই—পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

"না মাসি, গায়ের উপর কিছু দিতে ভালো লাগছে না।"

"জানিস যতীন? এই শালটা মণির তৈরি, এতদিন রাত জেগে জেগে সে তোমার জন্যে তৈরি করছিল। কাল শেষ করেছে।"

যতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একটু নাড়াচাড়া করিল। মনে হইল, পশমের কোমলতা যেন মণির মনের জিনিস; সে যে যতীনকে মনে করিয়া রাত জাগিয়া এইটি বুনিয়াছে, তার মনের সেই প্রেমের ভাবনাটি ইহার সঙ্গে গাঁথা পড়িয়াছে। কেবল পশম দিয়া নহে, মণির কোমল আঙুলের স্পর্শ দিয়া ইহা বোনা। তাই মাসি যখন শালটা তাহার পায়ের উপর টানিয়া দিলেন তখন তাহার মনে হইল, মণিই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া তাহার পদসেবা করিতেছে।

"কিন্তু মাসি, আমি তো জানতুম মণি শেলাই করতে পারে না—সে শেলাই করতে ভালোই বাসে না।"

"মন দিলে শিখতে কতক্ষণ লাগে। তাকে দেখিয়ে দিতে হয়েছে—ওর মধ্যে অনেক ভুল শেলাইও আছে।"

"তা, ভুল থাক্-না। ও তো প্যারিস এক্‌জিবিশনে পাঠানো হবে না—ভুল শেলাই দিয়ে আমার পা ঢাকা বেশ চলবে।"

শেলাইয়ে যে অনেক ভুল-ত্রুটি আছে সেই কথা মনে করিয়াই যতীনের আরও বেশি আনন্দ হইল। বেচারা মণি পারে না, জানে না, বারবার ভুল করিতেছে, তবু ধৈর্য ধরিয়া রাত্রির পর রাত্রি শেলাই করিয়া চলিয়াছে—এই কল্পনাটি তাহার কাছে বড়ো করুণ, বড়ো মধুর লাগিল। এই ভুলে-ভরা শালটাকে আবার সে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া লইল।

"মাসি, ডাক্তার বুঝি নীচের ঘরে?"

"হাঁ যতীন, আজ রাত্রে থাকবেন।"

"কিন্তু, আমাকে যেন মিছামিছি ঘুমের ওষুধ দেওয়া না হয়। দেখেছ তো ওতে আমার ঘুম হয় না, কেবল কষ্ট বাড়ে। আমাকে ভালো ক'রে জেগে থাকতে দাও। জান মাসি? বৈশাখ-দ্বাদশীর রাত্রে আমাদের বিয়ে হয়েছিল—কাল সেই দ্বাদশী আসছে—কাল সেইদিনকার রাত্রের সব তারা আকাশে জ্বালানো হবে। মণির বোধ হয় মনে নেই—আমি তাকে সেই কথাটি আজ মনে করিয়ে দিতে চাই; কেবল তাকে তুমি দু মিনিটের জন্যে ডেকে দাও। চুপ করে রইলে কেন। বোধ হয় ডাক্তার তোমাদের বলেছে আমার শরীর দুর্বল, এখন যাতে আমার মনে কোনো—কিন্তু, আমি তোমাকে

নিশ্চয় বলছি মাসি, আজ রাত্রে তার সঙ্গে দুটি কথা কয়ে নিতে পারলে আমার মন খুব শান্ত হয়ে যাবে—তা হলে বোধ হয় আর ঘুমোবার ওষুধ দিতে হবে না। আমার মন তাকে কিছু বলতে চাচ্ছে ব'লেই এই দু রাত্রি আমার ঘুম হয় নি।— মাসি, তুমি অমন করে কেঁদো না। আমি বেশ আছি, আমার মন আজ যেমন ভরে উঠেছে আমার জীবনে এমন আর কখনোই হয় নি। সেইজন্যই আমি মণিকে ডাকছি। মনে হচ্ছে, আজ যেন আমার ভরা হৃদয়টি তার হাতে দিয়ে যেতে পারব। তাকে অনেক দিন অনেক কথা বলতে চেয়েছিলুম, বলতে পারি নি, কিন্তু আর এক মুহূর্ত দেরি করা নয়, তাকে এখনি ডেকে দাও—এর পরে আর সময় পাব না—না মাসি, তোমার ঐ কান্না আমি সইতে পারি নে। এতদিন তো শান্ত ছিলে, আজ কেন তোমার এমন হল।"

"ওরে যতীন, ভেবেছিলুম আমার সব কান্না ফুরিয়ে গেছে—কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখনো বাকি আছে—আজ আর পারছি নে।"

"মণিকে ডেকে দাও—তাকে ব'লে দেব, কালকের রাতের জন্যে যেন—"

"যাচ্ছি, বাবা। শম্ভু দরজার কাছে রইল, যদি কিছু দরকার হয় ওকে ডেকো।"

মাসি মণির শোবার ঘরে গিয়া মেজের উপর বসিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "ওরে, আয়— একবার আয়—আয় রে রাক্ষসী, যে তোকে তার সব দিয়েছে তার শেষ কথাটি রাখ্— সে মরতে বসেছে, তাকে আর মারিস নে।"

যতীন পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "মণি!"

"না, আমি শম্ভু। আমাকে ডাকছিলেন?"

"একবার তোর বউঠাকরুনকে ডেকে দে।"

"কাকে?"

"বউঠাকরুনকে।"

"তিনি তো এখনো ফেরেন নি।"

"কোথায় গেছেন?"

"সীতারামপুরে।"

"আজ গেছেন?"

"না, আজ তিন দিন হল গেছেন।"

ক্ষণকালের জন্য যতীনের সর্বাঙ্গ ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া আসিল—সে চোখে অন্ধকার দেখিল। এতক্ষণ বালিশে ঠেসান দিয়া বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল। পায়ের উপর সেই পশমের শাল ঢাকা ছিল, সেটা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

অনেক ক্ষণ পরে মাসি যখন আসিলেন যতীন মণির কথা কিছুই বলিল না। মাসি ভাবিলেন, সে কথা উহার মনে নাই।

হঠাৎ যতীন এক সময়ে বলিয়া উঠিল, "মাসি, তোমাকে কি আমার সেদিনকার স্বপ্নের কথা বলেছি।"

"কোন্ স্বপ্ন।"

"মণি যেন আমার ঘরে আসবার জন্য দরজা ঠেলছিল—কোনোমতেই দরজা এতটুকুর বেশি ফাঁক হল না, সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই ঢুকতে পারল না। মণি চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। তাকে অনেক ক'রে ডাকলুম, কিন্তু এখানে তার জায়গা হল না।"

মাসি কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, 'যতীনের জন্য মিথ্যা দিয়া যে একটুখানি স্বর্গ রচিতেছিলাম সে আর টিঁকিল না। দুঃখ যখন আসে তাহাকে স্বীকার করাই ভালো—প্রবঞ্চনার দ্বারা বিধাতার মার ঠেকাইবার চেষ্টা করা কিছু নয়।'

"মাসি, তোমার কাছে যে স্নেহ পেয়েছি সে আমার জন্মজন্মান্তরের পাথেয়, আমার সমস্ত জীবন ভ'রে নিয়ে চললুম। আর-জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার মেয়ে হয়ে জন্মাবে, আমি তোমাকে বুকে করে মানুষ করব।"

"বলিস কী যতীন, আবার মেয়ে হয়ে জন্মাব? নাহয়, তোরই কোলে ছেলে হয়েই জন্ম হবে—সেই কামনাই কর্-না।"

"না, না, ছেলে না। ছেলেবেলায় তুমি যেমন সুন্দরী ছিলে তেমনি অপরূপ সুন্দরী হয়েই তুমি আমার ঘরে আসবে। আমার মনে আছে, আমি তোমাকে কেমন করে সাজাব।"

"আর বকিস্ নে যতীন, বকিস্ নে—একটু ঘুমো।"

"তোমার নাম দেব লক্ষ্মীরানী।"

"ও তো একেলে নাম হল না।"

"না, একেলে নাম না। মাসি, তুমি আমার সাবেক-কেলে—সেই সাবেক কাল নিয়েই তুমি আমার ঘরে এসো।"

"তোর ঘরে আমি কন্যাদায়ের দুঃখ নিয়ে আসব, এ কামনা আমি তো করতে পারি নে।"

"মাসি, তুমি আমাকে দুর্বল মনে কর?—আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাতে চাও?"

"বাছা, আমার যে মেয়েমানুষের মন, আমিই দুর্বল—সেইজন্যেই আমি বড়ো ভয়ে ভয়ে তোকে সকল দুঃখ থেকে চিরদিন বাঁচাতে চেয়েছি। কিন্তু, আমার সাধ্য কী আছে। কিছুই করতে পারি নি।"

"মাসি, এ জীবনের শিক্ষা আমি এ জীবনে খাটাবার সময় পেলুম না। কিন্তু, এ সমস্তই জমা রইল, আসছে বারে মানুষ যে কী পারে তা আমি দেখাব। চিরটা দিন নিজের দিকে তাকিয়ে থাকা যে কী ফাঁকি তা আমি বুঝেছি।"

"যাই বল বাছা, তুমি নিজে কিছু নাও নি, পরকেই সব দিয়েছ।"

"মাসি, একটা গর্ব আমি করব, আমি সুখের উপরে জবর্দস্তি করি নি—কোনোদিন এ কথা বলি নি, যেখানে আমার দাবি আছে সেখানে আমি জোর খাটাব। যা পাই নি তা কাড়াকাড়ি করি নি। আমি সেই জিনিস চেয়েছিলুম যার উপরে কারও স্বত্ব নেই—সমস্ত জীবন হাতজোড় ক'রে অপেক্ষাই করলুম; মিথ্যাকে চাই নি ব'লেই এতদিন এমন ক'রে বসে থাকতে হল—এইবার সত্য হয়তো দয়া করবেন। ও কে ও—মাসি, ও কে।"

"কই, কেউ তো না যতীন।"

"মাসি, তুমি একবার ও ঘরটা দেখে এসো গে, আমি যেন—"

"না বাছা, কাউকে তো দেখলুম না।"

"আমি কিন্তু স্পষ্ট যেন—"

"কিছু না, যতীন—ঐ যে ডাক্তারবাবু এসেছেন।"

"দেখুন, আপনি ওঁর কাছে থাকলে উনি বড়ো বেশি কথা কন। কয়রাত্রি এমনি ক'রে তো জেগেই কাটালেন। আপনি শুতে যান, আমার সেই লোকটি এখানে থাকবে।"

"না মাসি, না, তুমি যেতে পাবে না।"

"আচ্ছা বাছা, আমি নাহয় ঐ কোণটাতে গিয়ে বসছি।"

"না, না, তুমি আমার পাশেই বসে থাকো—আমি তোমার এ হাত কিছুতেই ছাড়ছি নে—শেষ পর্যন্ত না। আমি যে তোমারই হাতের মানুষ, তোমারই হাত থেকে ভগবান আমাকে নেবেন।"

"আচ্ছা বেশ, কিন্তু আপনি কথা কবেন না যতীনবাবু। সেই ওষুধটা খাওয়াবার সময় হল—"

"সময় হল? মিথ্যা কথা। সময় পার হয়ে গেছে—এখন ওষুধ খাওয়ানো কেবল ফাঁকি দিয়ে সান্ত্বনা করা। আমার তার কোনো দরকার নেই। আমি মরতে ভয় করি নে। মাসি, যমের চিকিৎসা চলছে, তার উপরে আবার সব ডাক্তার জড়ো করেছ কেন—বিদায় করে দাও, সব বিদায় করে দাও। এখন আমার একমাত্র তুমি—আর আমার কাউকে দরকার নেই—কাউকে না—কোনো মিথ্যাকেই না।"

"আপনার এই উত্তেজনা ভালো হচ্ছে না।"

"তা হলে তোমরা যাও, আমাকে উত্তেজিত কোরো না।—মাসি, ডাক্তার গেছে? আচ্ছা, তা হলে তুমি এই বিছানায় উঠে বোসো—আমি তোমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শুই।"

"আচ্ছা, শোও বাবা, লক্ষ্মীটি, একটু ঘুমোও।"

"না মাসি, ঘুমোতে বোলো না—ঘুমোতে ঘুমোতে হয়তো আর ঘুম ভাঙবে না। এখনো আর-একটু আমার জেগে থাকবার দরকার আছে।—তুমি শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? ঐ যে আসছে! এখনই আসবে।"

৫

"বাবা যতীন, একটু চেয়ে দেখো—ঐ যে এসেছে। একবারটি চাও।"

"কে এসেছে। স্বপ্ন?"

"স্বপ্ন নয় বাবা, মণি এসেছে—তোমার শ্বশুর এসেছেন।"

"তুমি কে।"

"চিনতে পারছ না বাবা, ঐ তো তোমার মণি।"

"মণি, সেই দরজাটা কি সব খুলে গিয়েছে।"

"সব খুলেছে, বাপ আমার, সব খুলেছে।"

"না মাসি, আমার পায়ের উপর ও শাল নয়, ও শাল নয়! ও শাল মিথ্যে, ও শাল ফাঁকি!"

"শাল নয় যতীন। বউ তোর পায়ের উপর পড়েছে—ওর মাথায় হাত রেখে একটু আশীর্বাদ কর্।—অমন ক'রে কাঁদিস্ নে বউ, কাঁদবার সময় আসছে—এখন একটুখানি চুপ কর্।"

আশ্বিন ১৩২১

অপরিচিতা

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে যতগুলা পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন এমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এক কালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না আমাকেও ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ— বোধ করি, সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়ো। কিন্তু, ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডূষও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো-কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে— বস্তুত, না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহাকে

শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাঁধা হুঁকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, "ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।"

কিছুদিন পূর্বেই এম.এ. পাস করিয়াছি। সামনে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদারি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই—থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল—আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিশ্বাস, তরুমর্মরে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, "মেয়ে যদি বলে তবে—"। আমার শরীর-মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত।

আমি হরিশকে বলিলাম, "একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।"

হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি। এক কালে ইঁহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একেবারে উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এ-সব ভালো কথা। কিন্তু, মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই—বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন—কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

যাই হোক, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আন্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোন্নগর পর্যন্ত গিয়াছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না।

কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনুদাদা, আমার পিস্‌তুতো ভাই। তাহার মত রুচি এবং দক্ষতার 'পরে আমি ষোলো-আনা

নির্ভর করিতে পারি। বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে!"

বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি 'চমৎকার' সেখানে তিনি বলেন 'চলনসই'। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

২

বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এ পারে বা ও পারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা।

আশা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়োই চুপচাপ। যে দুটি-একটি কথা বলেন যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল—ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শম্ভুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না—কোনো ফাঁকে একটা হুঁ বা হাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম, কিন্তু মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শম্ভুনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন লোকটা নিতান্ত নির্জীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক্, তেজ থাকাটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খুশি হইলেন। শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তার পরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এ-সমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না দেনা-পাওনা কী স্থির হইল। মনে জানিতাম, এই স্থূল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার যাঁর উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত, আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা। এইজন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেদ—ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধুম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদম-সুমারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে

বিস্তর হাসিলেন।

ব্যান্ড, বাঁশি, শখের কন্সর্ট্‌ প্রভৃতি যেখানে যতপ্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মত্ত হস্তী দ্বারা সংগীতসরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরাতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাঙ্গে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শম্ভুনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত ঠান্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্র নয়। মুখে তো কথাই নাই। কোমরে চাদর বাঁধা, গলা ভাঙা, টাক-পড়া, মিশ-কালো এবং বিপুল-শরীর তাঁর একটি উকিল-বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া, মাথা হেলাইয়া, নম্রতার স্মিতহাস্যে ও গদ্‌গদ বচনে কন্সর্ট্‌ পার্টির করতাল-বাজিয়ে হইতে শুরু করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুররূপে অভিষিক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই একটা এস্‌পার-ওস্‌পার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, "বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।"

ব্যাপারখানা এই।— সকলের না হউক, কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয় তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন— বিবাহকার্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়িভাড়া সওগাদ লোক-বিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন— দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শুধু মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির স্যাক্‌রাকে সুদ্ধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোষে এবং স্যাক্‌রা তাহার দাঁড়িপাল্লা কষ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেজেয় বসিয়া আছে।

শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, "তোমার মামা বলিতেছেন বিবাহের কাজ শুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কী বল।"

আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন, "ও আবার কী বলিবে। আমি যা বলিব তাই হইবে।"

শম্ভুনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বলিবেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?"

আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইঙ্গিতে জানাইলাম, এ-সব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার।

"আচ্ছা তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি।" এই বলিয়া তিনি উঠিলেন।

মামা বলিলেন, "অনুপম এখানে কী করিবে। ও সভায় গিয়া বসুক।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।"

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্তপোষের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহনা—হাল ফ্যাশানের সূক্ষ্ম কাজ নয়—যেমন মোটা তেমনি ভারী।

স্যাক্‌রা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই—এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।"

এই বলিয়া সে মকরমুখা মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল তাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তখনি তাঁর নোটবইয়ে গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন, পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে পরিমাণ দিবার কথা এগুলি সংখ্যায় দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি।

গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শম্ভুনাথ সেইটে স্যাক্‌রার হাতে দিয়া বলিলেন, "এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।"

স্যাক্‌রা কহিল, "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।"

শম্ভুবাবু এয়ারিংজোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।"

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "অনুপম, যাও, তুমি সভায় গিয়ে বোসো গে।"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।"

মামা বলিলেন, "সে কী কথা। লগ্ন—"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "সেজন্য কিছু ভাবিবেন না—এখন উঠুন।"

লোকটি নেহাত ভালোমানুষ-ধরনের, কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরযাত্রদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল।

বরযাত্রদের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাবু আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, "সে কী কথা। বিবাহের পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া।"

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কী বল। বসিয়া খাইতে দোষ কিছু আছে?"

মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তখন শম্ভুনাথবাবু মামাকে বলিলেন, "আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা

ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে—"

মামা বলিলেন, "তা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?"

মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "ঠাট্টা করিতেছেন নাকি।"

শম্ভুনাথ কহিলেন, "ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।"

মামা দুই চোখ এত বড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

শম্ভুনাথ কহিলেন, "আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।"

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।

তার পরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লণ্ঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া, জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া, বরযাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যান্ড রসনচৌকি ও কন্সর্ট্ একসঙ্গে বাজিল না এবং অভ্রের ঝাড়গুলো আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্তব্যের বরাত দিয়া কোথায় যে মহানির্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

৩

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন। কন্যার পিতার এত গুমর! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল! সকলে বলিল, 'দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।' কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কী।

সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এত বড়ো সৎপাত্রের কপালে এত বড়ো কলঙ্কের দাগ কোন্ নষ্টগ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল? বরযাত্ররা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে, 'বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল—পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।'

'বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব' বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাশার যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গোঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু, এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর-একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রঙ একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে

ছুটিয়া গিয়াছিল—এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বলিব। আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি—কেবল আর একটিমাত্র পা ফেলার অপেক্ষা—এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল!

এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদাদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম! বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তার ছবি, সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল। বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না—এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফোটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বই-কি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো-একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক-একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না। যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না। হঠাৎ বাহিরে কারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না।

দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মামা তো লজ্জায় বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

এ দিকে আমি শুনিলাম সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল, কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাঁধিতে ভুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, 'আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন।' হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, তোর কী হইয়াছে বল্ আমাকে।' মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, 'কই, কিছুই তো হয় নি বাবা।' বাপের এক মেয়ে যে—বড়ো আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে। তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, 'বেশ তো, আর-একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জ্বলুক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া

চলিয়া এসো। কিন্তু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুভ্র সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, 'যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও— আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসি গে।' তার পরে? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুলটি মুখ তুলিল— এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর-সবাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত্র মানুষ। তার পরে? তার পরে আমার কথাটি ফুরালো।

৪

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ, মামা এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুমঝুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন্ স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকারে মেশা সেও এক স্বপ্ন। কেবল আকাশের তারাগুলি চিরপরিচিত— আর সবই অজানা অস্পষ্ট; স্টেশনের দীপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা এবং যাহা চারি দিকে তাহা যে কতই বহু দূরে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন; আলোর নীচে সবুজ পর্দা টানা; তোরঙ্গ বাক্স জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বপ্নলোকের উলট-পালট আসবাব, সবুজ প্রদোষের মিট্‌মিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন-একরকম হইয়া পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল, "শিগ্‌গির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে।"

মনে হইল, যেন গান শুনিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচম্‌কা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি-মানুষের গলা; শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, 'এমন তো আর শুনি নাই।'

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম, কিছুই দেখিলাম না। প্ল্যাট্‌ফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড্ তাহার এক-চক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কণ্ঠের সুর,

এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি— চঞ্চল কালের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ, অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপ্‌ড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধুয়া— 'গাড়িতে জায়গা আছে।' আছে কি, জায়গা আছে কি। জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে আছে— শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি স্টেশনেই একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রেই নামিয়া যায়।

পরদিন সকালে একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্স্ট্ ক্লাসের টিকিট— মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, প্ল্যাট্‌ফর্মে সাহেবদের আর্দালি-দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন্‌-এক ফৌজের বড়ো জেনারেল-সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম, ফার্স্ট্ ক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন্ গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় সেকেন্ড ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন-না— এখানে জায়গা আছে।"

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধুর কণ্ঠ এবং সেই গানেরই ধুয়া— 'জায়গা আছে।' ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চল্‌তি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল— গ্রাহ্যই করিলাম না।

তার পরে— কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে— তাহাকে কোথায় শুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম; তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি,

সে যে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারি দিকের সকলের চেয়ে অধিক— রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সে দিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাত কিছুমাত্র ছিল না— ছোটোদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোটো হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই— তাহারই কোন্-একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশ-পঁচিশ বার শুনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন, গল্প নয়, তাহাকেই শোনে; তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝর্না ঝরিয়া পড়ে। তার সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূর্যকিরণকে সজীব করিয়া তুলিল; আমার মনে হইল, আমাকে যে প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেষ্টন করিয়াছে সে ঐ তরুণীরই অক্লান্ত অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার।— পরের স্টেশনে পৌঁছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল, এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া— আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না।

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়া ছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষমানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনারেল-সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্‌যোগ করিতেছে। গাড়িতে কোথাও জায়গা নাই। বারবার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘুরিয়া গেল। মা তো ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল-পূর্বে একজন দেশী রেলোয়ে কর্মচারী নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে লট্‌কাইয়া দিয়া আমাকে বলিল,

"এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ্ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।"

আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, "না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।"

সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, "না ছাড়িয়া উপায় নাই।"

কিন্তু, মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, "আমি দুঃখিত, কিন্তু—"

শুনিয়া আমি 'কুলি কুলি' করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, "না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।"

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশন-মাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, "এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ্ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।"

বলিয়া নাম লেখা টিকিটটি খুলিয়া প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইতিমধ্যে আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম্-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আর্দালিকে প্রথমে ইশারা করিয়াছিল। তাহার পরে মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া, স্টেশন-মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা গেল, গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল। মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপত্তন চানা-মুঠ খাইতে শুরু করিল, আর আমি লজ্জায় জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত—স্টেশনে একটি হিন্দুস্থানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী মা।"

মেয়েটি বলিল, "আমার নাম কল্যাণী।"

শুনিয়া মা এবং আমি দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম।

"তোমার বাবা—"

"তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁহার নাম শম্ভুনাথ সেন।"

তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।

উপসংহার

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি; শম্ভুনাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, "আমি বিবাহ করিব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন।"

সে বলিল, "মাতৃ-আজ্ঞা।"

কী সর্বনাশ। এ পক্ষেও মাতুল আছে নাকি।

তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু, আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে—সে যেন কোন্ ওপারের বাঁশি—আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল—সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই-যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল 'জায়গা আছে', সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনো কালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই এক রাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা—জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়। তাই বৎসরের পর বৎসর যায়—আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই—আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

কার্তিক ১৩২১

তপস্বিনী

বৈশাখ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রথম রাত্রে গুমট গেছে, বাঁশগাছের পাতাটা পর্যন্ত নড়ে না, আকাশের তারাগুলো যেন মাথা-ধরার বেদনার মতো দব্ দব্ করিতেছে। রাত্রি তিনটের সময় ঝির্ ঝির্ করিয়া একটুখানি বাতাস উঠিল। ষোড়শী শূন্য মেঝের উপর খোলা জানালার নীচে শুইয়া আছে, একটা কাপড়ে-মোড়া টিনের বাক্স তার মাথার বালিশ। বেশ বোঝা যায়, খুব উৎসাহের সঙ্গে সে কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছে।

প্রতিদিন ভোর চারটের সময় উঠিয়া স্নান সারিয়া ষোড়শী ঠাকুরঘরে গিয়া বসে। আহ্নিক করিতে বেলা হইয়া যায়। তার পরে বিদ্যারত্নমশায় আসেন; সেই ঘরে বসিয়াই তাঁর কাছে সে গীতা পড়ে। সংস্কৃত সে কিছু কিছু শিখিয়াছে। শঙ্করের বেদান্তভাষ্য এবং পাতঞ্জলদর্শন মূল গ্রন্থ হইতে পড়িবে, এই তার পণ। বয়স তার তেইশ হইবে।

ঘরকন্নার কাজ হইতে ষোড়শী অনেকটা তফাত থাকে— সেটা যে কেন সম্ভব হইল তার কারণটা লইয়াই এই গল্প।

নামের সঙ্গে মাখনবাবুর স্বভাবের কোনো সাদৃশ্য ছিল না। তাঁর মন গলানো বড়ো শক্ত ছিল। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন, যতদিন তাঁর ছেলে বরদা অন্তত বি.এ. পাস না করে ততদিন তাঁর বউমার কাছ হইতে সে দূরে থাকিবে। অথচ পড়াশুনাটা বরদার ঠিক ধাতে মেলে না, সে মানুষটি শৌখিন। জীবননিকুঞ্জের মধু-সঞ্চয়ের সম্বন্ধে মৌমাছির সঙ্গে তার মেজাজটা মেলে, কিন্তু মৌচাকের পালায় যে পরিশ্রমের দরকার সেটা তার একেবারেই সয় না। বড়ো আশা করিয়াছিল, বিবাহের পর হইতে গোঁফে তা দিয়া সে বেশ একটু আরামে থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটগুলো সদরেই ফুঁকিবার সময় আসিবে। কিন্তু, কপালক্রমে বিবাহের পরে তার মঙ্গলসাধনের ইচ্ছা তার বাপের মনে আরও বেশি প্রবল হইয়া উঠিল।

ইস্কুলের পণ্ডিতমশায় বরদার নাম দিয়াছিলেন, গোতম মুনি। বলা বাহুল্য, সেটা বরদার ব্রহ্মতেজ দেখিয়া নয়। কোনো প্রশ্নের সে জবাব দিত না বলিয়াই তাকে তিনি মুনি বলিতেন এবং যখন জবাব দিত তখন তার মধ্যে এমন কিছু গব্য পদার্থ পাওয়া যাইত যাতে পণ্ডিতমশায়ের মতে তার গোতম উপাধি সার্থক হইয়াছিল।

মাখন হেড্‌মাস্টারের কাছে সন্ধান লইয়া জানিলেন, ইস্কুল এবং ঘরের শিক্ষক এইরূপ বড়ো বড়ো দুই এঞ্জিন আগে পিছে জুড়িয়া দিলে তবে বরদার সদ্গতি হইতে পারে। অধম ছেলেদের যাঁরা পরীক্ষাসাগর তরাইয়া দিয়া থাকেন এমন-সব নামজাদা মাস্টার রাত্রি দশটা সাড়ে-দশটা পর্যন্ত বরদার সঙ্গে লাগিয়া রহিলেন। সত্যযুগে সিদ্ধিলাভের জন্য বড়ো বড়ো তপস্বী যে তপস্যা করিয়াছে সে ছিল একলার তপস্যা, কিন্তু মাস্টারের সঙ্গে মিলিয়া বরদার এই-যে যৌথ তপস্যা এ তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃসহ। সে কালের তপস্যার প্রধান উত্তাপ ছিল অগ্নিকে লইয়া; এখনকার এই পরীক্ষা-তাপসের তাপের প্রধান কারণ অগ্নিশর্মারা; তারা বরদাকে বড়ো জ্বলাইল। তাই এত দুঃখের পর যখন সে পরীক্ষায় ফেল করিল তখন তার

সান্ত্বনা হইল এই যে, সে যশস্বী মাস্টারমশায়দের মাথা হেঁট করিয়াছে। কিন্তু, এমন অসামান্য নিষ্ফলতাতেও মাখনবাবু হাল ছাড়িলেন না। দ্বিতীয় বছরে আর-এক দল মাস্টার নিযুক্ত হইল; তাঁদের সঙ্গে রফা হইল এই যে, বেতন তো তাঁরা পাইবেনই, তার পরে বরদা যদি ফার্স্ট্ ডিবিসনে পাস করিতে পারে তবে তাঁদের বক্‌শিশ মিলিবে। এবারেও বরদা যথাসময়ে ফেল করিত, কিন্তু এই আসন্ন দুর্ঘটনাকে একটু বৈচিত্র্য দ্বারা সরস করিবার অভিপ্রায়ে এক্‌জামিনের ঠিক আগের রাত্রে পাড়ার কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে একটা কড়া রকমের জোলাপের বড়ি খাইল এবং ধন্বন্তরীর কৃপায় ফেল্ করিবার জন্য তাকে আর সেনেট-হল পর্যন্ত ছুটিতে হইল না, বাড়ি বসিয়াই সে কাজটা বেশ সুসম্পন্ন হইতে পারিল। রোগটা উচ্চ-অঙ্গের সাময়িক পত্রের মতো এমনি ঠিক দিনে ঠিক সময়ে প্রকাশ হইল যে, মাখন নিশ্চয় বুঝিল এ কাজটা বিনা সম্পাদকতায় ঘটিতেই পারে না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করিয়া তিনি বরদাকে বলিলেন যে, তৃতীয়বার পরীক্ষার জন্য তাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অর্থাৎ তার সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ আরও একটা বছর বাড়িয়া গেল।

অভিমানের মাথায় বরদা একদিন খুব ঘটা করিয়া ভাত খাইল না। তাহাতে ফল হইল এই, সন্ধ্যাবেলাকার খাবারটা তাকে আরও বেশি করিয়া খাইতে হইল। মাখনকে সে বাঘের মতো ভয় করিত, তবু মরিয়া হইয়া তাঁকে গিয়া বলিল, "এখানে থাকলে আমার পড়াশুনো হবে না।"

মাখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেলে সেই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হতে পারবে?"

সে বলিল, "বিলাতে।"

মাখন তাকে সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, এ সম্বন্ধে তার যে গোলটুকু আছে সে ভূগোলে নয়, সে মগজে। স্বপক্ষের প্রমাণস্বরূপে বরদা বলিল, তারই একজন সতীর্থ এন্‌ট্রেন্স্ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর শেষ বেঞ্চিটা হইতে একেবারে এক লাফে বিলাতের একটা বড়ো এক্‌জামিন মারিয়া আনিয়াছে। মাখন বলিলেন, বরদাকে বিলাতে পাঠাইতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তার আগে তার বি.এ. পাস করা চাই।

এও তো বড়ো মুশকিল! বি.এ. পাস না করিয়াও বরদা জন্মিয়াছে, বি.এ. পাস না করিলেও সে মরিবে, অথচ জন্মমৃত্যুর মাঝখানটাতে কোথাকার এই বি.এ. পাস বিন্ধ্যপর্বতের মতো খাড়া হইয়া দাঁড়াইল; নড়িতে-চড়িতে সকল কথায় ঐখানটাতে গিয়াই ঠোকর খাইতে হইবে? কলিকালে অগস্ত্য মুনি করিতেছেন কী। তিনিও কি জটা মুড়াইয়া বি.এ. পাসে লাগিয়াছেন।

খুব একটা বড়ো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বরদা বলিল, 'বার বার তিনবার; এইবার কিন্তু শেষ।' আর-একবার পেন্সিলের দাগ-দেওয়া কী-বইগুলো তাকের উপর হইতে পাড়িয়া লইয়া বরদা কোমর বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইতেছে এমন সময় একটা আঘাত পাইল, সেটা আর তার সহিল না। স্কুলে যাইবার সময় গাড়ির খোঁজ করিতে গিয়া সে খবর পাইল যে, স্কুলে যাইবার গাড়ি-ঘোড়াটা মাখন বেচিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, 'দুই বছর লোকসান গেল, কত আর এই খরচ টানি!' স্কুলে হাঁটিয়া যাওয়া বরদার পক্ষে

কিছুই শক্ত নয়, কিন্তু লোকের কাছে এই অপমানের সে কী কৈফিয়ত দিবে।

অবশেষে অনেক চিন্তার পর একদিন ভোরবেলায় তার মাথায় আসিল, এ সংসারে মৃত্যু ছাড়া আর-একটা পথ খোলা আছে যেটা বি.এ. পাসের অধীন নয় এবং যেটাতে দারা সুত ধন জন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে আর কিছু নয়, সন্ন্যাসী হওয়া। এই চিন্তাটার উপর কিছুদিন ধরিয়া গোপনে সে বিস্তর সিগারেটের ধোঁয়া লাগাইল, তার পর একদিন দেখা গেল স্কুলঘরে মেঝের উপর তার কী-বইয়ের ছেঁড়া টুকরো-গুলো পরীক্ষাদুর্গের ভগ্নাবশেষের মতো ছড়ানো পড়িয়া আছে— পরীক্ষার্থীর দেখা নাই। টেবিলের উপর এক-টুকরা কাগজ ভাঙা কাঁচের গেলাস দিয়া চাপা, তাহাতে লেখা—

'আমি সন্ন্যাসী— আমার আর গাড়ির দরকার হইবে না।

শ্রীযুক্ত বরদানন্দস্বামী।'

মাখনবাবু কিছুদিন কোনো খোঁজই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, বরদাকে নিজের গরজেই ফিরিতে হইবে. খাঁচার দরজা খোলা রাখা ছাড়া আর-কোনো আয়োজনের দরকার নাই। দরজা খোলাই রহিল, কেবল সেই কী-বইগুলার ছেঁড়া টুকরা সাফ হইয়া গেছে— আর-সমস্ত ঠিক আছে। ঘরের কোণে সেই জলের কুঁজার উপরে কানা-ভাঙা গেলাসটা উপুড় করা; তেলের-দাগে-মলিন চৌকিটার আসনের জায়গায় ছারপোকার উৎপাত ও জীর্ণতার ত্রুটি-মোচনের জন্য একটা পুরাতন অ্যাট্‌লাসের মলাট পাতা; এক ধারে একটা শূন্য প্যাক্‌বাক্সের উপর একটা টিনের তোরঙ্গে বরদার নাম আঁকা; দেয়ালের গায়ে তাকের উপর একটা মলাট-ছেঁড়া ইংরেজি-বাংলা ডিক্সনারি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতকগুলা পাতা, এবং মলাটে রানী ভিক্টোরিয়ার মুখ-আঁকা অনেকগুলো এক্সেসাইজ বই। এই খাতা ঝাড়িয়া দেখিলে ইহার অধিকাংশ হইতে অগ্‌ডেন কোম্পানির সিগারেট-বাক্স-বাহিনী বিলাতি নটীদের মূর্তি ঝরিয়া পড়িবে। সন্ন্যাস-আশ্রয়ের সময় পথের সান্ত্বনার জন্য এগুলো যে বরদা সঙ্গে লয় নাই তাহা হইতে বুঝা যাইবে তার মন প্রকৃতিস্থ ছিল না।

আমাদের নায়কের তো এই দশা; নায়িকা ষোড়শী তখন সবেমাত্র ত্রয়োদশী। বাড়িতে শেষ পর্যন্ত সবাই তাকে খুকি বলিয়া ডাকিত. শ্বশুরবাড়িতেও সে আপনার এই চিরশৈশবের খ্যাতি লইয়া আসিয়াছিল, এইজন্য তার সামনেই বরদার চরিত্র-সমালোচনায় বাড়ির দাসীগুলোর পর্যন্ত বাধিত না। শাশুড়ি ছিলেন চিররুগ্‌ণা— কর্তার কোনো বিধানের উপরে কোনো কথা বলিবার শক্তি তাঁর ছিল না, এমন-কি, মনে করিতেও তাঁর ভয় করিত। পিস্‌শাশুড়ির ভাষা ছিল খুব প্রখর; বরদাকে লইয়া তিনি খুব শক্ত শক্ত কথা খুব চোখা চোখা করিয়া বলিতেন, তার বিশেষ একটু কারণ ছিল। পিতামহদের আমল হইতে কৌলীন্যের অপদেবতার কাছে বংশের মেয়েদের বলি দেওয়া এ বাড়ির একটা প্রথা। এই পিসি যার ভাগে পড়িয়াছিলেন সে একটা প্রচণ্ড গাঁজাখোর। তার গুণের মধ্যে এই যে, সে বেশিদিন বাঁচে নাই। তাই আদর করিয়া ষোড়শীকে তিনি যখন মুক্তাহারের সঙ্গে তুলনা করিতেন তখন অন্তর্যামী বুঝিতেন, ব্যর্থ মুক্তাহারের জন্য যে আক্ষেপ সে একা ষোড়শীকে লইয়া নয়।

এ ক্ষেত্রে মুক্তাহারের যে বেদনাবোধ আছে সে কথা সকলে ভুলিয়াছিল। পিসি

বলিতেন, 'দাদা কেন যে এত মাস্টার-পণ্ডিতের পিছনে খরচ করেন তা তো বুঝি নে। লিখে পড়ে দিতে পারি, বরদা কখনোই পাস করতে পারবে না।' পারিবে না এ বিশ্বাস ষোড়শীরও ছিল, কিন্তু সে একমনে কামনা করিত যেন কোনো গতিকে পাস করিয়া বরদা অন্তত পিসির মুখের ঝাঁজটা মারিয়া দেয়। বরদা প্রথমবার ফেল করিবার পর মাখন যখন দ্বিতীয়বার মাস্টারের ব্যূহ বাঁধিবার চেষ্টায় লাগিলেন— পিসি বলিলেন, 'ধন্য বলি দাদাকে! মানুষ ঠেকেও তো শেখে।' তখন ষোড়শী দিনরাত কেবল এই অসম্ভব-ভাবনা ভাবিতে লাগিল, বরদা এবার যেন হঠাৎ নিজের আশ্চর্য গোপন শক্তি প্রকাশ করিয়া অবিশ্বাসী জগৎটাকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়; সে যেন প্রথম শ্রেণীতে সব-প্রথমের চেয়েও আরও আরও আরও অনেক বড়ো হইয়া পাস করে— এত বড়ো যে, স্বয়ং লাটসাহেব সওয়ার পাঠাইয়া দেখা করিবার জন্য তাহাকে তলব করেন। এমন সময়ে কবিরাজের অব্যর্থ বড়িটা ঠিক পরীক্ষাদিনের মাথার উপর যুদ্ধের বোমার মতো আসিয়া পড়িল। সেটাও মন্দের ভালো হইত যদি লোকে সন্দেহ না করিত। পিসি বলিলেন, 'ছেলের এ দিকে বুদ্ধি নেই, ও দিকে আছে।' লাটসাহেবের তলব পড়িল না। ষোড়শী মাথা হেঁট করিয়া লোকের হাসাহাসি সহ্য করিল। সময়োচিত জোলাপের প্রহসনটায় তার মনেও যে সন্দেহ হয় নাই এমন কথা বলিতে পারি না।

এমন সময় বরদা ফেরার হইল। ষোড়শী বড়ো আশা করিয়াছিল, অন্তত এই ঘটনাকেও বাড়ির লোকে দুর্ঘটনা জ্ঞান করিয়া অনুতাপ পরিতাপ করিবে। কিন্তু, তাহাদের সংসার বরদার চলিয়া যাওয়াটাকেও পুরা দাম দিল না। সবাই বলিল, 'এই দেখো-না, এল ব'লে!' ষোড়শী মনে মনে বলিতে লাগিল, 'কখ্‌খনো না! ঠাকুর, লোকের কথা মিথ্যা হোক্! বাড়ির লোককে যেন হায়-হায় করতে হয়!'

এইবার বিধাতা ষোড়শীকে বর দিলেন; তার কামনা সফল হইল। এক মাস গেল, বরদার দেখা নাই; কিন্তু তবু কারও মুখে কোনো উদ্‌বেগের চিহ্ন দেখা যায় না। দুই মাস গেল, তখন মাখনের মনটা একটু চঞ্চল হইয়াছে, কিন্তু বাহিরে সেটা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বউমার সঙ্গে চোখাচোখি হইলে তাঁর মুখে যদিবা বিষাদের মেঘ-সঞ্চার দেখা যায়, পিসির মুখ একেবারে জ্যৈষ্ঠমাসের অনাবৃষ্টির আকাশ বলিলেই হয়। কাজেই সদর দরজার কাছে একটা মানুষ দেখিলেই ষোড়শী চমকিয়া ওঠে; আশঙ্কা, পাছে তার স্বামী ফিরিয়া আসে! এমনি করিয়া যখন তৃতীয় মাস কাটিল, তখন ছেলেটা বাড়ির সকলকে মিথ্যা উদ্‌বিগ্ন করিতেছে বলিয়া পিসি নালিশ শুরু করিলেন। এও ভালো, অবজ্ঞার চেয়ে রাগ ভালো। পরিবারের মধ্যে ক্রমে ভয় ও দুঃখ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। খোঁজ করিতে করিতে ক্রমে এক বছর যখন কাটিল তখন, মাখন যে বরদার প্রতি অনাবশ্যক কঠোরাচরণ করিয়াছেন সে কথা পিসিও বলিতে শুরু করিলেন। দুই বছর যখন গেল তখন পাড়া-প্রতিবেশীরাও বলিতে লাগিল, বরদার পড়াশুনায় মন ছিল না বটে কিন্তু মানুষটি বড়ো ভালো ছিল। বরদার অদর্শনকাল যতই দীর্ঘ হইল ততই, তার স্বভাব যে অত্যন্ত নির্মল ছিল, এমন-কি সে যে তামাকটা পর্যন্ত খাইত না, এই অন্ধ বিশ্বাস পাড়ার লোকের মনে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্কুলের পণ্ডিতমশায় স্বয়ং বলিলেন, এইজন্যই তো তিনি বরদাকে গোতম মুনি নাম দিয়াছিলেন, তখন হইতেই উহার বুদ্ধি বৈরাগ্যে একেবারে নিরেট হইয়া ছিল। পিসি প্রত্যহই অন্তত একবার করিয়া তাঁর দাদার জেদী মেজাজের 'পরে দোষারোপ

করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বরদার এত লেখাপড়ার দরকারই বা কী ছিল। টাকার তো অভাব নাই। যাই বল বাপু, তার শরীরে কিন্তু দোষ ছিল না। আহা, সোনার টুকরো ছেলে!' তার স্বামী যে পবিত্রতার আদর্শ ছিল এবং সংসারসুদ্ধ সকলেই তার প্রতি অন্যায় করিয়াছে, সকল দুঃখের মধ্যে এই সান্ত্বনায়, এই গৌরবে ষোড়শীর মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এ দিকে বাপের ব্যথিত হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দ্বিগুণ করিয়া ষোড়শীর উপর আসিয়া পড়িল। বউমা যাতে সুখে থাকে, মাখনের এই একমাত্র ভাবনা। তাঁর বড়ো ইচ্ছা, ষোড়শী তাকে এমন-কিছু ফরমাশ করে যেটা দুর্লভ— অনেকটা কষ্ট করিয়া, লোকসান করিয়া, তিনি তাকে একটু খুশি করিতে পারিলে যেন বাঁচেন— তিনি এমন করিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতে চান যেটা তাঁর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের মতো হইতে পারে।

২

ষোড়শী পনেরো বছরে পড়িল। ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া যখন-তখন তার চোখ জলে ভরিয়া আসে। চিরপরিচিত সংসারটা তাকে চারি দিকে যেন আঁটিয়া ধরে, তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। তার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটা, তার বারান্দার প্রত্যেক রেলিঙটা, আলিসার উপর যে-কয়টা ফুলের গাছের টব চিরকাল ধরিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে, তারা সকলেই যেন অন্তরে অন্তরে তাকে বিরক্ত করিতে থাকিত। পদে পদে ঘরের খাটটা, আল্‌নাটা, আল্‌মারিটা— তার জীবনের শূন্যতাকে বিস্তারিত করিয়া ব্যাখ্যা করে; সমস্ত জিনিসপত্রের উপর তার রাগ হইতে থাকে।

সংসারে তার একমাত্র আরামের জায়গা ছিল ঐ জানালার কাছটা। যে বিশ্বটা তার বাহিরে সেইটেই ছিল তার সব চেয়ে আপন। কেননা, তার 'ঘর হইল বাহির, বাহির হইল ঘর।'

একদিন যখন বেলা দশটা— অন্তঃপুরে যখন বাটি, বারকোষ, ধামা, চুপড়ি, শিল-নোড়া ও পানের বাক্সের ভিড় জমাইয়া ঘরকন্নার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে— এমন সময় সংসারের সমস্ত ব্যস্ততা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া জানলার কাছে ষোড়শী আপনার উদাস মনকে শূন্য আকাশে দিকে দিকে রওনা করিয়া দিতেছিল। হঠাৎ 'জয় বিশ্বেশ্বর' বলিয়া হাঁক দিয়া এক সন্ন্যাসী তাহাদের গেটের কাছের অশথতলা হইতে বাহির হইয়া আসিল। ষোড়শীর সমস্ত দেহতন্তু মীড়টানা বীণার তারের মতো চরম ব্যাকুলতায় বাজিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া আসিয়া পিসিকে বলিল, "পিসিমা, ঐ সন্ন্যাসীঠাকুরের ভোগের আয়োজন করো।"

এই শুরু হইল। সন্ন্যাসীর সেবা ষোড়শীর জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এতদিন পরে শ্বশুরের কাছে বধূর আবদারের পথ খুলিয়াছে। মাখন উৎসাহ দেখাইয়া বলিলেন, বাড়িতে বেশ ভালোরকম একটা অতিথিশালা খোলা চাই। মাখনবাবুর কিছু-কাল হইতে আয় কমিতেছিল; কিন্তু, তিনি বারো টাকা সুদে ধার করিয়া সৎকর্মে লাগিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসীও যথেষ্ট জুটিতে লাগিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ যে খাঁটি নয়, মাখনের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, বউমার কাছে তার আভাস দিবার জো কী। বিশেষত

জটাধারীরা যখন আহার-আরামের অপরিহার্য ত্রুটি লইয়া গালি দেয়, অভিশাপ দিতে ওঠে, তখন এক-একদিন ইচ্ছা হইত তাদের ঘাড়ে ধরিয়া বিদায় করিতে। কিন্তু, ষোড়শীর মুখ চাহিয়া তাহাদের পায়ে ধরিতে হইত। এই ছিল তাঁর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত।

সন্ন্যাসী আসিলেই প্রথমে অন্তঃপুরে একবার তার তলব পড়িত। পিসি তাকে লইয়া বসিতেন, ষোড়শী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিত। এই সাবধানতার কারণ ছিল এই, পাছে সন্ন্যাসী তাকে প্রথমেই মা বলিয়া ডাকিয়া বসে। কেননা, কী জানি।—বরদার যে ফোটোগ্রাফখানি ষোড়শীর কাছে ছিল সেটা তার ছেলে-বয়সের। সেই বালক-মুখের উপর গোঁফদাড়ি জটাজুট ছাইভস্ম যোগ করিয়া দিলে সেটার যে কিরকম অভিব্যক্তি হইতে পারে তা বলা শক্ত। কতবার কত মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছে, বুঝি কিছু কিছু মেলে; বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুত বহিয়াছে, তার পরে দেখা যায়—কণ্ঠস্বরে ঠিক মিল নাই, নাকের ডগার কাছটা অন্যরকম।

এমনি করিয়া ঘরের কোণে বসিয়াও নূতন নূতন সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়া ষোড়শী যেন বিশ্বজগতে সন্ধানে বাহির হইয়াছে। এই সন্ধানই তার সুখ। এই সন্ধানই তার স্বামী, তার জীবনযৌবনের পরিপূর্ণতা। এই সন্ধানটিকেই ঘেরিয়া তার সংসারের সমস্ত আয়োজন। সকালে উঠিয়া ইহারই জন্য তার সেবার কাজ আরম্ভ হয়—এর আগে রান্নাঘরের কাজ সে কখনো করে নাই, এখন এই কাজেই তার বিলাস। সমস্তক্ষণই মনের মধ্যে তার প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বালানো থাকে। রাত্রে শুইতে যাইবার আগে, 'কাল হয়তো আমার সেই অতিথি আসিয়া পৌঁছিবে' এই চিন্তাটিই তার দিনের শেষ চিন্তা। এই যেমন সন্ধান চলিতেছে, অমনি সেই সঙ্গে যেমন করিয়া বিধাতা তিলোত্তমাকে গড়িয়াছিলেন তেমনি করিয়া ষোড়শী নানা সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিলাইয়া বরদার মূর্তিটিকে নিজের মনের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। পবিত্র তার সত্তা, তেজঃপুঞ্জ তার দেহ, গভীর তার জ্ঞান, অতি কঠোর তার ব্রত। এই সন্ন্যাসীকে অবজ্ঞা করে এমন সাধ্য কার। সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে এই এক সন্ন্যাসীরই তো পূজা চলিতেছে। স্বয়ং তার শ্বশুরও যে এই পূজার প্রধান পূজারী, ষোড়শীর কাছে এর চেয়ে গৌরবের কথা আর-কিছু ছিল না।

কিন্তু, সন্ন্যাসী প্রতিদিনই তো আসে না। সেই ফাঁকগুলো বড়ো অসহ্য। ক্রমে সে ফাঁকও ভরিল। ষোড়শী ঘরে থাকিয়াই সন্ন্যাসের সাধনায় লাগিয়া গেল। সে মেঝের উপর কম্বল পাতিয়া শোয়, এক বেলা যা খায় তার মধ্যে ফলমূলই বেশি। গায়ে তার গেরুয়া রঙের তসর, কিন্তু সাধব্যের লক্ষণ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য চওড়া তার লাল পাড়, এবং কল্যাণীর সিঁথির অর্ধেকটা জুড়িয়া মোটা একটা সিন্দুরের রেখা। ইহার উপরে শ্বশুরকে বলিয়া সংস্কৃত পড়া শুরু করিল। মুগ্ধবোধ মুখস্থ করিতে তার অধিক দিন লাগিল না; পণ্ডিতমশায় বলিলেন, একেই বলে পূর্বজন্মার্জিত বিদ্যা।

পবিত্রতায় সে যতই অগ্রসর হইবে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার অন্তরের মিলন ততই পূর্ণ হইতে থাকিবে, এই সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল। বাহিরের লোকে সকলেই ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল; এই সন্ন্যাসী সাধুর সাধ্বী স্ত্রীর পায়ের ধুলা ও আশীর্বাদ লইবার লোকের ভিড় বাড়িতে থাকিল—এমন-কি, স্বয়ং পিসিও তার কাছে ভয়ে সম্ভ্রমে চুপ করিয়া থাকেন।

কিন্তু ষোড়শী যে নিজের মন জানিত। তার মনের রঙ তো তার গায়ের তসরের

রঙের মতো সম্পূর্ণ গেরুয়া হইয়া উঠিতে পারে নাই। আজ ভোর বেলাটাতে ঐ-যে ঝির্ ঝির্ করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছিল সেটা যেন তার সমস্ত দেহমনের উপর কোন্ একজনের কানে কানে কথার মতো আসিয়া পৌঁছিল। উঠিতে আর ইচ্ছা করিতেছিল না। জোর করিয়া উঠিল, জোর করিয়া কাজ করিতে গেল। ইচ্ছা করিতেছিল, জানালার কাছে বসিয়া তার মনের দূর দিগন্ত হইতে যে বাঁশির সুর আসিতেছে সেইটে চুপ করিয়া শোনে। এক-একদিন তার সমস্ত মন যেন অতিচেতন হইয়া ওঠে, রৌদ্রে নারিকেলের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্ করে, সে যেন তার বুকের মধ্যে কথা কহিতে থাকে। পণ্ডিতমশায় গীতা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেটা ব্যর্থ হইযা যায়; অথচ সেই সময়ে তার জানালার বাহিরের বাগানে শুকনো পাতার উপর দিয়া যখন কাঠ-বিড়ালি খস্ খস্ করিয়া গেল, বহুদূরে আকাশের হৃদয় ভেদ করিয়া চিলের একটা তীক্ষ্ম ডাক আসিয়া পৌঁছিল, ক্ষণে ক্ষণে পুকুরপাড়ের রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার একটা ক্লান্ত শব্দ বাতাসকে আবিষ্ট করিল, এই-সমস্তই তার মনকে স্পর্শ করিয়া অকারণে ব্যাকুল করে। এ'কে তো কিছুতেই বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা যায় না। যে বিস্তীর্ণ জগৎটা তপ্ত প্রাণের জগৎ—পিতামহ ব্রহ্মার রক্তের উত্তাপ হইতেই যার আদিম বাষ্প আকাশকে ছাইয়া ফেলিতেছিল, যা তাঁর চতুর্মুখের বেদবেদান্ত-উচ্চারণের অনেক পূর্বের সৃষ্টি, যার রঙের সঙ্গে ধ্বনির সঙ্গে গন্ধের সঙ্গে সমস্ত জীবের নাড়ীতে নাড়ীতে বোঝাপড়া হইয়া গেছে, তারই ছোটো বড়ো হাজার হাজার দূত জীব-হৃদয়ের খাস্‌মহলে আনাগোনার গোপন পথটা জানে—ষোড়শী তো কৃচ্ছ্রসাধনের কাঁটা গাড়িয়া আজও সে পথ বন্ধ করিতে পারিল না।

কাজেই গেরুয়া রঙকে আরও ঘন করিয়া গুলিতে হইবে। ষোড়শী পণ্ডিতমশায়কে ধরিয়া পড়িল, "আমাকে যোগাসনের প্রণালী বলিয়া দিন।"

পণ্ডিত বলিলেন, "মা, তোমার তো এ-সকল পন্থায় প্রয়োজন নাই। সিদ্ধি তো পাকা আমলকীর মতো আপনি তোমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।"

তার পুণ্যপ্রভাব লইয়া চারি দিকে লোকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাতে ষোড়শীর মনে একটা স্তবের নেশা জমিয়া গেছে। এমন একদিন ছিল, বাড়ির ঝি-চাকর পর্যন্ত তাকে কৃপাপাত্রী বলিয়া মনে করিয়াছে। তাই আজ যখন তাকে পুণ্যবতী বলিয়া সকলে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল তখন তার বহুদিনের গৌরবের তৃষ্ণা মিটিবার সুযোগ হইল। সিদ্ধি যে সে পাইয়াছে এ কথা অস্বীকার করিতে তার মুখে বাধে—তাই পণ্ডিতমশায়ের কাছে সে চুপ করিয়া রহিল।

মাখনের কাছে ষোড়শী আসিয়া বলিল, "বাবা, আমি কার কাছে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে শিখি বলো তো।"

মাখন বলিলেন, "সেটা না শিখিলেও তো বিশেষ অসুবিধা দেখি না। তুমি যত দূরে গেছ সেইখানেই তোমার নাগাল কজন লোকে পায়।"

তা হউক, প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেই হইবে। এমনি দুর্দৈব যে, মানুষও জুটিয়া গেল। মাখনের বিশ্বাস ছিল, আধুনিক কালের অধিকাংশ বাঙালিই মোটামুটি তাঁরই মতো—অর্থাৎ খায়-দায়, ঘুমায়, এবং পরের কুৎসাঘটিত ব্যাপার ছাড়া জগতে আর-কোনো অসম্ভবকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু, প্রয়োজনের তাগিদে সন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, বাংলাদেশে এমন মানুষও আছে যে ব্যক্তি খুলনা জেলায় ভৈরব নদের ধারে

খাটি নৈমিষারণ্য আবিষ্কার করিয়াছে। এই আবিষ্কারটা যে সত্য তার প্রধান প্রমাণ, ইহা কৃষ্ণপ্রতিপদের ভোরবেলায় স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বয়ং সরস্বতী ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি নিজবেশে আসিয়া আবির্ভূত হইতেন তাহা হইলে বরঞ্চ সন্দেহের কারণ থাকিত— কিন্তু, তিনি তাঁর আশ্চর্য দেবীলীলায় হাঁড়িচাঁচা পাখি হইয়া দেখা দিলেন। পাখির লেজে তিনটি মাত্র পালক ছিল— একটি সাদা, একটি সবুজ, মাঝেরটি পার্টকিলে। এই পালক তিনটি যে সত্ত্ব রজ তম, ঋক্ যজুঃ সাম, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, আজ কাল পরশু প্রভৃতি যে তিন সংখ্যার ভেল্কি লইয়া এই জগৎ তাহারই নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তার পর হইতে এই নৈমিষারণ্যে যোগী তৈরি হইতেছে। দুইজন এম.এস্‌সি. ক্লাসের ছেলে কলেজ ছাড়িয়া এখানে যোগ অভ্যাস করেন; একজন সাবজজ তাঁর সমস্ত পেন্সেন এই নৈমিষারণ্য-ফন্ডে উৎসর্গ করিয়াছেন এবং তাঁহার পিতৃমাতৃহীন ভাগনেটিকে এখানকার যোগী ব্রহ্মচারীদের সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়া মনে আশ্চর্য শান্তি পাইয়াছেন।

এই নৈমিষারণ্য হইতে ষোড়শীর জন্য যোগ-অভ্যাসের শিক্ষক পাওয়া গেল। সুতরাং মাখনকে নৈমিষারণ্য-কমিটির গৃহী-সভ্য হইতে হইল। গৃহী-সভ্যের কর্তব্য, নিজের আয়ের ষষ্ঠ অংশ সন্ন্যাসী-সভ্যদের ভরণপোষণের জন্য দান করা। গৃহী-সভ্যদের শ্রদ্ধার পরিমাণ-অনুসারে এই ষষ্ঠ অংশ অনেক সময় থার্মোমিটরের পারার মতো সত্য অঙ্কটার উপরে নীচে উঠানামা করে। অংশ কষিবার সময় মাখনেরও ঠিকে ভুল হইতে লাগিল। সেই ভুলটার গতি নীচের অঙ্কের দিকে। কিন্তু, এই ভুলচুকে নৈমিষারণ্যের যে ক্ষতি হইতেছিল ষোড়শী তাহা পূরণ করিয়া দিল। ষোড়শীর গহনা আর বড়োকিছু বাকি রহিল না এবং তার মাসহারার টাকা প্রতি মাসে সেই অন্তর্হিত গহনাগুলোর অনুসরণ করিল।

বাড়ির ডাক্তার অনাদি আসিয়া মাখনকে কহিলেন, "দাদা, করছ কী। মেয়েটা যে মারা যাবে।"

মাখন উদ্‌বিগ্ন মুখে বলিলেন, "তাই তো, কী করি।"

ষোড়শীর কাছে তাঁর আর সাহস নাই। এক সময়ে অত্যন্ত মৃদুস্বরে তাকে আসিয়া বলিলেন, "মা, এত অনিয়মে কি তোমার শরীর টিঁকবে।"

ষোড়শী একটুখানি হাসিল। তার মর্মার্থ এই, এমন-সকল বৃথা উদ্‌বেগ সংসারী বিষয়ী লোকেরই যোগ্য বটে।

৩

বরদা চলিয়া যাওয়ার পরে বারো বৎসর পার হইয়া গেছে; এখন ষোড়শীর বয়স পঁচিশ। একদিন ষোড়শী তার যোগী শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমার স্বামী জীবিত আছেন কি না তা আমি কেমন করে জানব।"

যোগী প্রায় দশ মিনিট কাল স্তব্ধ হইয়া চোখ বুজিয়া রহিলেন; তার পরে চোখ খুলিয়া বলিলেন, "জীবিত আছেন।"

"কেমন ক'রে জানলেন।"

"সে কথা এখনো তুমি বুঝবে না। কিন্তু, এটা নিশ্চয় জেনো, স্ত্রীলোক হয়েও

সাধনার পথে তুমি যে এতদূরে অগ্রসর হয়েছ সে কেবল তোমার স্বামীর অসামান্য তপোবলে। তিনি দূরে থেকেও তোমাকে সহধর্মিণী ক'রে নিয়েছেন।"

ষোড়শীর শরীর-মন পুলকিত হইয়া উঠিল। নিজের সম্বন্ধে তার মনে হইল, ঠিক যেন শিব তপস্যা করিতেছেন আর পার্বতী পদ্মবীজের মালা জপিতে জপিতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন।

ষোড়শী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় আছেন তা কি জানতে পারি।"

যোগী ঈষৎ হাস্য করিলেন; তার পরে বলিলেন, "একখানা আয়না নিয়ে এসো।"

ষোড়শী আয়না আনিয়া যোগীর নির্দেশমত তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

আধ ঘণ্টা গেলে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

ষোড়শী দ্বিধার স্বরে কহিল, "হাঁ, যেন কিছু দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেটা যে কী তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি নে।"

"সাদা কিছু দেখছ কি।"

"সাদাই তো বটে।"

"যেন পাহাড়ের উপর বরফের মতো?"

"নিশ্চয়ই বরফ! কখনো পাহাড় তো দেখি নি, তাই এতক্ষণ ঝাপসা ঠেকছিল।"

এইরূপ আশ্চর্য উপায়ে ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, বরদা হিমালয়ের অতি দুর্গম জায়গায় লংচু পাহাড়ে বরফের উপর অনাবৃত দেহে বসিয়া আছেন। সেখান হইতে তপস্যার তেজ ষোড়শীকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, এই এক আশ্চর্য কাণ্ড।

সেদিন ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া ষোড়শীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তার স্বামীর তপস্যা যে তাকে দিনরাত ঘেরিয়া আছে, স্বামী কাছে থাকিলে মাঝে মাঝে যে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারিত সে বিচ্ছেদও যে তার নাই, এই আনন্দে তার মন ভরিয়া উঠিল। তার মনে হইল, সাধনা আরও অনেক বেশি কঠোর হওয়া চাই। এতদিন এবং পোষ মাসটাতে যে কম্বল সে গায়ে দিতেছিল এখনি সেটা ফেলিয়া দিতেই শীতে তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ষোড়শীর মনে হইল, সেই লংচু পাহাড়ের হাওয়া তার গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। হাত জোড় করিয়া চোখ বুজিয়া সে বসিয়া রহিল, চোখের কোণ দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল।

সেইদিনই মধ্যাহ্নে আহারের পর মাখন ষোড়শীকে তাঁর ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বড়োই সংকোচের সঙ্গে বলিলেন, "মা, এতদিন তোমার কাছে বলি নি, ভেবেছিলুম দরকার হবে না, কিন্তু আর চলছে না। আমার সম্পত্তির চেয়ে আমার দেনা অনেক বেড়েছে, কোন্‌দিন আমার বিষয় ক্রোক করে বলা যায় না।"

ষোড়শীর মুখ আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তার মনে সন্দেহ রহিল না যে, এ-সমস্তই তার স্বামীর কাজ। তার স্বামী তাকে পূর্ণভাবে আপন সহধর্মিণী করিতেছেন— বিষয়ের যেটুকু ব্যবধান মাঝে ছিল সেও বুঝি এবার ঘুচাইলেন! কেবল উত্তরে হাওয়া নয়, এই-যে দেনা এও সেই লংচু পাহাড় হইতে আসিয়া পৌঁছিতেছে; এ তার স্বামীরই দক্ষিণ হাতের স্পর্শ।

সে হাসিমুখে বলিল, "ভয় কী বাবা!"

মাখন বলিলেন, "আমরা দাঁড়াই কোথায়।"

ষোড়শী বলিল, "নৈমিষারণ্যে চালা বেঁধে থাকব।"

মাখন বুঝিলেন, ইহার সঙ্গে বিষয়ের আলোচনা বৃথা। তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে মোটর গাড়ি দরজার কাছে আসিয়া থামিল। সাহেবি কাপড়পরা এক যুবা টপ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া মাখনের ঘরে আসিয়া একটা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ভাবের নমস্কারের চেষ্টা করিয়া বলিল, "চিনতে পারছেন না?"

"এ কী। বরদা নাকি।"

বরদা জাহাজের লস্কর হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। বারো বৎসর পরে সে আজ কোন্-এক কাপড়-কাচা কল কোম্পানির ভ্রমণকারী এজেন্ট হইয়া ফিরিয়াছে। বাপকে বলিল, "আপনার যদি কাপড়-কাচা কলের দরকার থাকে খুব সস্তায় ক'রে দিতে পারি।"

বলিয়া ছবি-আঁকা ক্যাটলগ পকেট হইতে বাহির করিল।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

পয়লা নম্বর

আমি তামাকটা পর্যন্ত খাই নে। আমার এক অভ্রভেদী নেশা আছে, তারই আওতায় অন্য-সকল নেশা একেবারে শিকড় পর্যন্ত শুকিয়ে মরে গেছে। সে আমার বই-পড়ার নেশা। আমার জীবনের মন্ত্রটা ছিল এই—

যাবজ্জীবেৎ নাই-বা জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা বহিং পঠেৎ।

যাদের বেড়াবার শখ বেশি অথচ পাথেয়ের অভাব, তারা যেমন ক'রে টাইম্‌টেব্‌ল্‌ পড়ে, অল্প বয়সে আর্থিক অসদ্ভাবের দিনে আমি তেমনি ক'রে বইয়ের ক্যাটালগ পড়তুম। আমার দাদার এক খুড়শ্বশুর বাংলা বই বেরবা মাত্র নির্বিচারে কিনতেন এবং তাঁর প্রধান অহংকার এই যে, সে বইয়ের একখানাও তাঁর আজ পর্যন্ত খোওয়া যায় নি। বোধ হয় বাংলাদেশে এমন সৌভাগ্য আর-কারও ঘটে না। কারণ, ধন বল, আয়ু বল, অন্যমনস্ক ব্যক্তির ছাতা বল, সংসারে যতকিছু সরণশীল পদার্থ আছে বাংলা বই হচ্ছে সকলের চেয়ে সেরা। এর থেকে বোঝা যাবে, দাদার খুড়শ্বশুরের বইয়ের আলমারির চাবি দাদার খুড়শাশুড়ির পক্ষেও দুর্লভ ছিল। 'দীন যথা রাজেন্দ্রসংগমে' আমি যখন ছেলেবেলায় দাদার সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যেতুম ঐ রুদ্ধদ্বার আলমারিগুলোর দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়েছি। তখন আমার চক্ষুর জিভে জল এসেছে। এই বললেই যথেষ্ট হবে, ছেলেবেলা থেকেই এত অসম্ভব-রকম বেশি পড়েছি যে পাস করতে পারি নি। যতখানি কম পড়া পাস করার পক্ষে অত্যাবশ্যক তার সময় আমার ছিল না।

আমি ফেল-করা ছেলে বলে আমার একটা মস্ত সুবিধে এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘড়ায় বিদ্যার তোলা জলে আমার স্নান নয়—স্রোতের জলে অবগাহনই আমার অভ্যাস। আজকাল আমার কাছে অনেক বি.এ. এম.এ. এসে থাকে; তারা যতই আধুনিক হোক, আজও তারা ভিক্টোরীয় যুগের নজরবন্দী হয়ে বসে আছে। তাদের বিদ্যার জগৎ টলেমির পৃথিবীর মতো আঠারো-উনিশ শতাব্দীর সঙ্গে একেবারে যেন ইস্ক্রু দিয়ে আঁটা; বাংলাদেশের ছাত্রের দল পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাকেই যেন চিরকাল প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। তাদের মানস-রথযাত্রার গাড়িখানা বহু কষ্টে মিল-বেন্থাম পেরিয়ে কার্লাইল-রাস্কিনে এসে কাত হয়ে পড়েছে। মাস্টার-মশায়ের বুলির বেড়ার বাইরে তারা সাহস করে হাওয়া খেতে বেরোয় না।

কিন্তু, আমরা যে-দেশের সাহিত্যকে খোঁটার মতো করে মনটাকে বেঁধে রেখে জাওর কাটাচ্ছি সে-দেশে সাহিত্যটা তো স্থাণু নয়—সেটা সেখানকার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলছে। সেই প্রাণটা আমার না থাকতে পারে কিন্তু সেই চলাটা আমি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজের চেষ্টায় ফরাসি জর্মান ইটালিয়ান শিখে নিলুম; অল্পদিন হল রাশিয়ান শিখতে শুরু করেছিলুম। আধুনিকতার যে এক্‌স্‌প্রেস গাড়িটা ঘণ্টায় ষাট মাইলের চেয়ে বেগে ছুটে চলেছে, আমি তারই টিকিট কিনেছি। তাই আমি হাক্‌স্‌লি-ডারুয়িনে এসেও ঠেকে যাই নি, টেনিসনকেও বিচার করতে ডরাই নে, এমন-কি, ইব্‌সেন-মেটার্‌লিঙ্কের নামের নৌকা ধরে আমাদের মাসিক

সাহিত্যে সস্তা খ্যাতির বাঁধা কারবার চালাতে আমার সংকোচ বোধ হয়।

আমাকেও কোনোদিন একদল মানুষ সন্ধান করে চিনে নেবে, এ আমার আশার অতীত ছিল। আমি দেখছি, বাংলাদেশে এমন ছেলেও দু-চারটে মেলে যারা কলেজও ছাড়ে না, অথচ কলেজের বাইরে সরস্বতীর যে বীণা বাজে তার ডাকেও উতলা হয়ে ওঠে। তারাই ক্রমে ক্রমে দুটি-একটি করে আমার ঘরে এসে জুটতে লাগল।

এই আমার এক দ্বিতীয় নেশা ধরল— বকুনি। ভদ্রভাষায় তাকে আলোচনা বলা যেতে পারে। দেশের চারি দিকে সাময়িক ও অসাময়িক সাহিত্যে যে-সমস্ত কথাবার্তা শুনি তা এক দিকে এত কাঁচা, অন্য দিকে এত পুরোনো যে মাঝে মাঝে তার হাঁফ-ধরানো ভাপ্‌সা গুমোটটাকে উদার চিন্তার খোলা হাওয়ায় কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। অথচ লিখতে কুঁড়েমি আসে। তাই মন দিয়ে কথা শোনে এমন লোকের নাগাল পেলে বেঁচে যাই।

দল আমার বাড়তে লাগল। আমি থাকতুম আমাদের গলির দ্বিতীয় নম্বর বাড়িতে, এ দিকে আমার নাম হচ্ছে অদ্বৈতচরণ, তাই আমাদের দলের নাম হয়ে গিয়েছিল দ্বৈতাদ্বৈতসম্প্রদায়। আমাদের এই সম্প্রদায়ের কারও সময়-অসময়ের জ্ঞান ছিল না। কেউ-বা পাঞ্চ-করা ট্রামের টিকিট দিয়ে পত্র-চিহ্নিত একখানা নূতন-প্রকাশিত ইংরেজি বই হাতে করে সকালে এসে উপস্থিত— তর্ক করতে করতে একটা বেজে যায়, তবু তর্ক শেষ হয় না। কেউ-বা সদ্য কলেজের নোট-নেওয়া খাতাখানা নিয়ে বিকেলে এসে হাজির, রাত যখন দুটো তখনো ওঠবার নাম করে না। আমি প্রায় তাদের খেতে বলি। কারণ, দেখেছি, সাহিত্যচর্চা যারা করে তাদের রসজ্ঞতার শক্তি কেবল মস্তিষ্কে নয়, রসনাতেও খুব প্রবল। কিন্তু, যাঁর ভরসায় এই-সমস্ত ক্ষুধিতদের যখন-তখন খেতে বলি তাঁর অবস্থা যে কী হয় সেটাকে আমি তুচ্ছ বলেই বরাবর মনে করে আসতুম। সংসারে ভাবের ও জ্ঞানের যে-সকল বড়ো বড়ো কুলালচক্র ঘুরছে, যাতে মানবসভ্যতা কতক-বা তৈরি হয়ে আগুনের পোড় খেয়ে শক্ত হয়ে উঠছে, কতক-বা কাঁচা থাকতে থাকতেই ভেঙে ভেঙে পড়ছে, তার কাছে ঘরকন্নার নড়াচড়া এবং রান্নাঘরের চুলোর আগুন কি চোখে পড়ে।

ভবানীর ভ্রূকুটিভঙ্গী ভবই জানেন, এমন কথা কাব্যে পড়েছি। কিন্তু, ভবের তিন চক্ষু; আমার একজোড়া মাত্র, তারও দৃষ্টিশক্তি বই পড়ে পড়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে। সুতরাং, অসময়ে ভোজের আয়োজন করতে বললে আমার স্ত্রীর ভ্রূচাপে কিরকম চাপল্য উপস্থিত হত তা আমার নজরে পড়ত না। ক্রমে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, আমার ঘরে অসময়ই সময় এবং অনিয়মই নিয়ম। আমার সংসারের ঘড়ি তাল-কানা এবং আমার গৃহস্থালির কোটরে কোটরে ঊনপঞ্চাশ পবনের বাসা। আমার যা-কিছু অর্থ সামর্থ্য তার একটিমাত্র খোলা ড্রেন ছিল, সে হচ্ছে বই-কেনার দিকে; সংসারের অন্য প্রয়োজন হ্যাংলা কুকুরের মতো এই আমার শখের বিলিতি কুকুরের উচ্ছিষ্ট চেটে ও শুঁকে কেমন করে যে বেঁচে ছিল তার রহস্য আমার চেয়ে আমার স্ত্রী বেশি জানতেন।

নানা জ্ঞানের বিষয়ে কথা কওয়া আমার মতো লোকের পক্ষে নিতান্ত দরকার। বিদ্যা জাহির করবার জন্যে নয়, পরের উপকার করবার জন্যেও নয়; ওটা হচ্ছে কথা কয়ে কয়ে চিন্তা করা, জ্ঞান হজম করবার একটা ব্যায়ামপ্রণালী। আমি যদি লেখক হতুম,

কিম্বা অধ্যাপক হতুম, তা হলে বকুনি আমার পক্ষে বাহুল্য হত। যাদের বাঁধা খাটুনি আছে খাওয়া হজম করবার জন্যে তাদের উপায় খুঁজতে হয় না—যারা ঘরে বসে খায় তাদের অন্তত ছাতের উপর হন্ হন্ করে পায়চারি করা দরকার। আমার সেই দশা। তাই যখন আমার দ্বৈতদলটি জমে নি তখন আমার একমাত্র দ্বৈত ছিলেন আমার স্ত্রী। তিনি আমার এই মানসিক পরিপাকের সশব্দ প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল নিঃশব্দে বহন করেছেন। যদিচ তিনি পরতেন মিলের শাড়ি এবং তাঁর গয়নার সোনা খাঁটি এবং নিরেট ছিল না, কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে যে আলাপ শুনতেন, সৌজাত্য-বিদ্যাই (Eugenics) বল, মেন্ডেল-তত্ত্বই বল, আর গাণিতিক যুক্তিশাস্ত্রই বল, তার মধ্যে সস্তা কিম্বা ভেজাল-দেওয়া কিছুই ছিল না। আমার দলবৃদ্ধির পর হতে এই আলাপ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন, কিন্তু সেজন্যে তাঁর কোনো নালিশ কোনোদিন শুনি নি।

আমার স্ত্রীর নাম অনিলা। ঐ শব্দটার মানে কী তা আমি জানি নে, আমার শ্বশুরও যে জানতেন তা নয়। শব্দটা শুনতে মিষ্ট এবং হঠাৎ মনে হয়, ওর একটা-কোনো মানে আছে। অভিধানে যাই বলুক, নামটার আসল মানে—আমার স্ত্রী তাঁর বাপের আদরের মেয়ে। আমার শাশুড়ি যখন আড়াই বছরের একটি ছেলে রেখে মারা যান তখন সেই ছোটো ছেলেকে যত্ন করবার মনোরম উপায়স্বরূপে আমার শ্বশুর আর-একটি বিবাহ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে কিরকম সফল হয়েছিল তা এই বললেই বোঝা যাবে যে, তাঁর মৃত্যুর দুদিন আগে তিনি অনিলার হাত ধরে বললেন, "মা, আমি তো যাচ্ছি, এখন সরোজের কথা ভাববার জন্যে তুমি ছাড়া আর কেউ রইল না।" তাঁর স্ত্রী ও দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেদের জন্যে কী ব্যবস্থা করলেন তা আমি ঠিক জানি নে। কিন্তু, অনিলার হাতে গোপনে তিনি তাঁর জমানো টাকা প্রায় সাড়ে সাত হাজার দিয়ে গেলেন। বললেন, "এ টাকা সুদে খাটাবার দরকার নেই—নগদ খরচ করে এর থেকে তুমি সরোজের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ো।"

আমি এই ঘটনায় কিছু আশ্চর্য হয়েছিলুম। আমার শ্বশুর কেবল বুদ্ধিমান ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন যাকে বলে বিজ্ঞ। অর্থাৎ, ঝোঁকের মাথায় কিছুই করতেন না, হিসেব করে চলতেন। তাই তাঁর ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার ভার যদি কারও উপর তাঁর দেওয়া উচিত ছিল সেটা আমার উপর, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, তাঁর মেয়ে তাঁর জামাইয়ের চেয়ে যোগ্য, এমন ধারণা যে তাঁর কী করে হল তা তো বলতে পারি নে। অথচ টাকাকড়ি সম্বন্ধে তিনি যদি আমাকে খুব খাঁটি বলে না জানতেন তা হলে আমার স্ত্রীর হাতে এত টাকা নগদ দিতে পারতেন না। আসল, তিনি ছিলেন ভিক্টোরীয় যুগের ফিলিস্‌টাইন, আমাকে শেষ পর্যন্ত চিনতে পারেন নি।

মনে মনে রাগ করে আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম, এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কব না। কথা কইও নি। বিশ্বাস ছিল, কথা অনিলাকেই প্রথম কইতে হবে, এ সম্বন্ধে আমার শরণাপন্ন না হয়ে তার উপায় নেই। কিন্তু অনিলা যখন আমার কাছে কোনো পরামর্শ নিতে এল না তখন মনে করলুম, ও বুঝি সাহস করছে না। শেষে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম, "সরোজের পড়াশুনোর কী করছ।" অনিলা বললে, "মাস্টার রেখেছি, ইস্কুলেও যাচ্ছে।" আমি আভাস দিলুম, সরোজকে শেখাবার ভার আমি

নিজেই নিতে রাজি আছি। আজকাল বিদ্যাশিক্ষার যে-সকল নতুন প্রণালী বেরিয়েছে তার কতক কতক ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। অনিলা হাঁ'ও বললে না, না'ও বললে না। এতদিন পরে আমার প্রথম সন্দেহ হল, অনিলা আমাকে শ্রদ্ধা করে না। আমি কলেজে পাস করি নি, সেইজন্য সম্ভবত ও মনে করে, পড়াশুনো সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা এবং অধিকার আমার নেই। এতদিন ওকে সৌজাত্য অভিব্যক্তিবাদ এবং রেডিয়ো-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যা-কিছু বলেছি নিশ্চয়ই অনিলা তার মূল্য কিছুই বোঝে নি। ও হয়তো মনে করেছে, সেকেন্ড ক্লাসের ছেলেও এর চেয়ে বেশি জানে। কেননা, মাস্টারের হাতের কান-মলার প্যাঁচে প্যাঁচে বিদ্যেগুলো আঁট হয়ে তাদের মনের মধ্যে বসে গেছে। রাগ করে মনে মনে বললুম, মেয়েদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার আশা সে যেন ছাড়ে বিদ্যাবুদ্ধিই যার প্রধান সম্পদ।

সংসারে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জীবননাট্য যবনিকার আড়ালেই জমতে থাকে, পঞ্চমাঙ্কের শেষে সেই যবনিকা হঠাৎ উঠে যায়। আমি যখন আমার দ্বৈতদের নিয়ে বের্গ্‌সঁর তত্ত্বজ্ঞান ও ইব্‌সেনের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করছি তখন মনে করেছিলুম, অনিলার জীবনযজ্ঞবেদীতে কোনো আগুনই বুঝি জ্বলে নি। কিন্তু, আজকে যখন সেই অতীতের দিকে পিছন ফিরে দেখি তখন স্পষ্ট দেখতে পাই, যে সৃষ্টিকর্তা আগুনে পুড়িয়ে, হাতুড়ি পিটিয়ে, জীবনের প্রতিমা তৈরি করে থাকেন, অনিলার মর্মস্থলে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। সেখানে একটি ছোটো ভাই একটি দিদি এবং একটি বিমাতার সমাবেশে নিয়তই একটা ঘাতপ্রতিঘাতের লীলা চলছিল। পুরাণের বাসুকি যে পৌরাণিক পৃথিবীকে ধরে আছে সে পৃথিবী স্থির। কিন্তু, সংসারে যে মেয়েকে বেদনার পৃথিবী বহন করতে হয় তার সে পৃথিবী মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন আঘাতে তৈরি হয়ে উঠছে। সেই চলতি ব্যথার ভার বুকে নিয়ে যাকে ঘরকন্নার খুঁটিনাটির মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন চলতে হয় তার অন্তরের কথা অন্তর্যামী ছাড়া কে সম্পূর্ণ বুঝবে। অন্তত, আমি তো কিছুই বুঝি নি। কত উদ্‌বেগ, কত অপমানিত প্রয়াস, পীড়িত স্নেহের কত অন্তর্গূঢ় ব্যাকুলতা, আমার এত কাছে নিঃশব্দতার অন্তরালে মথিত হয়ে উঠছিল আমি তা জানিই নি। আমি জানতুম, যেদিন দ্বৈতদলের ভোজের বার উপস্থিত হত সেইদিনকার উদ্যোগপর্বই অনিলার জীবনের প্রধান পর্ব। আজ বেশ বুঝতে পারছি, পরম ব্যথার ভিতর দিয়েই এ সংসারে এই ছোটো ভাইটিই দিদির সব চেয়ে অন্তরতম হয়ে উঠেছিল। সরোজকে মানুষ করে তোলা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ ও সহায়তা এরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলে উপেক্ষা করাতে আমি ও দিকটাতে একেবারে তাকাই নি, তার যে কিরকম চলছে সে কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নি।

ইতিমধ্যে আমাদের গলির পয়লা-নম্বর বাড়িতে লোক এল। এ বাড়িটি সেকালের বিখ্যাত ধনী মহাজন উদ্ধব বড়ালের আমলে তৈরি। তার পরে দুই পুরুষের মধ্যে সে বংশের ধন জন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে, দুটি-একটি বিধবা বাকি আছে। তারা এখানে থাকে না, তাই বাড়িটা পোড়ো অবস্থাতেই আছে। মাঝে মাঝে বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে এ বাড়ি কেউ কেউ অল্প দিনের জন্যে ভাড়া নিয়ে থাকে, বাকি সময়টা এত বড়ো বাড়ির ভাড়াটে প্রায় জোটে না। এবারে এলেন, মনে করো, তাঁর নাম রাজা সিতাংশুমৌলি, এবং ধরে নেওয়া যাক তিনি নরোত্তমপুরের জমিদার।

আমার বাড়ির ঠিক পাশেই অকস্মাৎ এত বড়ো একটা আবির্ভাব আমি হয়তো জানতেই পারতুম না। কারণ, কর্ণ যেমন একটি সহজ কবচ গায়ে দিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন আমারও তেমনি একটি বিধিদত্ত সহজ কবচ ছিল। সেটি হচ্ছে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা। আমার এ বর্মটি খুব মজবুত ও মোটা। অতএব, সচরাচর পৃথিবীতে চারি দিকে যে-সকল ঠেলাঠেলি গোলমাল গালমন্দ চলতে থাকে তার থেকে আত্মরক্ষা করবার উপকরণ আমার ছিল।

কিন্তু, আধুনিক কালের বড়োমানুষরা স্বাভাবিক উৎপাতের চেয়ে বেশি, তারা অস্বাভাবিক উৎপাত। দু হাত, দু পা, এক মুণ্ড যাদের আছে তারা হল মানুষ; যাদের হঠাৎ কতকগুলো হাত পা মাথা মুণ্ড বেড়ে গেছে তারা হল দৈত্য। অহরহ দুদ্দাড় শব্দে তারা আপনার সীমাকে ভাঙতে থাকে এবং আপন বাহুল্য দিয়ে স্বর্গমর্তকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাদের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া অসম্ভব; যাদের 'পরে মন দেবার কোনোই প্রয়োজন নেই অথচ মন না দিয়ে থাকবারও জো নেই তারাই হচ্ছে জগতের অস্বাস্থ্য, স্বয়ং ইন্দ্র পর্যন্ত তাদের ভয় করেন।

মনে বুঝলুম, সিতাংশুমৌলি সেই দলের মানুষ। একা একজন লোক যে এত বেজায় অতিরিক্ত হতে পারে তা আমি পূর্বে জানতুম না। গাড়ি-ঘোড়া লোক-লস্কর নিয়ে সে যেন দশ-মুণ্ড বিশ-হাতের পালা জমিয়েছে। কাজেই তার জ্বালায় আমার সারস্বত স্বর্গলোকটির বেড়া রোজ ভাঙতে লাগল।

তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমাদের গলির মোড়ে। এ গলিটার প্রধান গুণ ছিল এই যে, আমার মতো আনমনা লোক সামনের দিকে না তাকিয়ে, পিঠের দিকে মন না দিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রেও এখানে নিরাপদে বিচরণ করতে পারে। এমন-কি, এখানে সেই পথ-চলতি অবস্থায় মেরেডিথের গল্প, ব্রাউনিঙের কাব্য অথবা আমাদের কোনো আধুনিক বাঙালি কবির রচনা সম্বন্ধে মনে মনে বিতর্ক করেও অপঘাত-মৃত্যু বাঁচিয়ে চলা যায়। কিন্তু, সেদিন খামকা একটা প্রচণ্ড 'হেইয়ো' গর্জন শুনে পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা খোলা বুহাম গাড়ির প্রকাণ্ড একজোড়া লাল ঘোড়া আমার পিঠের উপর পড়ে আর-কি! যাঁর গাড়ি তিনি স্বয়ং হাঁকাচ্ছেন, পাশে তাঁর কোচম্যান ব'সে। বাবু সবলে দুই হাতে রাশ টেনে ধরেছেন। আমি কোনোমতে সেই সংকীর্ণ গলির পার্শ্ববর্তী একটা তামাকের দোকানের হাঁটু আঁকড়ে ধরে আত্মরক্ষা করলুম। দেখলুম আমার উপর বাবু ক্রুদ্ধ। কেননা, যিনি অসতর্কভাবে রথ হাঁকান অসতর্ক পদাতিককে তিনি কোনোমতেই ক্ষমা করতে পারেন না। এর কারণটা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পদাতিকের দুটি মাত্র পা, সে হচ্ছে স্বাভাবিক মানুষ। আর, যে ব্যক্তি জুড়ি হাঁকিয়ে ছোটে তার আট পা; সে হল দৈত্য। তার এই অস্বাভাবিক বাহুল্যের দ্বারা জগতে সে উৎপাতের সৃষ্টি করে। দুই-পা-ওয়ালা মানুষের বিধাতা এই আট-পা-ওয়ালা আকস্মিকটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

স্বভাবের স্বাস্থ্যকর নিয়মে এই অশ্বরথ ও সারথি সবাইকেই যথাসময়ে ভুলে যেতুম। কারণ, এই পরমাশ্চর্য জগতে এরা বিশেষ ক'রে মনে রাখবার জিনিস নয়। কিন্তু, প্রত্যেক মানুষের যে পরিমাণ গোলমাল করবার স্বাভাবিক বরাদ্দ আছে এ'রা তার চেয়ে ঢের বেশি জবরদখল করে বসে আছেন। এইজন্যে যদিচ ইচ্ছা করলেই

আমার তিন-নম্বর প্রতিবেশীকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু আমার এই পয়লা-নম্বরের প্রতিবেশীকে এক মুহূর্ত আমার ভুলে থাকা শক্ত। রাত্রে তার আট-দশটা ঘোড়া আস্তাবলের কাঠের মেঝের উপর বিনা সংগীতের যে তাল দিতে থাকে তাতে আমার ঘুম সর্বাঙ্গে টোল খেয়ে তুবড়ে যায়। তার উপর ভোরবেলায় সেই আট-দশটা ঘোড়াকে আট-দশটা সহিস যখন সশব্দে মলতে থাকে তখন সৌজন্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তার পরে তাঁর উড়ে বেহারা, ভোজপুরি বেহারা, তাঁর পাঁড়ে তেওয়ারি দরোয়ানের দল কেউই স্বরসংযম কিম্বা মিতভাষিতার পক্ষপাতী নয়। তাই বলছিলুম, ব্যক্তিটি একটিমাত্র কিন্তু তার গোলমাল করবার যন্ত্র বিস্তর। এইটেই হচ্ছে দৈত্যের লক্ষণ। সেটা তার নিজের পক্ষে অশান্তিকর না হতে পারে। নিজের কুড়িটা নাসারন্ধ্রে নাক ডাকবার সময় রাবণের হয়তো ঘুমের ব্যাঘাত হত না, কিন্তু তার প্রতিবেশীর কথাটা চিন্তা করে দেখো। স্বর্গের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে পরিমাণসুষমা, অপর পক্ষে একদা যে দানবের দ্বারা স্বর্গের নন্দনশোভা নষ্ট হয়েছিল তাদের প্রধান লক্ষণ ছিল অপরিমিতি। আজ সেই অপরিমিতি দানবটাই টাকার থলিকে বাহন ক'রে মানবের লোকালয়কে আক্রমণ করেছে। তাকে যদি-বা পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চাই সে চার ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘাড়ের উপর এসে পড়ে—এবং উপরন্তু চোখ রাঙায়।

সেদিন বিকেলে আমার দ্বৈতগুলি তখনো কেউ আসে নি। আমি বসে বসে জোয়ার-ভাঁটার তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছিলুম, এমন সময়ে আমাদের বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে দরজা পেরিয়ে আমার প্রতিবেশীর একটা স্মারকলিপি ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে আমার শার্সির উপর এসে পড়ল। সেটা একটি টেনিসের গোলা। চন্দ্রমার আকর্ষণ, পৃথিবীর নাড়ীর চাঞ্চল্য, বিশ্বগীতিকাব্যের চিরন্তন ছন্দতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তকে ছাড়িয়ে মনে পড়ল আমার একজন প্রতিবেশী আছেন এবং অত্যন্ত বেশি করে আছেন, আমার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক অথচ নিরতিশয় অবশ্যম্ভাবী। পরক্ষণেই দেখি, আমার বুড়ো অযোধ্যা বেহারাটা দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। এই আমার একমাত্র অনুচর। একে ডেকে পাই নে, হেঁকে বিচলিত করতে পারি নে—দুর্লভতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, একা মানুষ কিন্তু কাজ বিস্তর। আজ দেখি, বিনা তাগিদেই গোলা কুড়িয়ে সে পাশের বাড়ির দিকে ছুটছে। খবর পেলুম, প্রত্যেকবার গোলা কুড়িয়ে দেবার জন্যে সে চার পয়সা করে মজুরি পায়।

দেখলুম, কেবল যে আমার শার্সি ভাঙছে, আমার শান্তি ভাঙছে, তা নয়, আমার অনুচর-পরিচরদের মন ভাঙতে লাগল। আমার অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে অযোধ্যা বেহারার অবজ্ঞা প্রত্যহ বেড়ে উঠছে সেটা তেমন আশ্চর্য নয়, কিন্তু আমার দ্বৈত-সম্প্রদায়ের প্রধান সর্দার কানাইলালের মনটাও দেখছি পাশের বাড়ির প্রতি উৎসুক হয়ে উঠল। আমার উপর তার যে নিষ্ঠা ছিল সেটা উপকরণমূলক নয়, অন্তঃকরণমূলক. এই জেনে আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম; এমন সময় একদিন লক্ষ করে দেখলুম, সে আমার অযোধ্যাকে অতিক্রম ক'রে টেনিসের পলাতক গোলাটা কুড়িয়ে নিয়ে পাশের বাড়ির দিকে ছুটছে। বুঝলুম, এই উপলক্ষে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ করতে চায়। সন্দেহ হল, ওর মনের ভাবটা ঠিক ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মতো নয়—শুধু অমৃতে ওর

পেট ভরবে না।

আমি পয়লা-নম্বরের বাবুগিরিকে খুব তীক্ষ্ম বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করতুম। বলতুম, সাজসজ্জা দিয়ে মনের শূন্যতা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা ঠিক যেন রঙিন মেঘ দিয়ে আকাশ মুড়ি দেবার দুরাশা। একটু হাওয়াতেই মেঘ যায় স'রে, আকাশের ফাঁকা বেরিয়ে পড়ে। কানাইলাল একদিন প্রতিবাদ করে বললে, মানুষটা একেবারে নিছক ফাঁপা নয়, বি.এ. পাস করেছে। কানাইলাল স্বয়ং বি.এ. পাস-করা, এজন্য ঐ ডিগ্রিটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারলুম না।

পয়লা-নম্বরের প্রধান গুণগুলি সশব্দ। তিনি তিনটে যন্ত্র বাজাতে পারেন—কর্নেট, এসরাজ এবং চেলো। যখন-তখন তার পরিচয় পাই। সংগীতের সুর সম্বন্ধে আমি নিজেকে সুরাচার্য বলে অভিমান করি নে। কিন্তু আমার মতে গানটা উচ্চ-অঙ্গের বিদ্যা নয়। ভাষার অভাবে মানুষ যখন বোবা ছিল তখনই গানের উৎপত্তি—তখন মানুষ চিন্তা করতে পারত না বলে চীৎকার করত। আজও যে-সব মানুষ আদিম অবস্থায় আছে তারা শুধু শুধু শব্দ করতে ভালোবাসে। কিন্তু দেখতে পেলুম, আমার দ্বৈতদলের মধ্যে অন্তত চারজন ছেলে আছে, পয়লা-নম্বরের চেলো বেজে উঠলেই যারা গাণিতিক ন্যায়শাস্ত্রের নব্যতম অধ্যায়েও মন দিতে পারে না।

আমার দলের মধ্যে অনেক ছেলে যখন পয়লা-নম্বরের দিকে হেলছে এমন সময়ে অনিলা একদিন আমাকে বললে, "পাশের বাড়িতে একটা উৎপাত জুটেছে, এখন আমরা এখান থেকে অন্য-কোনো বাসায় গেলেই তো ভালো হয়।"

বড়ো খুশি হলুম। আমার দলের লোকদের বললুম, "দেখেছ মেয়েদের কেমন একটা সহজ বোধ আছে? তাই যে-সব জিনিস প্রমাণযোগে বোঝা যায় তা ওরা বুঝতেই পারে না, কিন্তু যে-সব জিনিসের কোনো প্রমাণ নেই তা বুঝতে ওদের একটুও দেরি হয় না।"

কানাইলাল হেসে বললে, "যেমন পেঁচো, ব্রহ্মদৈত্য, ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলোর মাহাত্ম্য, পতিদেবতা-পূজার পুণ্যফল ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আমি বললুম, "না হে, এই দেখো-না, আমরা এই পয়লা-নম্বরের জাঁকজমক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি, কিন্তু অনিলা ওর সাজসজ্জায় ভোলে নি।"

অনিলা দু-তিনবার বাড়ি-বদলের কথা বললে। আমার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু কলকাতার গলিতে গলিতে বাসা খুঁজে বেড়াবার মতো অধ্যবসায় আমার ছিল না। অবশেষে একদিন বিকেলবেলায় দেখা গেল, কানাইলাল এবং সতীশ পয়লা-নম্বরে টেনিস খেলছে। তার পরে জনশ্রুতি শোনা গেল, যতি আর হরেন পয়লা-নম্বরে সংগীতের মজলিসে একজন বক্স্-হার্মোনিয়ম বাজায় এবং একজন বাঁয়া-তবলায় সংগত করে, আর অরুণ নাকি সেখানে কমিক গান ক'রে খুব প্রতিপত্তি লাভ করেছে। এদের আমি পাঁচ-ছ বছর ধরে জানি, কিন্তু এদের যে এ-সব গুণ ছিল তা আমি সন্দেহও করি নি। বিশেষত আমি জানতুম, অরুণের প্রধান শখের বিষয় হচ্ছে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব। সে যে কমিক গানে ওস্তাদ তা কী করে বুঝব।

সত্য কথা বলি, আমি এই পয়লা-নম্বরকে মুখে যতই অবজ্ঞা করি মনে মনে ঈর্ষা করেছিলুম। আমি চিন্তা করতে পারি, বিচার করতে পারি, সকল জিনিসের সার গ্রহণ করতে পারি, বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান করতে পারি—মানসিক সম্পদে

সিতাংশুমৌলিকে আমার সমকক্ষ বলে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু, তবু ঐ মানুষটিকে আমি ঈর্ষা করেছি। কেন সে কথা যদি খুলে বলি তো লোকে হাসবে। সকালবেলায় সিতাংশু একটা দুরন্ত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বোরোত— কী আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রাশ বাগিয়ে এই জন্তুটাকে সে সংযত করত। এই দৃশ্যটি রোজই আমি দেখতুম আর ভাবতুম, 'আহা, আমি যদি এইরকম অনায়াসে ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতে পারতুম!' পটুত্ব বলে যে জিনিসটি আমার একেবারেই নেই সেইটের 'পরে আমার ভারি একটা গোপন লোভ ছিল। আমি গানের সুর ভালো বুঝি নে, কিন্তু জানলা থেকে কতদিন গোপনে দেখেছি সিতাংশু এসরাজ বাজাচ্ছে— ঐ যন্ত্রটার 'পরে তার একটি বাধাহীন সৌন্দর্যময় প্রভাব আমার কাছে আশ্চর্য মনোহর বোধ হত। আমার মনে হত, যন্ত্রটা যেন প্রেয়সী-নারীর মতো ওকে ভালোবাসে— সে আপনার সমস্ত সুর ওকে ইচ্ছা করে বিকিয়ে দিয়েছে। জিনিস-পত্র বাড়ি-ঘর জন্তু-মানুষ সকলের 'পরেই সিতাংশুর এই সহজ প্রভাব ভারি একটি শ্রী বিস্তার করত। এই জিনিসটি অনির্বচনীয়, আমি একে নিতান্ত দুর্লভ না মনে করে থাকতে পারতুম না। আমি মনে করতুম, পৃথিবীতে কোনো-কিছু প্রার্থনা করা এ লোকটির পক্ষে অনাবশ্যক, সবই আপনি এর কাছে এসে পড়বে, এ ইচ্ছা করে যেখানে গিয়ে বসবে সেইখানেই এর আসন পাতা।

তাই যখন একে একে আমার দ্বৈতগুলির অনেকেই পয়লা-নম্বরে টেনিস খেলতে, কন্সর্ট বাজাতে লাগল, তখন স্থানত্যাগের দ্বারা এই লুব্ধদের উদ্ধার করা ছাড়া আর-কোনো উপায় খুঁজে পেলুম না। দালাল এসে খবর দিলে, মনের মতো অন্য বাসা বরানগর-কাশীপুরের কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া যাবে। আমি তাতে রাজি। সকাল তখন সাড়ে ন'টা। স্ত্রীকে প্রস্তুত হতে বলতে গেলুম। তাঁকে ভাঁড়ারঘরেও পেলুম না, রান্নাঘরেও না। দেখি, শোবার ঘরে জানলার গরাদের উপর মাথা রেখে চুপ করে বসে আছেন। আমাকে দেখেই উঠে পড়লেন। আমি বললুম, "পরশুই নতুন বাসায় যাওয়া যাবে।"

তিনি বললেন, "আর দিন পনেরো সবুর করো।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন।"

অনিলা বললেন, "সরোজের পরীক্ষার ফল শীঘ্র বেরোবে— তার জন্য মনটা উদ্‌বিগ্ন আছে, এ কয়দিন আর নড়াচড়া করতে ভালো লাগছে না।"

অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে এই একটি বিষয় আছে যা নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি কখনো আলোচনা করি নে। সুতরাং আপাতত কিছুদিন বাড়িবদল মুলতবি রইল। ইতিমধ্যে খবর পেলুম, সিতাংশু শীঘ্রই দক্ষিণ-ভারতে বেড়াতে বেরোবে, সুতরাং দুই-নম্বরের উপর থেকে মস্ত ছায়াটা সরে যাবে।

অদৃষ্ট নাট্যের পঞ্চমাঙ্কের শেষ দিকটা হঠাৎ দৃষ্ট হয়ে ওঠে। কাল আমার স্ত্রী তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন; আজ ফিরে এসে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করলেন। তিনি জানেন, আজ রাত্রে আমাদের দ্বৈতদলের পূর্ণিমার ভোজ। তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার অভিপ্রায়ে দরজায় ঘা দিলুম। প্রথমে সাড়া পাওয়া গেল না। ডাক দিলুম, "অনু!" খানিক বাদে অনিলা এসে দরজা খুলে দিলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আজ রাত্রে রান্নার জোগাড় সব ঠিক আছে তো?"

সে কোনো জবাব না দিয়ে মাথা হেলিয়ে জানালে যে, আছে।

আমি বললুম, "তোমার হাতের তৈরি মাছের কচুরি আর বিলাতি আমড়ার চাট্‌নি ওদের খুব ভালো লাগে, সেটা ভুলো না।"

এই বলে বাইরে এসেই দেখি কানাইলাল বসে আছে।

আমি বললুম, "কানাই, আজ তোমরা একটু সকাল-সকাল এসো।"

কানাই আশ্চর্য হয়ে বললে, "সে কী কথা। আজ আমাদের সভা হবে নাকি।"

আমি বললুম, "হবে বই-কি। সমস্ত তৈরি আছে—ম্যাক্সিম গর্কির নতুন গল্পের বই, বের্গ্‌সঁর উপর রাসেলের সমালোচনা, মাছের কচুরি, এমন-কি আমড়ার চাট্‌নি পর্যন্ত।"

কানাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক বাদে বললে, "অদ্বৈতবাবু, আমি বলি, আজ থাক্‌।"

অবশেষে প্রশ্ন করে জানতে পারলুম, আমার শ্যালক সরোজ কাল বিকেলবেলায় আত্মহত্যা করে মরেছে। পরীক্ষায় সে পাস হতে পারে নি, তাই নিয়ে বিমাতার কাছ থেকে খুব গঞ্জনা পেয়েছিল—সইতে না পেরে গলায় চাদর বেঁধে মরেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কোথা থেকে শুনলে।"

সে বললে, "পয়লা-নম্বর থেকে।"

পয়লা-নম্বর থেকে! বিবরণটা এই—সন্ধ্যার দিকে অনিলার কাছে যখন খবর এল তখন সে গাড়ি ডাকার অপেক্ষা না ক'রে অযোধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে পথের মধ্যে থেকে গাড়ি ভাড়া করে বাপের বাড়িতে গিয়েছিল। অযোধ্যার কাছ থেকে রাত্রে সিতাংশুমৌলি এই খবর পেয়েই তখনি সেখানে গিয়ে পুলিসকে ঠাণ্ডা ক'রে নিজে শ্মশানে উপস্থিত থেকে মৃতদেহের সৎকার করিয়ে দেন।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে তখনি অন্তঃপুরে গেলুম। মনে করছিলুম, অনিলা বুঝি দরজা বন্ধ ক'রে আবার তার শোবার ঘরের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু, এবারে গিয়ে দেখি, ভাঁড়ারের সামনের বারান্দায় বসে সে আমড়ার চাট্‌নির আয়োজন করছে। যখন লক্ষ করে তার মুখ দেখলুম তখন বুঝলুম, এক রাত্রে তার জীবনটা উলট-পালট হয়ে গেছে। আমি অভিযোগ করে বললুম, "আমাকে কিছু বল নি কেন।"

সে তার বড়ো বড়ো দুই চোখ তুলে একবার আমার মুখের দিকে তাকালে—কোনো কথা কইলে না। আমি লজ্জায় অত্যন্ত ছোটো হয়ে গেলুম। যদি অনিলা বলত 'তোমাকে ব'লে লাভ কী' তা হলে আমার জবাব দেবার কিছুই থাকত না। জীবনের এই-সব বিপ্লব—সংসারের সুখ দুঃখ—নিয়ে কী ক'রে যে ব্যবহার করতে হয়, আমি কি তার কিছুই জানি।

আমি বললুম, "অনিল, এ-সব রাখো, আজ আমাদের সভা হবে না।"

অনিলা আমড়ার খোসা ছাড়াবার দিকে দৃষ্টি রেখে বললে, "কেন হবে না। খুব হবে। আমি এত ক'রে সমস্ত আয়োজন করেছি, সে আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না।"

আমি বললুম, "আজ আমাদের সভার কাজ হওয়া অসম্ভব।"

সে বললে, "তোমাদের সভা না হয় না হবে, আজ আমার নিমন্ত্রণ।"

আমি মনে একটু আরাম পেলুম। ভাবলুম, অনিলের শোকটা তত বেশি কিছু

নয়। মনে করলুম, সেই-যে এক সময়ে ওর সঙ্গে বড়ো বড়ো বিষয়ে কথা কইতুম তারই ফলে ওর মনটা অনেকটা নিরাসক্ত হয়ে এসেছে। যদিচ সব কথা বোঝবার মতো শিক্ষা এবং শক্তি ওর ছিল না, কিন্তু তবু পার্সোনাল ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌ ব'লে একটা জিনিস আছে তো।

সন্ধ্যার সময় আমার দ্বৈতদলের দুই-চারজন কম পড়ে গেল। কানাই তো এলই না। পয়লা-নম্বরে যারা টেনিসের দলে যোগ দিয়েছিল তারাও কেউ আসে নি। শুনলুম, কাল ভোরের গাড়িতে সিতাংশুমৌলি চলে যাচ্ছে, তাই এরা সেখানে বিদায়-ভোজ খেতে গেছে। এ দিকে অনিলা আজ যেরকম ভোজের আয়োজন করেছিল এমন আর কোনোদিনই করে নি। এমন-কি, আমার মতো বেহিসাবি লোকেও এ কথা না মনে করে থাকতে পারে নি যে, খরচটা অতিরিক্ত করা হয়েছে।

সেদিন খাওয়াদাওয়া করে সভাভঙ্গ হতে রাত্রি একটা-দেড়টা হয়ে গেল। আমি ক্লান্ত হয়ে তখনি শুতে গেলুম। অনিলাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "শোবে না?"

সে বললে, "বাসনগুলো তুলতে হবে।"

পরের দিন যখন উঠলুম তখন বেলা প্রায় আটটা হবে। শোবার ঘরে টিপাইয়ের উপর যেখানে আমার চশমাটা খুলে রাখি সেখানে দেখি, আমার-চশমা-চাপা-দেওয়া এক-টুক্‌রো কাগজ, তাতে অনিলের হাতের লেখাটি আছে— 'আমি চললুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খুঁজে পাবে না।'

কিছু বুঝতে পারলুম না। টিপাইয়ের উপরে একটা টিনের বাক্স— সেটা খুলে দেখি, তার মধ্যে অনিলার সমস্ত গয়না— এমন-কি, তার হাতের চুড়ি বালা পর্যন্ত, কেবল তার শাঁখা এবং হাতের লোহা ছাড়া। একটা খোপের মধ্যে চাবির গোছা, অন্য অন্য খোপে কাগজের-মোড়কে-করা কিছু টাকা সিকি দুয়ানি। অর্থাৎ, মাসের খরচ বাঁচিয়ে অনিলের হাতে যা-কিছু জমেছিল তার শেষ পয়সাটি পর্যন্ত রেখে গেছে। একটি খাতায় বাসন-কোসন জিনিসপত্রের ফর্দ, এবং ধোবার বাড়িতে যে-সব কাপড় গেছে তার সব হিসাব। এই সঙ্গে গয়লাবাড়ির এবং মুদির দোকানের দেনার হিসাবও টোকা আছে, কেবল তার নিজের ঠিকানা নেই।

এইটুকু বুঝতে পারলুম, অনিল চলে গেছে। সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখলুম— আমার শ্বশুরবাড়িতে খোঁজ নিলুম— কোথাও সে নেই। কোনো একটা বিশেষ ঘটনা ঘটলে সে সম্বন্ধে কিরকম বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়, কোনোদিন আমি তার কিছুই ভেবে পাই নে। বুকের ভিতরটা হা-হা করতে লাগল। হঠাৎ পয়লা-নম্বরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সে বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ। দেউড়ির কাছে দরোয়ানজি গড়গড়ায় তামাক টানছে। রাজাবাবু ভোররাত্রে চলে গেছেন। মনটার মধ্যে ছ্যাঁক্‌ করে উঠল। হঠাৎ বুঝতে পারলুম, আমি যখন একমনে নব্যতম ন্যায়ের আলোচনা করছিলুম তখন মানবসমাজের পুরাতনতম একটি অন্যায় আমার ঘরে জাল বিস্তার করছিল। ফ্লোবেয়ার, টল্‌স্টয় টুর্গেনিভ প্রভৃতি বড়ো বড়ো গল্পলিখিয়েদের বইয়ে যখন এই রকমের ঘটনার কথা পড়েছি তখন বড়ো আনন্দে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক'রে তার তত্ত্বকথা বিশ্লেষণ করে দেখেছি। কিন্তু, নিজের ঘরেই যে এটা এমন সুনিশ্চিত করে ঘটতে পারে তা কোনোদিন স্বপ্নেও কল্পনা করি নি।

প্রথম ধাক্কাটাকে সামলে নিয়ে আমি প্রবীণ তত্ত্বজ্ঞানীর মতো সমস্ত ব্যাপারটাকে

যথোচিত হাল্কা করে দেখবার চেষ্টা করলুম। যেদিন আমার বিবাহ হয়েছিল সেই-দিনকার কথাটা মনে করে শুষ্ক হাসি হাসলুম। মনে করলুম, মানুষ কত আকাঙ্ক্ষা, কত আয়োজন, কত আবেগের অপব্যয় করে থাকে। কত দিন, কত রাত্রি, কত বৎসর নিশ্চিন্ত মনে কেটে গেল; স্ত্রী বলে একটা সজীব পদার্থ নিশ্চয় আছে ব'লে চোখ বুজে ছিলুম; এমন সময় আজ হঠাৎ চোখ খুলে দেখি, বুদ্‌বুদ ফেটে গিয়েছে। গেছে যাক্ গে— কিন্তু, জগতে সবই তো বুদ্‌বুদ নয়। যুগযুগান্তরের জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করে টি'কে রয়েছে এমন-সব জিনিসকে আমি কি চিনতে শিখি নি।

কিন্তু দেখলুম, হঠাৎ এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্যকালের জ্ঞানীটা মূর্ছিত হয়ে পড়ল, আর কোন্ আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষুধায় কেঁদে বেড়াতে লাগল। বারান্দার ছাতে পায়চারি করতে করতে, শূন্য বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে, শেষকালে, যেখানে জানালার কাছে কতদিন আমার স্ত্রীকে একলা চুপ করে বসে থাকতে দেখেছি, একদিন আমার সেই শোবার ঘরে গিয়ে পাগলের মতো সমস্ত জিনিসপত্র ঘাঁটতে লাগলুম। অনিলের চুল বাঁধবার আয়নার দেরাজটা হঠাৎ টেনে খুলতেই রেশমের লাল ফিতেয় বাঁধা এক-তাড়া চিঠি বেরিয়ে পড়ল। চিঠিগুলি পয়লা-নম্বর থেকে এসেছে। বুকটা জ্বলে উঠল। একবার মনে হল, সবগুলো পুড়িয়ে ফেলি। কিন্তু, যেখানে বড়ো বেদনা সেইখানেই ভয়ংকর টান। এ চিঠিগুলো সমস্ত না পড়ে আমার থাকবার জো নেই।

এই চিঠিগুলি পঞ্চাশবার পড়েছি। প্রথম চিঠিখানা তিন-চার টুকরো করে ছেঁড়া। মনে হল পাঠিকা পড়েই সেটি ছিঁড়ে ফেলে তার পরে আবার যত্ন করে একখানা কাগজের উপরে গঁদ দিয়ে জুড়ে রেখেছে। সে চিঠিখানা এই—

'আমার এ চিঠি না পড়েই যদি তুমি ছিঁড়ে ফেলো তবু আমার দুঃখ নেই। আমার যা বলবার কথা তা আমাকে বলতেই হবে।

'আমি তোমাকে দেখেছি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্ছি, কিন্তু, দেখবার মতো দেখা আমার জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে প্রথম ঘটল। চোখের উপরে ঘুমের পর্দা টানা ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছ— আজ আমি নবজাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখলুম, যে তুমি স্বয়ং তোমার সৃষ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার তা পেয়েছি, আর কিছু চাই নে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই। যদি আমি কবি হতুম তা হলে আমার এই স্তব চিঠিতে তোমাকে লেখবার দরকার হত না, ছন্দের ভিতর দিয়ে সমস্ত জগতের কণ্ঠে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতুম। আমার এ চিঠির কোনো উত্তর দেবে না জানি— কিন্তু, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারি, এমন সন্দেহমাত্র মনে না রেখে আমার পূজা নীরবে গ্রহণ কোরো। আমার এই শ্রদ্ধাকে যদি তুমি শ্রদ্ধা করতে পার তাতে তোমারও ভালো হবে। আমি কে সে কথা লেখবার দরকার নেই, কিন্তু নিশ্চয়ই তা তোমার মনের কাছে গোপনে থাকবে না।'

এমন পঁচিশখানি চিঠি। এর কোনো চিঠির উত্তর যে অনিলের কাছ থেকে গিয়েছিল, এ চিঠিগুলির মধ্যে তার কোনো নিদর্শন নেই। যদি যেত তা হলে তখনি বেসুর বেজে উঠত— কিম্বা তা হলে সোনার কাঠির জাদু একেবারে ভেঙে স্তবগান নীরব হত।

কিন্তু, এ কী আশ্চর্য। সিতাংশু যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেছে আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখলুম। আমার চোখের উপরকার ঘুমের পর্দা কত মোটা পর্দা না জানি! পুরোহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি পেয়েছিলুম, কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিই নি। আমি আমার দ্বৈতদলকে এবং নব্যন্যায়কে তার চেয়ে অনেক বড়ো করে দেখেছি। সুতরাং, যাকে আমি কোনো-দিনই দেখি নি, এক নিমেষের জন্যও পাই নি, তাকে আর-কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কী বলে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ করব।

শেষ চিঠিখানা এই—

'বাইরে থেকে আমি তোমার কিছুই জানি নে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে আমি দেখেছি তোমার বেদনা। এইখানে বড়ো কঠিন আমার পরীক্ষা। আমার এই পুরুষের বাহু নিশ্চেষ্ট থাকতে চায় না। ইচ্ছা করে, স্বর্গমর্তের সমস্ত শাসন বিদীর্ণ করে তোমাকে তোমার জীবনের ব্যর্থতা থেকে উদ্ধার করে আনি। তার পরে এও মনে হয়, তোমার দুঃখই তোমার অন্তর্যামীর আসন। সেটি হরণ করবার অধিকার আমার নেই। কাল ভোরবেলা পর্যন্ত মেয়াদ নিয়েছি। এর মধ্যে যদি কোনো দৈববাণী আমার এই দ্বিধা মিটিয়ে দেয় তা হলে যা হয় একটা কিছু হবে। বাসনার প্রবল হাওয়ায় আমাদের পথ চলবার প্রদীপকে নিবিয়ে দেয়। তাই আমি মনকে শান্ত রাখব—একমনে এই মন্ত্র জপ করব যে, তোমার কল্যাণ হোক।'

বোঝা যাচ্ছে, দ্বিধা দূর হয়ে গেছে—দুজনার পথ এক হয়ে মিলেছে। মাঝের থেকে সিতাংশুর লেখা এই চিঠিগুলি আমারই চিঠি হয়ে উঠল—ওগুলি আজ আমারই প্রাণের স্তবমন্ত্র।

কতকাল চলে গেল, বই পড়তে আর ভালো লাগে না। অনিলকে একবার কোনোমতে দেখবার জন্যে মনের মধ্যে এমন বেদনা উপস্থিত হল, কিছুতেই স্থির থাকতে পারলুম না। খবর নিয়ে জানলুম, সিতাংশু তখন মসুরি-পাহাড়ে।

সেখানে গিয়ে সিতাংশুকে অনেকবার পথে বেড়াতে দেখেছি, কিন্তু তার সঙ্গে তো অনিলকে দেখি নি। ভয় হল, পাছে তাকে অপমান ক'রে ত্যাগ করে থাকে। আমি থাকতে না পেরে একেবারে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম। সব কথা বিস্তারিত করে লেখবার দরকার নেই। সিতাংশু বললে, "আমি তাঁর কাছ থেকে জীবনে কেবল একটিমাত্র চিঠি পেয়েছি—সেটি এই দেখুন।"

এই ব'লে সিতাংশু তার পকেট থেকে একটি ছোটো এনামেল-করা সোনার কার্ড্-কেস খুলে তার ভিতর থেকে এক-টুকরো কাগজ বের করে দিলে। তাতে লেখা আছে, 'আমি চললুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খোঁজ পাবে না।'

সেই অক্ষর, সেই লেখা, সেই তারিখ, এবং যে নীলরঙের চিঠির কাগজের অর্ধেকখানা আমার কাছে এই টুকরোটি তারই বাকি অর্ধেক।

আষাঢ় ১৩২৪

পাত্র ও পাত্রী

ইতিপূর্বে প্রজাপতি কখনো আমার কপালে বসেন নি বটে, কিন্তু একবার আমার মানসপদ্মে বসেছিলেন। তখন আমার বয়স ষোলো। তার পরে, কাঁচা ঘুমে চমক লাগিয়ে দিলে যেমন ঘুম আর আসতে চায় না, আমার সেই দশা হল। আমার বন্ধু-বান্ধবরা কেউ কেউ দারপরিগ্রহ ব্যাপারে দ্বিতীয়, এমন-কি তৃতীয় পক্ষে প্রোমোশন পেলেন; আমি কৌমার্যের লাস্ট্ বেঞ্চিতে বসে শূন্য সংসারের কড়িকাঠ গণনা করে কাটিয়ে দিলুম।

আমি চোদ্দ বছর বয়সে এন্ট্রেন্স্ পাস করেছিলুম। তখন বিবাহ কিম্বা এন্ট্রেন্স্ পরীক্ষায় বয়সবিচার ছিল না। আমি কোনোদিন পড়ার বই গিলি নি, সেইজন্যে শারীরিক বা মানসিক অজীর্ণ রোগে আমাকে ভুগতে হয় নি। ইঁদুর যেমন দাঁত বসাবার জিনিস পেলেই সেটাকে কেটে-কুটে ফেলে, তা সেটা খাদ্যই হোক আর অখাদ্যই হোক, শিশুকাল থেকেই তেমনি ছাপার বই দেখলেই সেটা পড়ে ফেলা আমার স্বভাব ছিল। সংসারে পড়ার বইয়ের চেয়ে না-পড়ার বইয়ের সংখ্যা ঢের বেশি, এইজন্যে আমার পুঁথির সৌরজগতে স্কুল-পাঠ্য পৃথিবীর চেয়ে বেস্কুল-পাঠ্য সূর্য চোদ্দ লক্ষগুণে বড়ো ছিল। তবু, আমার সংস্কৃত-পণ্ডিতমশায়ের নিদারুণ ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্ত্বেও, আমি পরীক্ষায় পাস করেছিলুম।

আমার বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তখন আমরা ছিলেম সাতক্ষীরায় কিম্বা জাহানাবাদে কিম্বা ঐরকম কোনো-একটা জায়গায়। গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো, দেশ কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে আমার এই ইতিহাসে যে-কোনো স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে তার সবগুলোই সুস্পষ্ট মিথ্যা; যাঁদের রসবোধের চেয়ে কৌতূহল বেশি তাঁদের ঠকতে হবে। বাবা তখন তদন্তে বেরিয়েছিলেন। মায়ের ছিল কী-একটা ব্রত; দক্ষিণা এবং ভোজনব্যবস্থার জন্য ব্রাহ্মণ তাঁর দরকার। এইরকম পারমার্থিক প্রয়োজনে আমাদের পণ্ডিতমশায় ছিলেন মায়ের প্রধান সহায়। এইজন্য মা তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন, যদিচ বাবার মনের ভাব ছিল ঠিক তার উল্টো।

আজ আহারান্তে দানদক্ষিণার যে ব্যবস্থা হল তার মধ্যে আমিও তালিকাভুক্ত হলুম। সে পক্ষে যে আলোচনা হয়েছিল তার মর্মটা এই।—আমার তো কলকাতায় কলেজে যাবার সময় হল। এমন অবস্থায় পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করবার জন্যে একটা সদুপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। যদি একটি শিশুবধূ মায়ের কোলের কাছে থাকে তবে তাকে মানুষ ক'রে, যত্ন ক'রে, তাঁর দিন কাটতে পারে। পণ্ডিতমশায়ের মেয়ে কাশীশ্বরী এই কাজের পক্ষে উপযুক্ত—কারণ, সে শিশুও বটে, সুশীলাও বটে, আর কুলশাস্ত্রের গণিতে তার সঙ্গে আমার অঙ্কে অঙ্কে মিল। তা ছাড়া ব্রাহ্মণের কন্যা-দায়মোচনের পারমার্থিক ফলও লোভের সামগ্রী।

মায়ের মন বিচলিত হল। মেয়েটিকে একবার দেখা কর্তব্য এমন আভাস দেবামাত্র পণ্ডিতমশায় বললেন, তাঁর 'পরিবার' কাল রাত্রেই মেয়েটিকে নিয়ে বাসায় এসে পৌঁচেছেন। মায়ের পছন্দ হতে দেরি হল না; কেননা, রুচির সঙ্গে পুণ্যের বাটখারার যোগ হওয়াতে সহজেই ওজন ভারী হল। মা বললেন, মেয়েটি সুলক্ষণা—

অর্থাৎ, যথেষ্টপরিমাণ সুন্দরী না হলেও সান্ত্বনার কারণ আছে।

কথাটা পরম্পরায় আমার কানে উঠল। যে পণ্ডিতমশায়ের ধাতুরূপকে বরাবর ভয় করে এসেছি তাঁরই কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ—এরই বিসদৃশতা আমার মনকে প্রথমেই প্রবল বেগে আকর্ষণ করলে। রূপকথার গল্পের মতো হঠাৎ সুবন্ত-প্রকরণ যেন তার সমস্ত অনুস্বার-বিসর্গ ঝেড়ে ফেলে একেবারে রাজকন্যা হয়ে উঠল।

একদিন বিকেলে মা তাঁর ঘরে আমাকে ডাকিয়ে বললেন, "সনু, পণ্ডিতমশায়ের বাসা থেকে আম আর মিষ্টি এসেছে, খেয়ে দেখ্।"

মা জানতেন, আমাকে পঁচিশটা আম খেতে দিলে আর-পঁচিশটার দ্বারা তার পাদপূরণ করলে তবে আমার ছন্দ মেলে। তাই তিনি রসনার সরস পথ দিয়ে আমার হৃদয়কে আহ্বান করলেন। কাশীশ্বরী তাঁর কোলে বসেছিল। স্মৃতি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, কিন্তু মনে আছে—রাঙতা দিয়ে তার খোঁপা মোড়া, আর গায়ে কলকাতার দোকানের এক সাটিনের জ্যাকেট—সেটা নীল এবং লাল এবং লেস্ এবং ফিতের একটা প্রত্যক্ষ প্রলাপ। যতটা মনে পড়ছে—রঙ শাম্‌লা; ভুরুজোড়া খুব ঘন; এবং চোখদুটো পোষা প্রাণীর মতো বিনা সংকোচে তাকিয়ে আছে। মুখের বাকি অংশ কিছুই মনে পড়ে না—বোধ হয় বিধাতার কারখানায় তার গড়ন তখনো সারা হয় নি, কেবল একমেটে করে রাখা হয়েছে। আর যাই হোক, তাকে দেখতে নেহাত ভালোমানুষের মতো।

আমার বুকের ভিতরটা ফুলে উঠল। মনে মনে বললুম, ঐ রাঙতা-জড়ানো বেণীওয়ালা জ্যাকেট-মোড়া সামগ্রীটি ষোলো-আনা আমার—আমি ওর প্রভু, আমি ওর দেবতা। অন্য সমস্ত দুর্লভ সামগ্রীর জন্যেই সাধনা করতে হয়, কেবল এই একটি জিনিসের জন্য নয়; আমি কড়ে আঙুল নড়ালেই হয়, বিধাতা এই বর দেবার জন্যে আমাকে সেধে বেড়াচ্ছেন। মাকে যে আমি বরাবর দেখে আসছি, স্ত্রী বলতে কী বোঝায় তা আমার ঐ সূত্রে জানা ছিল। দেখেছি, বাবা অন্য-সমস্ত ব্রতের উপর চটা ছিলেন, কিন্তু সাবিত্রীব্রতের বেলায় তিনি মুখে যাই বলুন, মনে মনে বেশ একটু আনন্দ বোধ করতেন। মা তাঁকে ভালোবাসতেন তা জানি; কিন্তু কিসে বাবা রাগ করবেন, কিসে তাঁর বিরক্তি হবে, এইটেকে মা যে একান্ত মনে ভয় করতেন, এরই রসটুকু বাবা তাঁর সমস্ত পৌরুষ দিয়ে সব চেয়ে উপভোগ করতেন। পূজাতে দেবতাদের বোধ হয় বড়ো-একটা কিছু আসে যায় না, কেননা সেটা তাঁদের বৈধ বরাদ্দ। কিন্তু, মানুষের নাকি ওটা অবৈধ পাওনা, এইজন্যে ঐটের লোভে তাদের অসামাল করে। সেই বালিকার রূপগুণের টান সেদিন আমার উপরে পৌঁছয় নি, কিন্তু আমি যে পূজনীয় সে কথাটা সেই চোদ্দ বছর বয়সে আমার পুরুষের রক্তে গাঁজিয়ে উঠল। সেদিন খুব গৌরবের সঙ্গেই আমগুলো খেলুম, এমন-কি সগর্বে তিনটে আম পাতে বাকি রাখলুম, যা আমার জীবনে কখনো ঘটে নি; এবং তার জন্যে সমস্ত অপরাহ্ণকালটা অনুশোচনায় গেল।

সেদিন কাশীশ্বরী খবর পায় নি আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কোন্ শ্রেণীর—কিন্তু বাড়ি গিয়েই বোধ হয় জানতে পেরেছিল। তার পরে যখনই তার সঙ্গে দেখা হত সে শশব্যস্ত হয়ে লুকোবার জায়গা পেত না। আমাকে দেখে তার এই ত্রস্ততা

আমার খুব ভালো লাগত। আমার আবির্ভাব বিশ্বের কোনো-একটা জায়গায় কোনো-একটা আকারে খুব-একটা প্রবল প্রভাব সঞ্চার করে, এই জৈব-রাসায়নিক তথ্যটা আমার কাছে বড়ো মনোরম ছিল। আমাকে দেখেও যে কেউ ভয় করে বা লজ্জা করে, বা কোনো একটা-কিছু করে, সেটা বড়ো অপূর্ব। কাশীশ্বরী তার পালানোর দ্বারাই আমাকে জানিয়ে যেত, জগতের মধ্যে সে বিশেষভাবে সম্পূর্ণভাবে এবং নিগূঢ়ভাবে আমারই।

এতকালের অকিঞ্চিৎকরতা থেকে হঠাৎ এক মুহূর্তে এমন একান্ত গৌরবের পদ লাভ ক'রে কিছুদিন আমার মাথার মধ্যে রক্ত ঝাঁঝাঁ করতে লাগল। বাবা যেরকম মাকে কর্তব্যের বা রন্ধনের বা ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে সর্বদা ব্যাকুল করে তুলেছেন, আমিও মনে মনে তারই ছবির উপরে দাগা বুলোতে লাগলুম। বাবার অনভিপ্রেত কোনো-একটা লক্ষ্য সাধন করবার সময় মা যেরকম সাবধানে নানাপ্রকার মনোহর কৌশলে কাজ উদ্ধার করতেন, আমি কল্পনায় কাশীশ্বরীকেও সেই পথে প্রবৃত্ত হতে দেখলুম। মাঝে মাঝে মনে মনে তাকে অকাতরে এবং অকস্মাৎ মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্ক্-নোট থেকে আরম্ভ ক'রে হীরের গয়না পর্যন্ত দান করতে আরম্ভ করলুম। এক-একদিন ভাত খেতে ব'সে তার খাওয়াই হল না এবং জানলার ধারে ব'সে আঁচলের খুঁট দিয়ে সে চোখের জল মুচছে এই করুণ দৃশ্যও আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পেলুম, এবং এটা যে আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হল তা বলতে পারি নে। ছোটো ছেলেদের আত্মনির্ভরতার সম্বন্ধে বাবা অত্যন্ত বেশি সতর্ক ছিলেন। নিজের ঘর ঠিক করা, নিজের কাপড়চোপড় রাখা, সমস্তই আমাকে নিজের হাতে করতে হত। কিন্তু, আমার মনের মধ্যে গার্হস্থ্যের যে চিত্রগুলি স্পষ্ট রেখায় জেগে উঠল, তার মধ্যে একটি নীচে লিখে রাখছি। বলা বাহুল্য, আমার পৈতৃক ইতিহাসে ঠিক এইরকম ঘটনাই পূর্বে একদিন ঘটেছিল; এই কল্পনার মধ্যে আমার ওরিজিন্যালিটি কিছুই নেই। চিত্রটি এই—রবিবারে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমি খাটের উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছি। হাতে গুড়্গুড়ির নল। ঈষৎ তন্দ্রাবেশে নলটা নীচে পড়ে গেল। বারান্দায় বসে কাশীশ্বরী ধোবাকে কাপড় দিচ্ছিল, আমি তাকে ডাক দিলুম; সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার হাতে নল তুলে দিলে। আমি তাকে বললুম, 'দেখো, আমার বসবার ঘরের বাঁ দিকের আল্মারির তিনের থাকে একটা নীল রঙের মলাট-দেওয়া মোটা ইংরাজি বই আছে, সেইটে নিয়ে এসো তো।' কাশী একটা নীল রঙের বই এনে দিলে; আমি বললুম 'আঃ, এটা নয়; সে এর চেয়ে মোটা, আর তার পিঠের দিকে সোনালি অক্ষরে নাম লেখা।' এবারে সে একটা সবুজ রঙের বই আনলে—সেটা আমি ধপাস্ করে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে রেগে উঠে পড়লুম। তখন কাশীর মুখ এতটুকু হয়ে গেল এবং তার চোখ ছল্ছল্ করে উঠল। আমি গিয়ে দেখলুম, তিনের শেল্ফে বইটা নেই, সেটা আছে পাঁচের শেল্ফে। বইটা হাতে করে নিয়ে এসে নিঃশব্দে বিছানায় শুলুম, কিন্তু কাশীকে ভুলের কথা কিছু বললুম না। সে মাথা হেঁট করে বিমর্ষ হয়ে ধোবাকে কাপড় দিতে লাগল এবং নির্বুদ্ধিতার দোষে স্বামীর বিশ্রামে ব্যাঘাত করেছে, এই অপরাধ কিছুতেই ভুলতে পারলে না।

বাবা ডাকাতি তদন্ত করছেন, আর আমার এইভাবে দিন যাচ্ছে। এ দিকে আমার

সম্বন্ধে পণ্ডিতমশায়ের ব্যবহার আর ভাষা এক মুহূর্তে কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে এসে পৌঁছল এবং সেটা নিরতিশয় সম্ভাববাচ্য।

এমন সময় ডাকাতি তদন্ত শেষ হয়ে গেল, বাবা ঘরে ফিরে এলেন। আমি জানি, মা আস্তে আস্তে সময় নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাবার বিশেষ প্রিয় তরকারি-রান্নার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে কথাটাকে পাড়বেন বলে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। বাবা পণ্ডিতমশায়কে অর্থলুব্ধ ব'লে ঘৃণা করতেন; মা নিশ্চয়ই প্রথমে পণ্ডিতমশায়ের মৃদুরকম নিন্দা অথচ তাঁর স্ত্রী ও কন্যার প্রচুর রকমের প্রশংসা করে কথাটার গোড়াপত্তন করতেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে পণ্ডিতমশায়ের আনন্দিত প্রগল্‌ভতায় কথাটা চারি দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বিবাহ যে পাকা, দিনক্ষণ দেখা চলছে, এ কথা তিনি কাউকে জানাতে বাকি রাখেন নি। এমন-কি, বিবাহকালে সেরেস্তাদার বাবুর পাকা দালানটি কয়দিনের জন্যে তাঁর প্রয়োজন হবে, যথাস্থানে সে আলোচনাও তিনি সেরে রেখেছেন। শুভকর্মে সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে সম্মত হয়েছে। বাবার আদালতের উকিলের দল চাঁদা করে বিবাহের ব্যয় বহন করতেও রাজি। স্থানীয় এন্‌ট্রেন্স-স্কুলের সেক্রেটারি বীরেশ্বরবাবুর তৃতীয় ছেলে তৃতীয় ক্লাসে পড়ে, সে চাঁদ ও কুমুদের রূপক অবলম্বন করে এরই মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে ত্রিপদী ছন্দে একটা কবিতা লিখেছে। সেক্রেটারিবাবু সেই কবিতাটা নিয়ে রাস্তায় ঘাটে যাকে পেয়েছেন তাকে ধরে ধরে শুনিয়েছেন। ছেলেটির সম্বন্ধে গ্রামের লোক খুব আশান্বিত হয়ে উঠেছে।

সুতরাং, ফিরে এসেই বাইরে থেকেই বাবা শুভসংবাদ শুনতে পেলেন। তার পরে মায়ের কান্না এবং অনাহার, বাড়ির সকলের ভীতিবিহ্বলতা, চাকরদের অকারণ জরিমানা, এজ্‌লাসে প্রবল বেগে মামলা ডিস্‌মিস এবং প্রচণ্ড তেজে শাস্তিদান, পণ্ডিতমশায়ের পদচ্যুতি এবং রাঙতা-জড়ানো বেণী-সহ কাশীশ্বরীকে নিয়ে তাঁর অন্তর্ধান—এবং ছুটি ফুরোবার পূর্বেই মাতৃসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাকে সবলে কলকাতায় নির্বাসন। আমার মনটা ফাটা ফুটবলের মতো চুপসে গেল—আকাশে আকাশে, হাওয়ার উপরে তার লাফালাফি একেবারে বন্ধ হল।

২

আমার পরিণয়ের পথে গোড়াতেই এই বিঘ্ন—তার পরে আমার প্রতি বারে বারেই প্রজাপতির ব্যর্থ-পক্ষপাত ঘটেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে ইচ্ছা করি নে—আমার এই বিফলতার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত নোট দুটো-একটা রেখে যাব। বিশ বছর বয়সের পূর্বেই আমি পুরা দমে এম.এ. পরীক্ষা পাস করে চোখে চশমা পরে এবং গোঁফের রেখাটাকে তা দেবার যোগ্য করে বেরিয়ে এসেছি। বাবা তখন রামপুরহাট কিম্বা নোয়াখালি কিম্বা বারাসত কিম্বা ঐরকম কোনো-একটা জায়গায়। এতদিন তো শব্দসাগর মন্থন করে ডিগ্রিরত্ন পাওয়া গেল, এবার অর্থসাগর-মন্থনের পালা। বাবা তাঁর বড়ো বড়ো পেট্রন সাহেবদের স্মরণ করতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর সব চেয়ে বড়ো সহায় যিনি তিনি পরলোকে, তাঁর চেয়ে যিনি কিছু কম তিনি পেন্সন নিয়ে বিলেতে, যিনি আরও কমজোরী তিনি পাঞ্জাবে বদলি হয়েছেন, আর যিনি বাংলাদেশে বাকি

আছেন তিনি অধিকাংশ উমেদারকেই উপক্রমণিকায় আশ্বাস দেন কিন্তু উপসংহারে সেটা সংহরণ করেন। আমার পিতামহ যখন ডেপুটি ছিলেন তখন মুরুব্বির বাজার এমন কষা ছিল না, তাই তখন চাকরি থেকে পেন্সন এবং পেন্সন থেকে চাকরি একই বংশে খেয়া-পারাপারের মতো চলত। এখন দিন খারাপ, তাই বাবা যখন উদ্‌বিগ্ন হয়ে ভাবছিলেন যে তাঁর বংশধর গভর্মেন্ট আপিসের উচ্চ খাঁচা থেকে সওদাগরি আপিসের নিম্ন দাঁড়ে অবতরণ করবে কি না, এমন সময় এক ধনী ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যা তাঁর নোটিশে এল। ব্রাহ্মণটি কন্‌ট্রাক্টর, তাঁর অর্থাগমের পথটি প্রকাশ্য ভূতলের চেয়ে অদৃশ্য রসাতলের দিক দিয়েই প্রশস্ত ছিল। তিনি সে সময়ে বড়োদিন উপলক্ষে কমলালেবু ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী যথাযোগ্য পাত্রে বিতরণ করতে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর পাড়ায় আমার অভ্যুদয় হল। বাবার বাসা ছিল তাঁর বাড়ির সামনেই, মাঝে ছিল এক রাস্তা। বলা বাহুল্য, ডেপুটির এম. এ. পাস-করা ছেলে কন্যাদায়িকের পক্ষে খুব 'প্রাংশুলভ্য ফল'। এইজন্যে কন্‌ট্রাক্টরবাবু আমার প্রতি 'উদ্‌বাহু' হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বাহু আধুলিলম্বিত ছিল সে পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি— অন্তত সে বাহু ডেপুটিবাবুর হৃদয় পর্যন্ত অতি অনায়াসে পৌঁছল। কিন্তু, আমার হৃদয়টা তখন আরও অনেক উপরে ছিল।

কারণ, আমার বয়স তখন কুড়ি পেরোয়-পেরোয়; তখন খাঁটি স্ত্রীরত্ন ছাড়া অন্য কোনো রত্নের প্রতি আমার লোভ ছিল না। শুধু তাই নয়, তখনো ভাবুকতার দীপ্তি আমার মনে উজ্জ্বল। অর্থাৎ, সহধর্মিণী শব্দের যে অর্থ আমার মনে ছিল সে অর্থটা বাজারে চলিত ছিল না। বর্তমান কালে আমাদের দেশে সংসারটা চারি দিকেই সংকুচিত; মননসাধনের বেলায় মনকে জ্ঞান ও ভাবের উদার ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত করে রাখা আর ব্যবহারের বেলায় তাকে সেই সংসারের অতি ছোটো মাপে কৃশ করে আনা, এ আমি মনে মনেও সহ্য করতে পারতুম না। যে স্ত্রীকে আইডিয়ালের পথে সঙ্গিনী করতে চাই সেই স্ত্রী ঘরকন্নার গারদে পায়ের বেড়ি হয়ে থাকবে এবং প্রত্যেক চলা-ফেরায় ঝংকার দিয়ে পিছনে টেনে রাখবে, এমন দুর্গ্রহ আমি স্বীকার করে নিতে নারাজ ছিলুম। আসল কথা, আমাদের দেশের প্রহসনে যাদের আধুনিক বলে বিদ্রূপ করে, কলেজ থেকে টাটকা বেরিয়ে আমি সেইরকম নিরবচ্ছিন্ন আধুনিক হয়ে উঠেছিলুম। আমাদের কালে সেই আধুনিকের দল এখনকার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। আশ্চর্য এই যে, তারা সত্যই বিশ্বাস করত যে, সমাজকে মেনে চলাই দুর্গতি এবং তাকে টেনে চলাই উন্নতি।

এ-হেন আমি শ্রীযুক্ত সনৎকুমার, একটি বলশালী কন্যাদায়িকের টাকার থলির হাঁ-করা মুখের সামনে এসে পড়লুম। বাবা বললেন, শুভস্য শীঘ্রম্। আমি চুপ করে রইলুম; মনে মনে ভাবলুম, একটু দেখে-শুনে বুঝে-পড়ে নিই। চোখ কান খুলে রাখলুম— কিছু পরিমাণ দেখা এবং অনেকটা পরিমাণ শোনা গেল। মেয়েটি পুতুলের মতো ছোটো এবং সুন্দর— সে যে স্বভাবের নিয়মে তৈরি হয়েছে তা তাকে দেখে মনে হয় না— কে যেন তার প্রত্যেক চুলটি পাট ক'রে, তার ভুরুটি এঁকে, তাকে হাতে করে গড়ে তুলেছে। সে সংস্কৃতভাষায় গঙ্গার স্তব আবৃত্তি করে পড়তে পারে। তার মা পাথুরে কয়লা পর্যন্ত গঙ্গার জলে ধুয়ে তবে রাঁধেন; জীবধাত্রী বসুন্ধরা নানা জাতিকে ধারণ করেন বলে পৃথিবীর সংস্পর্শ সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সংকুচিত;

তাঁর অধিকাংশ ব্যবহার জলেরই সঙ্গে, কারণ জলচর মৎস্যরা মুসলমান-বংশীয় নয় এবং জলে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় না। তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান কাজ আপনার দেহকে গৃহকে কাপড়চোপড় হাঁড়িকুঁড়ি খাটপালঙ বাসনকোসনকে শোধন এবং মার্জন করা। তাঁর সমস্ত কৃত্য সমাপন করতে বেলা আড়াইটে হয়ে যায়। তাঁর মেয়েটিকে তিনি স্বহস্তে সর্বাংশে এমনি পরিশুদ্ধ করে তুলেছেন যে, তার নিজের মত বা নিজের ইচ্ছা বলে কোনো উৎপাত ছিল না। কোনো ব্যবস্থায় যত অসুবিধাই হোক, সেটা পালন করা তার পক্ষে সহজ হয় যদি তার কোনো সংগত কারণ তাকে বুঝিয়ে না দেওয়া যায়। সে খাবার সময় ভালো কাপড় পরে না পাছে সক্‌ড়ি হয়; সে ছায়া সম্বন্ধেও বিচার করতে শিখেছে। সে যেমন পাল্‌কির ভিতরে বসেই গঙ্গাস্নান করে, তেমনি অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে আবৃত থেকে সংসারে চলে ফেরে। বিধি-বিধানের 'পরে আমারও মায়ের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তাঁর চেয়ে আরও বেশি শ্রদ্ধা যে আর-কারও থাকবে এবং তাই নিয়ে সে মনে মনে গুমর করবে এটা তিনি সইতে পারতেন না। এইজন্যে আমি যখন তাঁকে বললুম "মা, এ মেয়ের যোগ্যপাত্র আমি নই", তিনি হেসে বললেন, "না, কলিযুগে তেমন পাত্র মেলা ভার!"

আমি বললুম, "তা হলে আমি বিদায় নিই।"

মা বললেন, "সে কী সুনু, তোর পছন্দ হল না? কেন, মেয়েটিকে তো দেখতে ভালো।"

আমি বললুম, "মা, স্ত্রী তো কেবল চেয়ে চেয়ে দেখবার জন্যে নয়, তার বুদ্ধি থাকাও চাই।"

মা বললেন, "শোনো একবার! এরই মধ্যে তুই তার কম বুদ্ধির পরিচয় কী পেলি।"

আমি বললুম, "বুদ্ধি থাকলে মানুষ দিনরাত এই-সব অনর্থক অকাজের মধ্যে বাঁচতেই পারে না। হাঁপিয়ে মরে যায়।"

মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি জানেন, এই বিবাহ সম্বন্ধে বাবা অপর পক্ষে প্রায় পাকা কথা দিয়েছেন। তিনি আরও জানেন যে, বাবা এটা প্রায় ভুলে যান যে, অন্য মানুষেরও ইচ্ছে বলে একটা বালাই থাকতে পারে। বস্তুত, বাবা যদি অত্যন্ত বেশি রাগারাগি জবর্দস্তি না করতেন তা হলে হয়তো কালক্রমে ঐ পৌরাণিক পুতুলকে বিবাহ করে আমিও একদিন প্রবল রোখে স্নান-আহ্নিক এবং ব্রত-উপবাস করতে করতে গঙ্গাতীরে সদ্গতি লাভ করতে পারতুম। অর্থাৎ, মায়ের উপর যদি এই বিবাহ দেবার ভার থাকত তা হলে তিনি সময় নিয়ে, অতি ধীর মন্দ সুযোগে ক্ষণে ক্ষণে কানে মন্ত্র দিয়ে, ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুপাত ক'রে, কাজ উদ্ধার ক'রে নিতে পারতেন। বাবা যখন কেবলই তর্জন গর্জন করতে লাগলেন আমি তাঁকে মরিয়া হয়ে বললুম, 'ছেলেবেলা থেকে খেতে-শুতে চলতে-ফিরতে আমাকে আত্মনির্ভরতার উপদেশ দিয়েছেন, কেবল বিবাহের বেলাতেই কি আত্মনির্ভর চলবে না।' কলেজে লজিকে পাস করবার বেলায় ছাড়া ন্যায়শাস্ত্রের জোরে কেউ কোনোদিন সফলতা লাভ করেছে, এ আমি দেখি নি। সংগত যুক্তি কুতর্কের আগুনে কখনো জলের মতো কাজ করে না, বরঞ্চ তেলের মতোই কাজ করে থাকে। বাবা ভেবে রেখেছেন, তিনি অন্য পক্ষকে কথা দিয়েছেন, বিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর-কিছুই নেই। অথচ আমি যদি

তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতুম যে, পণ্ডিতমশায়কে মাও একদিন কথা দিয়েছিলেন, তবু সে কথায় শুধু যে আমার বিবাহ ফেঁসে গেল তা নয়, পণ্ডিতমশায়ের জীবিকাও তার সঙ্গে সহমরণে গেল— তা হলে এই উপলক্ষে একটা ফৌজদারি বাধত। বুদ্ধি বিচার এবং রুচির চেয়ে শুচিতা মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম যে ঢের ভালো, তার কবিত্ব যে সুগভীর ও সুন্দর, তার নিষ্ঠা যে অতি মহৎ, তার ফল যে অতি উত্তম, সিম্বলিজম্‌টাই যে আইডিয়ালিজম্ এ কথা বাবা আজকাল আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সময়ে অসময়ে আলোচনা করেছেন। আমি রসনাকে থামিয়ে রেখেছি, কিন্তু মনকে তো চুপ করিয়ে রাখতে পারি নি। যে কথাটা মুখের আগার কাছে এসে ফিরে যেত সেটা হচ্ছে এই যে, 'এ-সব যদি আপনি মানেন তবে পালবার বেলায় মুরগি পালেন কেন।' আরও একটা কথা মনে আসত; বাবাই একদিন দিনক্ষণ পালপার্বণ বিধিনিষেধ দানদক্ষিণা নিয়ে তাঁর অসুবিধা বা ক্ষতি ঘটলে মাকে কঠোর ভাষায় এ-সব অনুষ্ঠানের পণ্ডতা নিয়ে তাড়না করেছেন। মা তখন দীনতা স্বীকার ক'রে, অবলাজাতি স্বভাবতই অবুঝ ব'লে মাথা হেঁট ক'রে বিরক্তির ধাক্কাটা কাটিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণভোজনের বিস্তারিত আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু, বিশ্বকর্মা লজিকের পাকা ছাঁচে ঢালাই করে জীব সৃজন করেন নি। অতএব কোনো মানুষের কথায় বা কাজে সংগতি নেই এ কথা বলে তাকে বাগিয়ে নেওয়া যায় না, রাগিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। ন্যায়শাস্ত্রের দোহাই পাড়লে অন্যায়ের প্রচণ্ডতা বেড়ে ওঠে— যারা পোলিটিকাল বা গার্হস্থ্য অ্যাজিটেশনে শ্রদ্ধাবান তাদের এ কথাটা মনে রাখা উচিত। ঘোড়া যখন তার পিছনের গাড়িটাকে অন্যায় মনে ক'রে তার উপরে লাথি চালায় তখন অন্যায়টা তো থেকেই যায়, মাঝের থেকে তার পা'কেও জখম করে। যৌবনের আবেগে অল্প একটুখানি তর্ক করতে গিয়ে আমার সেই দশা হল। পৌরাণিকী মেয়েটির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বাবার আধুনিক যুগের তহবিলের আশ্রয়ও খোওয়ালুম। বাবা বললেন, "যাও, তুমি আত্মনির্ভর করো গে।"

আমি প্রণাম করে বললুম, "যে আজ্ঞে।"

মা বসে বসে কাঁদতে লাগলেন।

বাবার দক্ষিণ হস্ত বিমুখ হল বটে, কিন্তু মাঝখানে মা থাকাতে ক্ষণে ক্ষণে মানি-অর্ডারের পেয়াদার দেখা পাওয়া যেত। মেঘ বর্ষণ বন্ধ করে দিলে, কিন্তু গোপনে স্নিগ্ধ রাত্রে শিশিরের অভিষেক চলতে লাগল। তারই জোরে ব্যাবসা শুরু করে দিলুম। ঠিক উন-আশি টাকা দিয়ে গোড়াপত্তন হল। আজ সেই কারবারে যে মূলধন খাটছে তা ঈর্ষাকাতর জনশ্রুতির চেয়ে অনেক কম হলেও, বিশ লক্ষ টাকার চেয়ে কম নয়।

প্রজাপতির পেয়াদারা আমার পিছন পিছন ফিরতে লাগল। আগে যে-সব দ্বার বন্ধ ছিল এখন তার আর আগল রইল না। মনে আছে, একদিন যৌবনের দুর্নিবার দুরাশায় একটি ষোড়শীর প্রতি (বয়সের অঙ্কটা এখনকার নিষ্ঠাবান পাঠকদের ভয়ে কিছু সহনীয় করে বললুম) আমার হৃদয়কে উন্মুখ করেছিলুম, কিন্তু খবর পেয়েছিলুম কন্যার মাতৃপক্ষ লক্ষ্য করে আছেন সিবিলিয়ানের প্রতি— অন্তত ব্যারিস্টারের নীচে তাঁর দৃষ্টি পৌঁছয় না। আমি তাঁর মনোযোগ-মীটরের জিরো-পয়েন্টের নীচে ছিলুম। কিন্তু, পরে সেই ঘরেই অন্য একদিন শুধু চা নয়, লাঞ্চ

খেয়েছি, রাত্রে ডিনারের পর মেয়েদের সঙ্গে হুইস্ট খেলেছি, তাদের মুখে বিলেতের একেবারে খাস মহলের ইংরেজি ভাষার কথাবার্তা শুনেছি। আমার মুশকিল এই যে, র‍্যাসেলস্ ডেজার্টেড ভিলেজ এবং অ্যাডিসন্ স্টীল প'ড়ে আমি ইংরিজি পাকিয়েছি, এই মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার কর্ম নয়। O my, O dear O dear প্রভৃতি উদ্ভাষণগুলো আমার মুখ দিয়ে ঠিক সুরে বেরোতেই চায় না। আমার যতটুকু বিদ্যা তাতে আমি অত্যন্ত হাল ইংরেজি ভাষায় বড়োজোর হাটে-বাজারে কেনা-বেচা করতে পারি, কিন্তু বিংশশতাব্দীর ইংরিজিতে প্রেমালাপ করার কথা মনে করলে আমার প্রেমই দৌড় মারে। অথচ এদের মুখে বাংলাভাষার যেরকম দুর্ভিক্ষ তাতে এদের সঙ্গে খাঁটি বঙ্কিমি সুরে মধুরালাপ করতে গেলে ঠকতে হবে। তাতে মজুরি পোষাবে না। তা যাই হোক, এই-সব বিলিতি-গিল্‌টি-করা মেয়ে একদিন আমার পক্ষে সুলভ হয়েছিল। কিন্তু, রুদ্ধ দরজার ফাঁকের থেকে যে মায়াপুরী দেখেছিলুম দরজা যখন খুলল তখন আর তার ঠিকানা পেলুম না। তখন আমার কেবল মনে হতে লাগল, সেই-যে আমার ব্রতচারিণী নিরর্থক নিয়মের নিরন্তর পুনরাবৃত্তির পাকে অহোরাত্র ঘুরে ঘুরে আপনার জড়বুদ্ধিকে তৃপ্ত করত, এই মেয়েরাও ঠিক সেই বুদ্ধি নিয়েই বিলিতি চালচলন আদবকায়দার সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপসর্গগুলিকে প্রদক্ষিণ ক'রে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, অনায়াসে অক্লান্ত-চিত্তে কাটিয়ে দিচ্ছে। তারাও যেমন ছোঁয়া ও নাওয়ার লেশমাত্র স্খলন দেখলে অশ্রদ্ধায় কণ্টকিত হয়ে উঠত, এরাও তেমনি অ্যাক্‌সেন্টের একটু খুঁত কিম্বা কাঁটা-চাম্‌চের অল্প বিপর্যয় দেখলে ঠিক তেমনি করেই অপরাধীর মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। তারা দিশি পুতুল, এরা বিলিতি পুতুল। মনের গতিবেগে এরা চলে না, অভ্যাসের-দম-দেওয়া কলে এদের চালায়। ফল হল এই যে, মেয়ে জাতের উপরেই আমার মনে মনে অশ্রদ্ধা জন্মাল; আমি ঠিক করলুম, ওদের বুদ্ধি যখন কম তখন স্নান-আচমন-উপবাসের অকর্ম-কাণ্ড প্রকাণ্ড না হলে ওরা বাঁচে কী করে। বইয়ে পড়েছি, একরকম জীবাণু আছে সে ক্রমাগতই ঘোরে। কিন্তু, মানুষ ঘোরে না, মানুষ চলে। সেই জীবাণুর পরিবর্ধিত সংস্করণের সঙ্গেই কি বিধাতা হতভাগ্য পুরুষ-মানুষের বিবাহের সম্বন্ধ পাতিয়েছেন।

এ দিকে বয়স যত বাড়তে চলল বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিধাও তত বেড়ে উঠল। মানুষের একটা বয়স আছে যখন সে চিন্তা না করেও বিবাহ করতে পারে। সে বয়স পেরোলে বিবাহ করতে দুঃসাহসিকতার দরকার হয়। আমি সেই বেপরোয়া দলের লোক নই। তা ছাড়া কোনো প্রকৃতিস্থ মেয়ে বিনা কারণে এক নিশ্বাসে আমাকে কেন যে বিয়ে করে ফেলবে, আমি তা কিছুতেই ভেবে পাই নে। শুনেছি ভালোবাসা অন্ধ, কিন্তু এখানে সেই অন্ধের উপর তো কোনো ভার নেই। সংসারবুদ্ধির দুটো চোখের চেয়ে আরও বেশি চোখ আছে—সেই চক্ষু যখন বিনা নেশায় আমার দিকে তাকিয়ে দেখে তখন আমার মধ্যে কী দেখতে পায় আমি তাই ভাবি। আমার গুণ নিশ্চয়ই অনেক আছে, কিন্তু সেগুলো তো ধরা পড়তে দেরি লাগে, এক চাহনিতেই বোঝা যায় না। আমার নাসার মধ্যে যে খর্বতা আছে বুদ্ধির উন্নতি তা পূরণ করেছে জানি; কিন্তু নাসাটাই থাকে প্রত্যক্ষ হয়ে, আর ভগবান বুদ্ধিকে নিরাকার করে রেখে দিলেন। যাই হোক, যখন দেখি কোনো সাবালক মেয়ে অত্যল্প কালের নোটিশেই আমাকে

বিয়ে করতে অত্যল্পমাত্র আপত্তি করে না, তখন মেয়েদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও কমে। আমি যদি মেয়ে হতুম তা হলে শ্রীযুত সনৎকুমারের নিজের খর্ব নাসার দীর্ঘনিশ্বাসে তার আশা এবং অহংকার ধূলিসাৎ হতে থাকত।

এমনি করে আমার বিবাহের-বোঝাই-হীন নৌকাটা মাঝে মাঝে চড়ায় ঠেকেছে, কিন্তু ঘাটে এসে পৌঁছয় নি। স্ত্রী ছাড়া সংসারের অন্যান্য উপকরণ ব্যাবসার উন্নতির সঙ্গে বেড়ে চলতে লাগল। একটা কথা ভুলে ছিলুম, বয়সও বাড়ছে। হঠাৎ একটা ঘটনায় সে কথা মনে করিয়ে দিলে।

অভ্রের খনির তদন্তে ছোটোনাগপুরের এক শহরে গিয়ে দেখি, পণ্ডিতমশায় সেখানে শালবনের ছায়ায় ছোট্ট একটি নদীর ধারে দিব্যি বাসা বেঁধে বসে আছেন। তাঁর ছেলে সেখানে কাজ করে। সেই শালবনের প্রান্তে আমার তাঁবু পড়েছিল। এখন দেশ জুড়ে আমার ধনের খ্যাতি। পণ্ডিতমশায় বললেন, কালে আমি যে অসামান্য হয়ে উঠব এ তিনি পূর্বেই জানতেন। তা হবে, কিন্তু আশ্চর্যরকম গোপন করে রেখেছিলেন। তা ছাড়া কোন্ লক্ষণের দ্বারা জেনেছিলেন আমি তো তা বলতে পারি নে। বোধ করি অসামান্য লোকদের ছাত্র-অবস্থায় ষত্বণত্বজ্ঞান থাকে না। কাশীশ্বরী শ্বশুরবাড়িতে ছিল, তাই বিনা বাধায় আমি পণ্ডিতমশায়ের ঘরের লোক হয়ে উঠলুম। কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে— কিন্তু তিনি নাৎনিতে পরিবৃত। সবগুলি তাঁর স্বকীয়া নয়, তার মধ্যে দুটি ছিল তাঁর পরলোকগত দাদার। বৃদ্ধ এদের নিয়ে আপনার বার্ধক্যের অপরাহ্নকে নানা রঙে রঙিন করে তুলেছেন। তাঁর অমরুশতক আর্যাসপ্তশতী হংসদূত পদাঙ্কদূতের শ্লোকের ধারা নুড়িগুলির চারি দিকে গিরিনদীর ফেনোচ্ছল প্রবাহের মতো এই মেয়েগুলিকে ঘিরে ঘিরে সহাস্যে ধ্বনিত হয়ে উঠছে।

আমি হেসে বললুম, "পণ্ডিতমশায়, ব্যাপারখানা কী।"

তিনি বললেন, "বাবা, তোমাদের ইংরাজি শাস্ত্রে বলে যে, শনিগ্রহ চাঁদের মালা পরে থাকেন— এই আমার সেই চাঁদের মালা।"

সেই দরিদ্র ঘরের এই দৃশ্যটি দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আমি একা। বুঝতে পারলুম, আমি নিজের ভারে নিজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পণ্ডিতমশায় জানেন না যে তাঁর বয়স হয়েছে, কিন্তু আমার যে হয়েছে সে আমি স্পষ্ট জানলুম। বয়স হয়েছে বলতে এইটে বোঝায়, নিজের চারি দিককে ছাড়িয়ে এসেছি, চার পাশে ঢিলে হয়ে ফাঁক হয়ে গেছে। সে ফাঁক টাকা দিয়ে, খ্যাতি দিয়ে, বোজানো যায় না। পৃথিবী থেকে রস পাচ্ছি নে, কেবল বস্তু সংগ্রহ করছি, এর ব্যর্থতা অভ্যাসবশত ভুলে থাকা যায়। কিন্তু, পণ্ডিতমশায়ের ঘর যখন দেখলুম তখন বুঝলুম, আমার দিন শুষ্ক, আমার রাত্রি শূন্য। পণ্ডিতমশায় নিশ্চয় ঠিক করে বসে আছেন যে, আমি তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ— এই কথা মনে করে আমার হাসি এল। এই বস্তুজগৎকে ঘিরে একটি অদৃশ্য আনন্দলোক আছে। সেই আনন্দলোকের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগসূত্র না থাকলে আমরা ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে থাকি। পণ্ডিতমশায়ের সেই যোগ আছে, আমার নেই, এই তফাত। আমি আরাম-কেদারার দুই হাতায় দুই পা তুলে দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে ভাবতে লাগলুম, পুরুষের জীবনের চার আশ্রমের চার অধিদেবতা। বাল্যে মা; যৌবনে স্ত্রী; প্রৌঢ়ে কন্যা, পুত্রবধূ; বার্ধক্যে নাৎনি, নাতবউ।

এমনি করে মেয়েদের মধ্য দিয়ে পুরুষ আপনার পূর্ণতা পায়। এই তত্ত্বটা মর্মরিত শালবনে আমাকে আবিষ্ট করে ধরল। মনের সামনে আমার ভাবী বৃদ্ধবয়সের শেষ-প্রান্ত পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলুম—দেখে তার নিরতিশয় নীরসতায় হৃদয়টা হাহাকার করে উঠল। ঐ মরুপথের মধ্য দিয়ে মুনফার বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে কোথায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মরতে হবে! আর দেরি করলে তো চলবে না। সম্প্রতি চল্লিশ পেরিয়েছি—যৌবনের শেষ থলিটি ঝেড়ে নেবার জন্যে পঞ্চাশ রাস্তার ধারে বসে আছে, তার লাঠির ডগাটা এইখান থেকে দেখা যাচ্ছে। এখন পকেটের কথাটা বন্ধ রেখে জীবনের কথা একটুখানি ভেবে দেখা যাক। কিন্তু, জীবনের যে অংশে মুলতুবি পড়েছে সে অংশে আর তো ফিরে যাওয়া চলবে না। তবু তার ছিন্নতায় তালি লাগাবার সময় এখনো সম্পূর্ণ যায় নি।

এখান থেকে কাজের গতিকে পশ্চিমের এক শহরে যেতে হল। সেখানে বিশ্বপতি-বাবু ধনী বাঙালি মহাজন। তাঁকে নিয়ে আমার কাজের কথা ছিল। লোকটি খুব হুঁশিয়ার, সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোনো কথা পাকা করতে বিস্তর সময় লাগে। একদিন বিরক্ত হয়ে যখন ভাবছি 'একে নিয়ে আমার কাজের সুবিধা হবে না', এমন-কি, চাকরকে আমার জিনিসপত্র প্যাক করতে বলে দিয়েছি, হেনকালে বিশ্বপতিবাবু সন্ধ্যার সময় এসে আমাকে বললেন, "আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেকরকম লোকের আলাপ আছে, আপনি একটু মনোযোগ করলে একটি বিধবা বেঁচে যায়।"

ঘটনাটি এই।—

নন্দকৃষ্ণবাবু বেরেলিতে প্রথমে আসেন একটি বাঙালি-ইংরাজি স্কুলের হেড্‌মাস্টার হয়ে। কাজ করেছিলেন খুব ভালো। সকলেই আশ্চর্য হয়েছিল—এমন সুযোগ্য সুশিক্ষিত লোক দেশ ছেড়ে, এত দূরে, সামান্য বেতনে চাকরি করতে এলেন কী কারণে। কেবল যে পরীক্ষা পাস করাতে তাঁর খ্যাতি ছিল তা নয়, সকল ভালো কাজেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। এমন সময় কেমন করে বেরিয়ে পড়ল, তাঁর স্ত্রীর রূপ ছিল বটে কিন্তু কুল ছিল না; সামান্য কোন্‌ জাতের মেয়ে, এমন-কি তাঁর ছোঁওয়া লাগলে পানীয় জলের পানীয়তা এবং অন্যান্য নিগূঢ় সাত্ত্বিক গুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাঁকে যখন সবাই চেপে ধরলে তিনি বললেন, হাঁ, জাতে ছোটো বটে, কিন্তু তবু সে তাঁর স্ত্রী। তখন প্রশ্ন উঠল, এমন বিবাহ বৈধ হয় কী করে। যিনি প্রশ্ন করেছিলেন নন্দকৃষ্ণবাবু তাঁকে বললেন, "আপনি তো শালগ্রাম সাক্ষী করে পরে পরে দুটি স্ত্রী বিবাহ করেছেন, এবং দ্বিবচনেও সন্তুষ্ট নেই তার বহু প্রমাণ দিয়েছেন। শালগ্রামের কথা বলতে পারি নে কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, আমার বিবাহ আপনার বিবাহের চেয়ে বৈধ, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বৈধ—এর চেয়ে বেশি কথা আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই নে।"

যাকে নন্দকৃষ্ণ এই কথাগুলি বললেন তিনি খুশি হন নি। তার উপরে লোকের অনিষ্ট করবার ক্ষমতাও তাঁর অসামান্য ছিল। সুতরাং সেই উপদ্রবে নন্দকৃষ্ণ বেরিলি ত্যাগ করে এই বর্তমান শহরে এসে ওকালতি শুরু করলেন। লোকটা অত্যন্ত খুঁৎখুঁতে ছিলেন—উপবাসী থাকলেও অন্যায় মকদ্দমা তিনি কিছুতেই নিতেন না। প্রথমটা তাতে তাঁর যত অসুবিধা হোক, শেষকালে উন্নতি হতে লাগল। কেননা, হাকিমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। একখানি বাড়ি করে একটু জমিয়ে বসেছেন

এমন সময় দেশে মন্বন্তর এল। দেশ উজাড় হয়ে যায়। যাদের উপর সাহায্যবিতরণের ভার ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ চুরি করছিল বলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতেই ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, "সাধুলোক পাই কোথায়?"

তিনি বললেন, "আমাকে যদি বিশ্বাস করেন আমি এ কাজের কতক ভার নিতে পারি।"

তিনি ভার পেলেন এবং এই ভার বহন করতে করতেই একদিন মধ্যাহ্নে মাঠের মধ্যে এক গাছতলায় মারা যান। ডাক্তার বললে, তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

গল্পের এতটা পর্যন্ত আমার পূর্বেই জানা ছিল। কেমন একটা উচ্চ ভাবের মেজাজে এঁরই কথা তুলে আমাদের ক্লাবে আমি বলেছিলুম, "এই নন্দকৃষ্ণের মতো লোক যারা সংসারে ফেল করে শুকিয়ে মরে গেছে—না রেখেছে নাম, না রেখেছে টাকা—তারাই ভগবানের সহযোগী হয়ে সংসারটাকে উপরের দিকে—"

এইটুকু মাত্র বলতেই ভরা পালের নৌকা হঠাৎ চড়ায় ঠেকে যাওয়ার মতো, আমার কথা মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেল। কারণ, আমাদের মধ্যে খুব একজন সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি-শালী লোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন—তিনি তাঁর চশমার উপর থেকে আমার প্রতি দৃষ্টি হেনে বলে উঠলেন, "হিয়ার হিয়ার!"

যাক গে। শোনা গেল, নন্দকৃষ্ণর বিধবা স্ত্রী তাঁর একটি মেয়েকে নিয়ে এই পাড়াতেই থাকেন। দেওয়ালির রাত্রে মেয়েটির জন্ম হয়েছিল বলে বাপ তার নাম দিয়েছিলেন দীপালি। বিধবা কোনো সমাজে স্থান পান না বলে সম্পূর্ণ একলা থেকে এই মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন। এখন মেয়েটির বয়স পঁচিশের উপর হবে। মায়ের শরীর রুগ্ণ এবং বয়সও কম নয়—কোন্‌দিন তিনি মারা যাবেন, এই মেয়েটির কোথাও কোনো গতি হবে না। বিশ্বপতি আমাকে বিশেষ অনুনয় করে বললেন, "যদি এর পাত্র জুটিয়ে দিতে পারেন তো সেটা একটা পুণ্যকর্ম হবে।"

আমি বিশ্বপতিকে শুকনো স্বার্থপর নিরেট কাজের লোক বলে মনে মনে একটু অবজ্ঞা করেছিলুম। বিধবার অনাথা মেয়েটির জন্য তাঁর এই আগ্রহ দেখে আমার মন গলে গেল। ভাবলুম, প্রাচীন পৃথিবীর মৃত ম্যামথের পাকযন্ত্রের মধ্যে থেকে খাদ্যবীজ বের করে পুঁতে দেখা গেছে, তার থেকে অঙ্কুর বেরিয়েছে—তেমনি মানুষের মনুষ্যত্ব বিপুল মৃতস্তূপের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ মরতে চায় না।

আমি বিশ্বপতিকে বললুম, "পাত্র আমার জানা আছে, কোনো বাধা হবে না। আপনারা কথা এবং দিন ঠিক করুন।"

"কিন্তু মেয়ে না দেখেই তো আর—"

"না দেখেই হবে।"

"কিন্তু, পাত্র যদি সম্পত্তির লোভ করে সে বড়ো বেশি নেই। মা মরে গেলে কেবল ঐ বাড়িখানি পাবে, আর সামান্য যদি কিছু পায়।"

"পাত্রের নিজের সম্পত্তি আছে, সেজন্যে ভাবতে হবে না।"

"তাঁর নাম বিবরণ প্রভৃতি—"

"সে এখন বলব না, তা হলে জানাজানি হয়ে বিবাহ ফেঁসে যেতে পারে।"

"মেয়ের মাকে তো তার একটা বর্ণনা দিতে হবে।"

"বলবেন, লোকটা অন্য সাধারণ মানুষের মতো দোষে গুণে জড়িত। দোষ এত বেশি নেই যে ভাবনা হতে পারে; গুণও এত বেশি নেই যে লোভ করা চলে। আমি যতদূর জানি তাতে কন্যার পিতামাতারা তাকে বিশেষ পছন্দ করে, স্বয়ং কন্যাদের মনের কথা ঠিক জানা যায় নি।"

বিশ্বপতিবাবু এই ব্যাপারে যখন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলেন তখন তাঁর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেল। যে কারবারে ইতিপূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার দরে বনছিল না, সেটাতে লোকসান দিয়েও রেজিস্ট্রি দলিল সই করবার জন্যে আমার উৎসাহ হল। তিনি যাবার সময় বলে গেলেন, "পাত্রটিকে বলবেন, অন্য সব বিষয়ে যাই হোক, এমন গুণবতী মেয়ে কোথাও পাবেন না।"

যে মেয়ে সমাজের আশ্রয় থেকে এবং শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত তাকে যদি হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা হলে সে মেয়ে কি আপনাকে উৎসর্গ করতে কিছুমাত্র কৃপণতা করবে। যে মেয়ের বড়ো রকমের আশা আছে তারই আশার অন্ত থাকে না। কিন্তু, এই দীপালির দীপটি মাটির, তাই আমার মতো মেটে ঘরের কোণে তার শিখাটির অমর্যাদা হবে না।

সন্ধ্যার সময় আলো জেলে বিলিতি কাগজ পড়ছি, এমন সময় খবর এল, একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বাড়িতে স্ত্রীলোক কেউ নেই, তাই ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। কোনো ভদ্র উপায় উদ্ভাবনের পূর্বেই মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রণাম করলে। বাইরে থেকে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি অত্যন্ত লাজুক মানুষ। আমি না তার মুখের দিকে চাইলুম, না তাকে কোনো কথা বললুম। সে বললে, "আমার নাম দীপালি।"

গলাটি ভারি মিষ্টি। সাহস করে মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, সে মুখ বুদ্ধিতে কোমলতাতে মাখানো। মাথায় ঘোমটা নেই— সাদা দিশি কাপড়, এখনকার ফ্যাশানে পরা। কী বলি ভাবছি, এমন সময় সে বললে, "আমাকে বিবাহ দেবার জন্যে আপনি কোনো চেষ্টা করবেন না।"

আর যাই হোক, দীপালির মুখে এমন আপত্তি আমি প্রত্যাশাই করি নি। আমি ভেবে রেখেছিলুম, বিবাহের প্রস্তাবে তার দেহ মন প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করলুম, "জানা অজানা কোনো পাত্রকেই তুমি বিবাহ করবে না?"

সে বললে, "না, কোনো পাত্রকেই না।"

যদিচ মনস্তত্ত্বের চেয়ে বস্তুতত্ত্বেই আমার অভিজ্ঞতা বেশি— বিশেষত নারীচিত্ত আমার কাছে বাংলা বানানের চেয়ে কঠিন, তবু কথাটার সাদা অর্থ আমার কাছে সত্য অর্থ ব'লে মনে হল না। আমি বললুম, "যে পাত্র আমি তোমার জন্যে বেছেচি সে অবজ্ঞা করবার যোগ্য নয়।"

দীপালি বললে, "আমি তাঁকে অবজ্ঞা করি নে, কিন্তু আমি বিবাহ করব না।"

আমি বললুম, "সে লোকটিও তোমাকে মনের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে।"

"কিন্তু না, আমাকে বিবাহ করতে বলবেন না।"

"আচ্ছা, বলব না, কিন্তু আমি কি তোমাদের কোনো কাজে লাগতে পারি নে।"

"আমাকে যদি কোনো মেয়ে-ইস্কুলে পড়াবার কাজ জুটিয়ে দিয়ে এখান থেকে কলকাতায় নিয়ে যান তা হলে ভারি উপকার হয়।"

বললুম, "কাজ আছে, জুটিয়ে দিতে পারব।"

এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়। মেয়ে-ইস্কুলের খবর আমি কী জানি। কিন্তু, মেয়ে-ইস্কুল স্থাপন করতে তো দোষ নেই।

দীপালি বললে, "আপনি আমাদের বাড়ি গিয়ে একবার মায়ের সঙ্গে এ কথার আলোচনা করে দেখবেন?"

আমি বললুম, "আমি কাল সকালেই যাব।"

দীপালি চলে গেল। কাগজ-পড়া আমার বন্ধ হল। ছাতের উপর বেরিয়ে এসে চৌকিতে বসলুম। তারাগুলোকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোটি কোটি যোজন দূরে থেকে তোমরা কি সত্যই মানুষের জীবনের সমস্ত কর্মসূত্র ও সম্বন্ধসূত্র নিঃশব্দে বসে বসে বুনছ।'

এমন সময়ে কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ বিশ্বপতির মেজো ছেলে শ্রীপতি ছাতে এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে যে আলোচনাটা হল, তার মর্ম এই—

শ্রীপতি দীপালিকে বিবাহ করবার আগ্রহে সমাজ ত্যাগ করতে প্রস্তুত। বাপ বলেন, এমন দুষ্কার্য করলে তিনি তাকে ত্যাগ করবেন। দীপালি বলে, তার জন্যে এত বড়ো দুঃখ অপমান ও ত্যাগ স্বীকার কেউ করবে এমন যোগ্যতা তার নেই। তা ছাড়া শ্রীপতি শিশুকাল থেকে ধনীগৃহে লালিত; দীপালির মতে, সে সমাজচ্যুত এবং নিরাশ্রয় হয়ে দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। এই নিয়ে তর্ক চলছে, কিছুতে তার মীমাংসা হচ্ছে না। ঠিক এই সংকটের সময় আমি মাঝখানে প'ড়ে এদের মধ্যে আর-একটা পাত্রকে খাড়া ক'রে সমস্যার জটিলতা অত্যন্ত বাড়িয়ে তুলেছি। এইজন্যে শ্রীপতি আমাকে এই নাটকের থেকে প্রুফশিটের কাটা অংশের মতো বেরিয়ে যেতে বলছে।

আমি বললুম, "যখন এসে পড়েছি তখন বেরোচ্ছি নে। আর, যদি বেরোই তা হলে গ্রন্থি কেটে তবে বেরিয়ে পড়ব।"

বিবাহের দিনপরিবর্তন হল না। কেবলমাত্র পাত্রপরিবর্তন হল। বিশ্বপতির অনুনয় রক্ষা করেছি, কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন নি। দীপালির অনুনয় রক্ষা করি নি, কিন্তু ভাবে বোধ হল সে সন্তুষ্ট হয়েছে। ইস্কুলে কাজ খালি ছিল কি না জানি নে কিন্তু আমার ঘরে কন্যার স্থান শূন্য ছিল, সেটা পূর্ণ হল। আমার মতো বাজে লোক যে নিরর্থক নয়, আমার অর্থই সেটা শ্রীপতির কাছে প্রমাণ করে দিলে। তার গৃহদীপ আমার কলকাতার বাড়িতেই জ্বলল। ভেবেছিলুম, সময়মত বিবাহ না সেরে রাখার মুলতবি অসময়ে বিবাহ করে পূরণ করতে হবে, কিন্তু দেখলুম উপর-ওয়ালা প্রসন্ন হলে দুটো-একটা ক্লাস ডিঙিয়েও প্রোমোশন পাওয়া যায়। আজ পঞ্চান্ন বছর বয়সে আমার ঘর নাৎনিতে ভরে গেছে, উপরন্তু একটি নাতিও জুটেছে। কিন্তু বিশ্বপতিবাবুর সঙ্গে আমার কারবার বন্ধ হয়ে গেছে— কারণ, তিনি পাত্রটিকে পছন্দ করেন নি।

পৌষ ১৩২৪

নামঞ্জুর গল্প

আমাদের আসর জমেছিল পোলিটিক্যাল লঙ্কাকাণ্ডের পালায়। হাল আমলের উত্তরকাণ্ডে আমরা সম্পূর্ণ ছুটি পাই নি বটে, কিন্তু গলা ভেঙেছে, তা ছাড়া সেই অগ্নিদাহের খেলা বন্ধ।

বঙ্গভঙ্গের রঙ্গভূমিতে বিদ্রোহীর অভিনয় শুরু হল। সবাই জানেন, এই নাট্যের পঞ্চম অঙ্কের দৃশ্য আলিপুর পেরিয়ে পৌঁছল আণ্ডামানের সমুদ্রকূলে। পারানির পাথেয় আমার যথেষ্ট ছিল, তবু গ্রহের গুণে এ পারের হাজতেই আমার ভোগসমাপ্তি। সহযোগীদের মধ্যে ফাঁসিকাঠ পর্যন্ত যাদের সর্বোচ্চ প্রোমোশন হয়েছিল, তাদের প্রণাম ক'রে আমি পশ্চিমের এক শহরের কোণে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় পসার জমিয়ে তুললেম।

তখনো আমার বাবা বেঁচে। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের এক বড়ো মহকুমার সরকারি উকিল। উপাধি ছিল রায়বাহাদুর। তিনি বিশেষ-একটু ঘটা করেই আমার বাড়ি আসা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে আমার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল কি না অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু হয়েছিল পকেটের সঙ্গে। মনি-অর্ডারের সম্পর্ক পর্যন্ত ছিল না। যখন আমি হাজতে তখনই মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। আমার পাওনা শাস্তিটা গেল তাঁর উপর দিয়েই।

আমার পিসি ব'লে যিনি পরিচিত তিনি আমার স্বোপার্জিত কিম্বা আমার পৈতৃক, তা নিয়ে কারও কারও মনে সংশয় আছে। তার কারণ, আমি পশ্চিমে যাবার পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সম্পূর্ণই অব্যক্ত ছিল। তিনি আমার কে তা নিয়ে সন্দেহ থাকে তো থাক্, কিন্তু তাঁর স্নেহ না পেলে সেই আত্মীয়তার অরাজকতা-কালে আমাকে বিষম দুঃখ পেতে হত। তিনি আজন্ম পশ্চিমেই কাটিয়েছেন; সেইখানেই বিবাহ, সেইখানেই বৈধব্য। সেইখানেই স্বামীর বিষয়সম্পত্তি। বিধবা তাই নিয়েই বন্ধ ছিলেন।

তাঁর আরও-একটি বন্ধন ছিল। বালিকা অমিয়া। কন্যাটি স্বামীর বটে, স্ত্রীর নয়। তার মা ছিল পিসিমার এক যুবতী দাসী, জাতিতে কাহার। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েটিকে তিনি ঘরে এনে পালন করছেন—সে জানেও না যে, তিনি তার মা নন।

এমন অবস্থায় তাঁর আর-একটি বন্ধন বাড়ল, সে হচ্ছে আমি স্বয়ং। যখন জেল-খানার বাইরে আমার স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ তখন এই বিধবাই আমাকে তাঁর ঘরে এবং হৃদয়ে আশ্রয় দিলেন। তার পরে বাবার দেহান্তে যখন জানা গেল, উইলে তিনি আমাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করেন নি, তখন সুখে দুঃখে আমার পিসির চোখে জল পড়ল। বুঝলেন, আমার পক্ষে তাঁর প্রয়োজন ঘুচল। তাই বলে স্নেহ তো ঘুচল না।

তিনি বললেন, "বাবা, যেখানেই থাক আমার আশীর্বাদ রইল।"

আমি বললেম, "সে তো থাকবেই, সেই সঙ্গে তোমাকেও থাকতে হবে, নইলে আমার চলবে না। হাজত থেকে বেরিয়ে যে মাকে আর দেখতে পাই নি তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে তোমার কাছে নিয়ে এসেছেন।"

পিসিমা তাঁর এতকালের পশ্চিমের ঘর-সংসার তুলে দিয়ে আমার সঙ্গে কলকাতায়

চলে এলেন। আমি হেসে বললেম, "তোমার স্নেহগঙ্গার ধারাকে পশ্চিম থেকে পূর্বে বহন করে এনেছি, আমি কলির ভগীরথ।"

পিসিমা হাসলেন, আর চোখের জল মুছলেন। তাঁর মনের মধ্যে কিছু দ্বিধাও হল, বললেন, "অনেক দিন থেকে ইচ্ছে ছিল, মেয়েটার কোনো-একটা গতি ক'রে শেষ বয়সে তীর্থ করে বেড়াব— কিন্তু, বাবা, আজ যে তার উল্টো পথে টেনে নিয়ে চললি।"

আমি বললুম, "পিসিমা, আমিই তোমার সচল তীর্থ। যে-কোনো ত্যাগের ক্ষেত্রেই তুমি আত্মদান কর'-না কেন, সেইখানেই তোমার দেবতা আপনি এসে তা গ্রহণ করবেন। তোমার যে পুণ্য আত্মা।"

সব চেয়ে একটা যুক্তি তাঁর মনে প্রবল হল। তাঁর আশঙ্কা ছিল, স্বভাবতই আমার প্রবৃত্তির ঝোঁকটা আণ্ডামান-মুখো, অতএব কেউ আমাকে সামলাবার না থাকলে অবশেষে একদিন পুলিসের বাহুবন্ধনে বন্ধ হবই। তাঁর মতলব ছিল, যে কোমল বাহুবন্ধন তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ও স্থায়ী আমার জন্য তারই ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে তিনি তীর্থভ্রমণে বার হবেন। আমার বন্ধন নইলে তাঁর মুক্তি নেই।

আমার চরিত্র সম্বন্ধে এইখানে ভুল হিসেবে করেছিলেন। কুষ্ঠিতে আমার বধ-বন্ধনের গ্রহটি অন্তিমে আমাকে শকুনি-গৃধিনীর হাতে স'পে দিতে নারাজ ছিলেন না, কিন্তু প্রজাপতির হাতে নৈব নৈব চ। কন্যাকর্তারা ত্রুটি করেন নি, তাঁদের সংখ্যাও অজস্র। আমার পৈতৃক সম্পত্তির বিপুল সচ্ছলতার কথা সকলেই জানত; অতএব, ইচ্ছা করলে সম্ভবপর শ্বশুরকে দেউলে করে দিয়ে কন্যার সঙ্গে সঙ্গে বিশ-প'চিশ হাজার টাকা নহবতে সাহানা বাজিয়ে হাসতে হাসতে আদায় করতে পারতেম। করি নি। আমার ভাবী চরিত-লেখক এ কথা যেন স্মরণ রাখেন যে, স্বদেশসেবার সংকল্পের কাছে এককালীন আমার এই বিশ-প'চিশ হাজার টাকার ত্যাগ। জমা খরচের অঙ্কটা অদৃশ্য কালীতে লেখা আছে ব'লে যেন আমার প্রশংসার হিসাব থেকে বাদ না পড়ে। পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে আমার মহৎ চরিত্রের এইখানে মিল আছে।

পিসিমা শেষ পর্যন্ত আশা ছাড়েন নি। এমন সময়ে ভারতের পোলিটিক্যাল আকাশে আমাদের সেই ক্ষাত্রযুগের পরবর্তী যুগের হাওয়া বইল। পূর্বেই বলেছি, এখনকার পালায় আমরা প্রধান নায়ক নই, তবু ফুট-লাইটের অনেক পিছনে মাঝে মাঝে নিস্তেজভাবে আমাদের আসা-যাওয়া চলছে। এত নিস্তেজ যে, পিসিমা আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্তই ছিলেন। আমার জন্যে কালীঘাটে স্বস্ত্যয়ন করবার ইচ্ছে এক কালে তাঁর ছিল, কিন্তু ইদানিং আমার ভাগ্য-আকাশে লাল-পাগড়ির রক্তমেঘ একেবারে অদৃশ্য থাকাতে তাঁর আর খেয়াল রইল না। এইটেই ভুল করলেন।

সেদিন পুজোর বাজারে ছিল খদ্দরের পিকেটিং। নিতান্ত কেবল দর্শকের মতন গিয়েছিলেম— আমার উৎসাহের তাপমাত্রা ৯৮ অঙ্কেরও নীচে ছিল, নাড়ীতে বেশি বেগ ছিল না। সেদিন যে আমার কোনো আশঙ্কার কারণ থাকতে পারে সে খবর আমার কুষ্ঠির নক্ষত্র ছাড়া আর-সবার কাছে ছিল অগোচর। এমন সময় খদ্দরপ্রচারকারিণী কোনো বাঙালি মহিলাকে পুলিস সার্জন দিলে ধাক্কা। মুহূর্তের মধ্যেই আমার অহিংস অসহযোগের ভাবখানা প্রবল দুঃসহযোগে পরিণত হল। সুতরাং অনতিবিলম্বে থানায় হল আমার গতি। তার পরে যথানিয়মে হাজতের লালায়িত কবলের থেকে জেলখানার অন্ধকার জঠরদেশে অবতরণ করা গেল। পিসিমাকে ব'লে গেলেম, "এইবার

কিছুকালের জন্যে তোমার মুক্তি। আপাতত আমার উপযুক্ত অভিভাবকের অভাব রইল না, অতএব এই সুযোগে তুমি তীর্থভ্রমণ করে নাও গে। অমিয়া থাকে কলেজের হস্‌টেলে; বাড়িতেও দেখবার-শোনবার লোক আছে; অতএব, এখন তুমি দেবসেবায় ষোলো-আনা মন দিলে দেব মানব কারও কোনো আপত্তির কথা থাকবে না।"

জেলখানাকে জেলখানা বলেই গণ্য করে নিয়েছিলেম। সেখানে কোনোরকম দাবি-দাওয়া আবদার উৎপাত করি নি। সেখানে সুখ সম্মান সৌজন্য সুহৃৎ ও সুখাদ্যের অভাবে অত্যন্ত বেশি বিস্মিত হই নি। কঠোর নিয়মগুলোকে কঠোরভাবেই মেনে নিয়েছিলেম। কোনোরকম আপত্তি করাটাই লজ্জার বিষয় ব'লে মনে করতেম।

মেয়াদ পুরো হবার কিছু পূর্বেই ছুটি পাওয়া গেল। চারি দিকে খুব হাততালি। মনে হল যেন বাংলাদেশের হাওয়ায় বাজতে লাগল, 'এন্‌কোর! এক্‌সেলেন্ট্‌!' মনটা খারাপ হল। ভাবলেম, যে ভুগল সেই কেবল ভুগল— আর, মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, রস পেলে দশে মিলে। সেও বেশিক্ষণ নয়; নাট্যমঞ্চের পর্দা পড়ে যায়, আলো নেভে, তার পরে ভোলবার পালা। কেবল বেড়ি-হাতকড়ার দাগ যার হাড়ে গিয়ে লেগেছে তারই চিরদিন মনে থাকে।

পিসিমা এখনো তীর্থে। কোথায়, তার ঠিকানাও জানি নে। ইতিমধ্যে পুজোর সময় কাছে এল। একদিন সকালবেলায় আমার সম্পাদক-বন্ধু এসে উপস্থিত। বললেন, "ওহে, পুজোর সংখ্যার জন্যে একটা লেখা চাই।"

জিজ্ঞাসা করলেম, "কবিতা?"

"আরে, না। তোমার জীবনবৃত্তান্ত।"

"সে তো তোমার এক সংখ্যায় ধরবে না।"

"এক সংখ্যায় কেন। ক্রমে ক্রমে বেরোবে।"

"সতীর মৃতদেহ সুদর্শনচক্রে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছড়ানো হয়েছিল। আমার জীবনচরিত সম্পাদকি চক্রে তেমনি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে সংখ্যায় সংখ্যায় ছড়িয়ে দেবে, এটা আমার পছন্দসই নয়। জীবনী যদি লিখি গোটা আকারে বের করে দেব।"

"নাহয় তোমার জীবনের কোনো-একটা বিশেষ ঘটনা লিখে দাও-না।"

"কিরকম ঘটনা।"

"তোমার সব চেয়ে কঠোর অভিজ্ঞতা, খুব যাতে ঝাঁজ।"

"কী হবে লিখে।"

"লোকে জানতে চায় হে।"

"এত কৌতূহল? আচ্ছা, বেশ, লিখব।"

"মনে থাকে যেন, সব চেয়ে যেটাতে তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা।"

"অর্থাৎ, সব চেয়ে যেটাতে দুঃখ পেয়েছি লোকের তাতেই সব চেয়ে মজা। আচ্ছা, বেশ। কিন্তু, নামটামগুলো অনেকখানি বানাতে হবে।"

"তা তো হবেই। যেগুলো একেবারে মারাত্মক কথা তার ইতিহাসের চিহ্ন বদল না করলে বিপদ আছে। আমি সেইরকম মরিয়া-গোছের জিনিসই চাই। পেজ প্রতি তোমাকে—"

"আগে লেখাটা দেখো, তার পরে দরদস্তুর হবে।"

"কিন্তু, আর-কাউকে দিতে পারবে না বলে রাখছি।" যিনি যত দর হাঁকুন, আমি

তার উপরে—"

"আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে।"

শেষকালটা উঠে যাবার সময় বলে গেলেন, "তোমাদের ইনি— বুঝতে পারছ? নাম করব না—ঐ-যে তোমাদের সাহিত্যধুরন্ধর—মস্ত লেখক ব'লে বড়াই—কিন্তু, যা বলো তোমার স্টাইলের কাছে তার স্টাইল যেন ডসনের বুট আর তালতলার চটি।"

বুঝলেম আমাকে উপরে চড়িয়ে দেওয়াটা উপলক্ষমাত্র, তুলনায় ধুরন্ধরকে নাবিয়ে দেওয়াটাই লক্ষ্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। এইবার আমার কঠোর অভিজ্ঞতার কাহিনী।—

'সন্ধ্যা' কাগজ যেদিন থেকে পড়তে শুরু সেইদিন থেকেই আহারবিহার সম্বন্ধে আমার কড়া ভোগ। সেটাকে জেলযাত্রার রিহার্সাল বলা হত। দেহের প্রতি অনাদরের অভ্যাস পাকা হয়ে উঠল। তাই প্রথমবার যখন ঠেললে হাজতে, প্রাণপুরুষ বিচলিত হয় নি। তার পর বেরিয়ে এসে নিজের 'পরে কারও সেবাশুশ্রূষার হস্তক্ষেপমাত্র বর্দাস্ত করি নি। পিসিমা দুঃখবোধ করতেন। তাঁকে বলতেম, "পিসিমা, স্নেহের মধ্যে মুক্তি, সেবার মধ্যে বন্ধন। তা ছাড়া, একের শরীরে অন্য শরীরধারীর আইন খাটানোকে বলে ডাইয়ার্কি, স্বৈরাজ্য—সেইটের বিরুদ্ধে আমাদের অসহযোগ।"

তিনি নিশ্বাস ছেড়ে বলতেন, "আচ্ছা বাবা, তোমাকে বিরক্ত করব না।"

নির্বোধ, মনে মনে ভাবতেম বিপদ কাটল।

ভুলেছিলেম, স্নেহসেবার একটা প্রচ্ছন্ন রূপ আছে। তার মায়া এড়ানো শক্ত। অকিঞ্চন শিব যখন তাঁর ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দারিদ্র্যগৌরবে মগ্ন তখন খবর পান না যে, লক্ষ্মী কোন্-এক সময়ে সেটা নরম রেশম দিয়ে বুনে রেখেছেন, তার সোনার সুতোর দামে সূর্যনক্ষত্র বিকিয়ে যায়। যখন 'ভিক্ষের অন্ন খাচ্ছি' ব'লে সন্ন্যাসী নিশ্চিন্ত তখন জানেন না যে, অন্নপূর্ণা এমন মসলায় বানিয়েছেন যে, দেবরাজ প্রসাদ পাবার জন্যে নন্দীর কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করতে থাকেন। আমার হল সেই দশা। শয়নে বসনে অশনে পিসিমার সেবার হস্ত গোপনে ইন্দ্রজাল বিস্তার করতে লাগল, সেটা দেশাত্মবোধীর অন্যমনস্ক চোখে পড়ল না। মনে মনে ঠিক দিয়ে বসে আছি, তপস্যা আছে অক্ষুণ্ণ। চমক ভাঙল জেলখানায় গিয়ে। পিসিমা ও পুলিসের ব্যবস্থার মধ্যে যে-একটা ভেদ আছে, কোনো-রকম অদ্বৈতবুদ্ধি দ্বারা তার সমন্বয় করতে পারা গেল না। মনে মনে কেবলই গীতা আওড়াতে লাগলেম; নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। হায় রে তপস্বী, কখন যে পিসিমার নানা গুণ নানা উপকরণ-সংযোগে হৃদয়দেশ পেরিয়ে একেবারে পাকযন্ত্রে প্রবেশ করেছে, তা জানতেও পারি নি। জেলখানায় এসে সেই জায়গাটাতে বিপাক ঘটতে লাগল।

ফল হল এই যে, বজ্রাঘাত ছাড়া আর-কিছুতে যে শরীর কাবু হত না সে পড়ল অসুস্থ হয়ে। জেলের পেয়াদা যদি-বা ছাড়লে জেলের রোগগুলোর মেয়াদ আর ফুরোতে চায় না। কখনো মাথা ধরে, হজম প্রায় হয় না, বিকেলবেলা জ্বর হতে থাকে। ক্রমে যখন মালাচন্দন হাততালি ফিকে হয়ে এসেছে তখনো এ আপদগুলো টন্‌টনে হয়ে রইল।

মনে মনে ভাবি, পিসিমা তো তীর্থ করতে গেছেন, তাই ব'লে অমিয়াটার কি

ধর্মজ্ঞান নেই। কিন্তু, দোষ দেব কাকে। ইতিপূর্বে অসুখে-বিসুখে আমার সেবা করবার জন্যে পিসিমা তাকে অনেকবার উৎসাহিত করেছেন—আমিই বাধা দিয়ে বলেছি, ভালো লাগে না।

পিসিমা বলেছেন, "অমিয়ার শিক্ষার জন্যেই বলছি, তোর আরামের জন্যে নয়।"

আমি বলেছি, "হাসপাতালে নার্সিং করতে পাঠাও-না।"

পিসিমা রাগ করে আর জবাব করেন নি।

আজ শুয়ে শুয়ে মনে মনে ভাবছি, 'নাহয় এক সময়ে বাধাই দিয়েছি, তাই বলে কি সেই বাধাই মানতে হবে। গুরুজনের আদেশের 'পরে এত নিষ্ঠা এই কলিযুগে!'

সাধারণত নিকট সংসারের ছোটোবড়ো অনেক ব্যাপারই দেশাত্মবোধীর চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু, অসুখ ক'রে পড়ে আছি বলে আজকাল দৃষ্টি হয়েছে প্রখর। লক্ষ্য করলেম, আমার অবর্তমানে অমিয়ারও দেশাত্মবোধ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে আমার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষায় তার এত অভাবনীয় উন্নতি হয় নি। আজ অসহযোগের অসহ্য আবেগে সে কলেজ-ত্যাগিনী; ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতেও তার হৃৎকম্প হয় না; অনাথাসদনের চাঁদার জন্যে অপরিচিত লোকের বাড়িতে গিয়েও সে ঝুলি ফিরিয়ে বেড়ায়। এও লক্ষ্য করে দেখলেম, অনিল তার এই কঠিন অধ্যবসায় দেখে তাকে দেবী ব'লে ভক্তি করে—ওর জন্মদিনে সেই ভাবেরই একটা ভাঙা ছন্দের স্তোত্র সে সোনার কালীতে ছাপিয়ে ওকে উপহার দিয়েছিল।

আমাকেও ঐ ধরনের একটা-কিছু বানাতে হবে, নইলে অসুবিধা হচ্ছে। পিসিমার আমলে চাকরবাকরগুলো যথানিয়মে কাজ করত; হাতের কাছে কাউকে না কাউকে পাওয়া যেত। এখন এক-গ্লাস জলের দরকার হলে আমার মেদিনীপুরবাসী শ্রীমান জলধরের অকস্মাৎ অভ্যাগমের প্রত্যাশায় চাতকের মতো তাকিয়ে থাকি; সময় মিলিয়ে ওষুধ খাওয়া সম্বন্ধে নিজের ভোলা মনের 'পরেই একমাত্র ভরসা। আমার চিরদিনের নিয়মবিরুদ্ধ হলেও রোগশয্যায় হাজিরে দেবার জন্যে অমিয়াকে দুই-একবার ডাকিয়ে এনেছি; কিন্তু দেখতে পাই, পায়ের শব্দ শুনলেই সে দরজার দিকে চমকে তাকায়, কেবলই উস্‌খুস্‌ করতে থাকে। মনে দয়া হয়; বলি, "অমিয়া, আজ নিশ্চয় তোদের মিটিং আছে।"

অমিয়া বলে, "তা হোক-না দাদা, এখনো আর-কিছুক্ষণ—"

আমি বলি, "না না, সে কি হয়। কর্তব্য সব আগে।"

কিন্তু, প্রায়ই দেখতে পাই, কর্তব্যের অনেক আগেই অনিল এসে উপস্থিত হয়। তাতে অমিয়ার কর্তব্য-উৎসাহের পালে যেন দম্‌কা হাওয়া লাগে, আমাকে বড়ো বেশি-কিছু বলতে হয় না।

শুধু অনিল নয়, বিদ্যালয়-বর্জক আরও অনেক উৎসাহী যুবক আমার বাড়ির একতলায় বিকেলে চা এবং ইন্‌স্‌পিরেশন গ্রহণ করতে একত্র হয়। তারা সকলেই অমিয়াকে যুগলক্ষ্মী ব'লে সম্ভাষণ করে। একরকম পদবী আছে, যেমন রায়বাহাদুর, পাট-করা চাদরের মতো, যাকেই দেওয়া যায় নির্ভাবনায় কাঁধে ঝুলিয়ে বেড়াতে পারে। আর-একরকম পদবী আছে, যার ভাগ্যে জোটে সে বেচারা নিজেকে পদবীর সঙ্গে মাপসই করবার জন্যে অহরহ উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। স্পষ্টই বুঝলেম, অমিয়ার সেই অবস্থা সর্বদাই অত্যন্ত বেশি উৎসাহপ্রদীপ্ত হয়ে না থাকলে তাকে মানায় না।

খেতে শুতে তার সময় না-পাওয়াটা বিশেষ সমারোহ করেই ঘটে। এ পাড়ায় ও পাড়ায় খবর পৌঁছয়। কেউ যখন বলে এমন করলে শরীর টিঁকবে কী করে, সে একটুখানি হাসে—আশ্চর্য সেই হাসি। ভক্তরা বলে, "আপনি একটু বিশ্রাম করুন গে, একরকম করে কাজটা সেরে নেব"; সে তাতে ক্ষুন্ন হয়—ক্লান্তি থেকে বাঁচানোই কি বড়ো কথা। দুঃখগৌরব থেকে বঞ্চিত করা কি কম বিড়ম্বনা। তার ত্যাগস্বীকারের ফর্দের মধ্যে আমিও পড়ে গেছি। আমি যে তার এত বড়ো জেল-খাটা দাদা—উল্লাসকর-কানাই-বারীন-উপেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে এক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে যার স্থান, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পার হয়ে তার যে দাদা গীতার শেষ দিকের অধ্যায়ের মুখে অগ্রসর হয়েছে, তাকেও যথোচিত পরিমাণে দেখবার সে সময় পায় না। এত বড়ো স্যাক্রিফাইস! যেদিন কোনো কারণে তার দলের লোকের অভাব হয়েছে সেদিন আমিও তার উৎসাহের মৌতাত জোগাবার জন্য বলেছি, "অমিয়া, ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ তোর জন্যে নয়, তোর জন্যে বর্তমান যুগ।" আমার কথাটা সে গম্ভীরমুখে নীরবে মেনে নিয়েছে। জেলে যাওয়ার পর থেকে আমার হাসি অন্তঃশীলা বইছে—যারা আমাকে চেনে না তারা বাইরে থেকে আমাকে খুব গম্ভীর বলেই মনে করে।

বিছানায় একলা পড়ে পড়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি : বিমুখা বান্ধবা যান্তি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সেদিন কোথা থেকে একটা ন্যাঙলা কুকুর আমার বারান্দার কোণে আশ্রয় খুঁজছিল। গায়ের রোঁওয়া উঠে গেছে, জীর্ণ চামড়ার তলায় কঙ্কালের আব্রু নেই—আধমরা তার অবস্থা। অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেম। আজ ভাবছিলেম, এতটা বেশি ঝাঁজের সঙ্গে তাকে তাড়ালেম কেন। বেগানা কুকুর ব'লে নয়, ওর সর্বাঙ্গে মরণদশা দেখা দিয়েছে ব'লে। প্রাণের সংগীতসভায় ওর অস্তিত্বটা বেসুরো, ওর রুগ্‌ণতা বেয়াদবি। ওর সঙ্গে নিজের তুলনা মনে এল। চারি দিকের চলমান প্রাণের ধারার মধ্যে আমার অস্বাস্থ্য একটা স্থাবর পদার্থ, স্রোতের বাধা। সে দাবি করে, 'শিয়রের কাছে চুপ করে বসে থাকো।' প্রাণের দাবি, 'দিকে বিদিকে চ'লে বেড়াও।' রোগের বাঁধনে যে নিজে বন্ধ, অরোগীকে সে বন্দী করতে চায়—এটা একটা অপরাধ। অতএব, জীবলোকের উপর সব দাবি একেবারে পরিত্যাগ করব মনে ক'রে গীতা খুলে বসলেম। প্রায় যখন স্থিতধী অবস্থায় এসে পৌঁচেছি, মনটা রোগ-অরোগের দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে গেছে, এমন সময় অনুভব করলেম কে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। গীতা থেকে চোখ নামিয়ে দেখি, পিসিমার পোষ্যমণ্ডলীভুক্ত একটি মেয়ে। এ পর্যন্ত দূরের থেকেই সাধারণভাবেই তাকে জানি; বিশেষভাবে তার পরিচয় জানি নে—তার নাম পর্যন্ত আমার অবিদিত। মাথায় ঘোমটা টেনে ধীরে ধীরে সে আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

তখন মনে পড়ল, মাঝে মাঝে সে আমার দরজার বাইরের কোণে ছায়ার মতো এসে বারবার ফিরে ফিরে গেছে। বোধ করি সাহস করে ঘরে ঢুকতে পারে নি। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মাথা ধরার, গায়ে ব্যথার, ইতিবৃত্তান্ত সে আড়াল থেকে অনেকটা জেনে গিয়েছে। আজ সে লজ্জাভয় দূর ক'রে ঘরের মধ্যে এসে প্রণাম করে বসল। আমি যে একদিন একজন মেয়েকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে দুঃখস্বীকারের অর্ঘ নারীকে দিয়েছি, সে হয়তো বা দেশের সমস্ত মেয়ের হয়ে আমার পায়ের কাছে তারই প্রাপ্তিস্বীকার করতে এসেছে। জেল থেকে বেরিয়ে অনেক সভায় অনেক মালা পেয়েছি,

কিন্তু আজ ঘরের কোণে এই-যে অখ্যাত হাতের মানটুকু পেলেম এ আমার হৃদয়ে এসে বাজল। নিস্ত্রৈগুণ্য হবার উমেদার, এই জেল-খাটা পুরুষের বহু কালের শুকনো চোখ ভিজে ওঠবার উপক্রম করলে। পূর্বেই বলেছি, সেবায় আমার অভ্যেস নাই। কেউ পা টিপে দিতে এলে ভালোই লাগত না, ধমকে তাড়িয়ে দিতেম। আজ এই সেবা প্রত্যাখ্যান করার স্পর্ধা মনেও উদয় হল না।

খুলনা জেলায় পিসিমার আদি শ্বশুরবাড়ি। সেখানকার গ্রামসম্পর্কের দুটি-চারটি মেয়েকে পিসিমা আনিয়ে রেখেছেন। পিসিমার কাজকর্মে পুজা-অর্চনায় তারা ছিল তাঁর সহকারিণী। তাঁর নানারকম ক্রিয়াকর্মে তাদের না হলে তাঁর চলত না। এ বাড়িতে আর সর্বত্রই অমিয়ার অধিকার ছিল, কেবল পুজোর ঘরে না। অমিয়া তার কারণ জানত না, জানবার চেষ্টাও করত না। পিসিমার মনে ছিল, অমিয়া ভালো-রকম লেখাপড়া শিখে এমন ঘরে বিয়ে করবে যেখানে আচার-বিচারের বাঁধাবাঁধি নেই, আর দেবদ্বিজ যেখান থেকে খাতির না পেয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসেন। এটা আক্ষেপের কথা। কিন্তু, এ ছাড়া ওর আর-কোনো গতি হতেই পারে না— বাপের পাতক থেকে মেয়েকে সম্পূর্ণ বাঁচাবে কে। সেই কারণে অমিয়াকে তিনি ঢিলেমির ঢালু তট বেয়ে আধুনিক আচারহীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হতে বাধা দেন নি। ছেলেবেলা থেকে অঙ্কে আর ইংরেজিতে ক্লাসে সে হয়েছে ফার্স্ট। বছরে বছরে মিশনারি ইস্কুল থেকে ফ্রক্‌ প'রে বেণী দুলিয়ে চারটে-পাঁচটা ক'রে প্রাইজ নিয়ে এসেছে। যেবারে দৈবাৎ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছে সেবারে শোবার ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে; প্রায়োপবেশন করতে যায় আর-কি। এমনি ক'রে পরীক্ষা-দেবতার কাছে সিদ্ধির মানত ক'রে সে তারই সাধনায় দীর্ঘকাল তন্ময় ছিল। অবশেষে অসহযোগের যোগিনীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পরীক্ষাদেবীর বর্জন-সাধনাতেও সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হল। পাস্‌-গ্রহণেও যেমন পাস্‌-ছেদনেও তেমনি, কিছুতেই সে কারও চেয়ে পিছিয়ে থাকবার মেয়ে নয়। পড়াশুনো করে তার যে খ্যাতি— পড়াশুনো ছেড়ে তার চেয়ে খ্যাতি অনেক বেশি বেড়ে গেল। আজ যে-সব প্রাইজ তার হাতের কাছে ফিরছে তারা চলে, তারা বলে, তারা অশ্রুসলিলে গলে, তারা কবিতাও লেখে।

বলা বাহুল্য, পিসিমার পাড়াগেঁয়ে পোষ্য মেয়েগুলির 'পরে অমিয়ার একটুও শ্রদ্ধা ছিল না। অনাথাসদনে যে সময়ে চাঁদার টাকার চেয়ে অনাথারই অভাব বেশি সেই সময়ে এই মেয়েদের সেখানে পাঠাবার জন্যে পিসিমার কাছে অমিয়া অনেক আবেদন করেছে। পিসিমা বলেছেন, "সে কী কথা— এরা তো অনাথা নয়, আমি বেঁচে আছি কী করতে। অনাথ হোক সনাথ হোক, মেয়েরা চায় ঘর; সদনের মধ্যে তাদের ছাপ মেরে বস্তাবন্দী করে রাখা কেন। তোমার যদি এতই দয়া থাকে তোমার ঘর নেই নাকি।"

যা হোক, মেয়েটি যখন মাথা হেঁট ক'রে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আমি সংকুচিত অথচ বিগলিতচিত্তে একখানা খবরের কাগজ মুখের সামনে ধ'রে বিজ্ঞাপনের উপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেম। এমন সময় হঠাৎ অকালে অমিয়া ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত; নবযুগের উপযোগী ভাইফোঁটার একটা নূতন ব্যাখ্যা সে লিখেছে। সেইটে ইংরেজিতেও সে প্রচার করতে চায়; আমার কাছে তারই সাহায্য আবশ্যক। এই লেখাটির ওরিজিন্যাল আইডিয়াতে ভক্তদল খুব বিচলিত— এই নিয়ে তারা একটা

ধুমধাম করবে ব'লে কোমর বেঁধেছে।

ঘরে ঢুকেই সেবানিযুক্ত মেয়েটিকে দেখেই অমিয়ার মুখের ভাব অত্যন্ত শক্ত হয়ে উঠল। তার দেশবিশ্রুত দাদা যদি একটু ইশারামাত্র করত তা হলে তার সেবা করবার লোকের কি অভাব ছিল। এত মানুষ থাকতে শেষকালে কি এই—

থাকতে পারলে না। বললে, "দাদা, হরিমতিকে কি তুমি—"

প্রশ্নটা শেষ করতে না দিয়ে ফস্ ক'রে ব'লে ফেল্‌লেম, "পায়ে বড়ো ব্যথা করছিল।"

পুলিস-সার্জনের হাতে একটি মেয়ের অপমান বাঁচাতে গিয়ে জেলখানায় গিয়েছিলেম। আজ এক মেয়ের আক্রোশ থেকে আর-এক মেয়েকে আচ্ছাদন করবার জন্যে মিথ্যে কথা বলে ফেললুম। এবারেও শাস্তি শুরু হল। অমিয়া আমার পায়ের কাছে বসল। হরিমতি তাকে কুণ্ঠিত মৃদুকণ্ঠে কী-একটা বললে, সে ঈষৎ মুখ বাঁকিয়ে জবাবই করলে না। হরিমতি আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। তখন অমিয়া পড়ল আমার পা নিয়ে। বিপদ ঘটল আমার। কেমন করে বলি 'দরকার নেই, আমার ভালোই লাগে না।' এতদিন পর্যন্ত নিজের পায়ের সম্বন্ধে যে স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণ বজায় রেখেছিলেম, সে আর টেঁকে না বুঝি!

ধড়্‌ফড়্ করে উঠে বসে বললেম, "অমিয়া, দে তোর লেখাটা, ওটা তর্জমা করে ফেলি।"

"এখন থাক্-না দাদা। তোমার পা কামড়াচ্ছে, একটু টিপে দিই-না?"

"না, পা কেন কামড়াবে। হাঁ হাঁ, একটু কামড়াচ্ছে বটে। তা, দেখ্ অমি, তোর এই ভাইফোঁটার আইডিয়াটা ভারি চমৎকার। কী ক'রে তোর মাথায় এল তাই ভাবি। ঐ যে লিখেছিস বর্তমান যুগে ভাইয়ের ললাট অতি বিরাট, সমস্ত বাংলাদেশে বিস্তৃত, কোনো একটিমাত্র ঘরে তার স্থান হয় না—এটা খুব-একটা বড়ো কথা। দে, আমি লিখে ফেলি: With the advent of the present age, Brother's brow, waiting for its auspicious anointment from the sisters of Bengal, has grown immensely beyond the narrowness of domestic privacy, beyond the boundaries of the individual home.। একটা আইডিয়ার মতো আইডিয়া পেলে কলম পাগল হয়ে ছোটে।"

অমিয়ার পা টেপার ঝোঁক একেবারে থেমে গেল। মাথাটা ধরে ছিল, লিখতে একটুও গা লাগছিল না—তবু এস্পেরিনের বড়ি গিলে বসে গেলেম।

পরদিন দুপুরবেলায় আমার জলধর যখন দিবানিদ্রায় রত, দেউড়িতে দরোয়ানজি তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ছে, গলির মোড় থেকে ভালুক-নাচওয়ালার ডুগ্‌ডুগি শোনা যাচ্ছে, বিশ্রামহারা অমিয়া যখন যুগলক্ষ্মীর কর্তব্যপালনে বেরিয়েছে, এমন সময় দরজার বাইরে নির্জন বারান্দায় একটি ভীরু ছায়া দেখা দিলে। শেষকালে দ্বিধা করতে করতে কখন হঠাৎ এক সময়ে সেই মেয়েটি একটা হাতপাখা নিয়ে আমার মাথার কাছে বসে বাতাস করতে লাগল। বোঝা গেল, কাল অমিয়ার মুখের ভাবখানা দেখে পায়ে হাত দিতে আজ আর সাহস হল না। এতক্ষণে নববঙ্গের ভাইফোঁটা-প্রচারের মিটিং বসেছে। অমিয়া ব্যস্ত থাকবে। তাই ভাবছিলুম ভরসা করে ব'লে

ফেলি, পায়ে বড়ো ব্যথা করছে। ভাগ্যে বলি নি।—মিথ্যে কথাটা মনের মধ্যে যখন ইতস্তত করছে ঠিক সেই সময়ে অনাথাসদনের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট হাতে অমিয়ার প্রবেশ। হরিমতির পাখা-দোলনের মধ্যে হঠাৎ চমক লাগল; তার হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্য ও মুখশ্রীর বিবর্ণতা আন্দাজ করা শক্ত হল না। অনাথাসদনের এই সেক্রেটারির ভয়ে তার পাখার গতি খুব মৃদু হয়ে এল।

অমিয়া বিছানার এক ধারে ব'সে খুব শক্ত সুরে বললে, "দেখো দাদা, আমাদের দেশে ঘরে ঘরে কত আশ্রয়হারা মেয়ে বড়ো বড়ো পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে দিন কাটাচ্ছে, অথচ সে-সব ধনীঘরে তাদের প্রয়োজন একটুও জরুরি নয়। গরিব মেয়ে, যারা খেটে খেতে বাধ্য, এরা তাদেরই অন্ন-অর্জনে বাধা দেয় মাত্র। এরা যদি সাধারণের কাজে লাগে, যেমন আমাদের অনাথাসদনের কাজ—তা হলে—"

বুঝলেম, আমাকে উপলক্ষ করে হরিমতির উপরে বক্তৃতার এই শিলাবৃষ্টি। আমি বললেম, "অর্থাৎ, তুমি চলবে নিজের শখ-অনুসারে, আর আশ্রয়হীনারা চলবে তোমার হুকুম-অনুসারে। তুমি হবে অনাথাসদনের সেক্রেটারি, আর ওরা হবে অনাথাসদনের সেবাকারিণী! তার চেয়ে নিজেই লাগো সেবার কাজে; বুঝতে পারবে, সে কাজ তোমার অসাধ্য। অনাথাদের অতিষ্ঠ করা সহজ, সেবা করা সহজ নয়। দাবি নিজের উপরে করো, অন্যের উপরে কোরো না।"

আমার ক্ষাত্রস্বভাব, মাঝে মাঝে ভুলে যাই 'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্'। ফল হল এই যে, অমিয়া পিসিমারই সদস্যদের মধ্য থেকে আর-একটি মেয়েকে এনে হাজির করলে—তার নাম প্রসন্ন। তাকে আমার পায়ের কাছে বসিয়ে দিয়ে বললে, "দাদার পায়ে ব্যথা করে, তুমি পা টিপে দাও।" সে যথোচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমার পা টিপতে লাগল। এই হতভাগ্য দাদা এখন কোন্ মুখে বলে যে তার পায়ে কোনোরকম বিকার হয় নি। কেমন করে জানায় যে এমনতরো টেপাটেপি ক'রে কেবলমাত্র তাকে অপদস্ত করা হচ্ছে। মনে মনে বুঝলেম, রোগশয্যায় রোগীর আর স্থান হবে না। এর চেয়ে ভালো, নববঙ্গের ভাইফোঁটা-সমিতির সভাপতি হওয়া। পাখার হাওয়া আস্তে আস্তে থেমে গেল। হরিমতি স্পষ্ট অনুভব করলে, অস্ত্রটা তারই উদ্দেশে। এ হচ্ছে প্রসন্নকে দিয়ে হরিমতিকে উৎখাত করা। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। একটু পরে পাখাটা মাটিতে রেখে সে উঠে দাঁড়ালো। আমার পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে আস্তে আস্তে দুই পায়ে হাত বুলিয়ে চলে গেল।

আবার আমাকে গীতা খুলতে হল। তবুও শ্লোকের ফাঁকে ফাঁকে দরজার ফাঁকের দিকে চেয়ে দেখি—কিন্তু, সেই একটুখানি ছায়া আর কোথাও দেখা গেল না। তার বদলে প্রসন্ন প্রায়ই আসে, প্রসন্নের দৃষ্টান্তে আরও দুই-চারিটি মেয়ে অমিয়ার দেশ-বিশ্রুত দেশভক্ত দাদার সেবা করবার জন্যে জড়ো হল। অমিয়া এমন ব্যবস্থা করে দিলে, যাতে পালা করে আমার নিত্যসেবা চলে। এ দিকে শোনা গেল, হরিমতি একদিন কাউকে কিছু না ব'লে কলকাতা ছেড়ে তার পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে চলে গেছে।

মাসের বারোই তারিখে সম্পাদক-বন্ধু এসে বললেন, "একি ব্যাপার। ঠাট্টা নাকি। এই কি তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা।"

আমি হেসে বললেম, "পুজোর বাজারে চলবে না কি।"

"একেবারেই না। এটা তো অত্যন্তই হাল্কা-রকমের জিনিস।"

সম্পাদকের দোষ নেই। জেলবাসের পর থেকে আমার অশ্রুজল অন্তঃশীলা বইছে। লোকে বাইরে থেকে আমাকে খুব হাল্কা প্রকৃতির লোক মনে করে।

গল্পটা আমাকে ফেরত দিয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে এল অনিল। বললে, "মুখে বলতে পারব না, এই চিঠিটা পড়ুন।"

চিঠিতে অমিয়াকে, তার দেবীকে, যুগলক্ষ্মীকে বিবাহ করবার ইচ্ছে জানিয়েছে; এ কথাও বলেছে, অমিয়ার অসম্মতি নেই।

তখন অমিয়ার জন্মবৃত্তান্ত তাকে বলতে হল। সহজে বলতেম না; কিন্তু জানতেম, হীনবর্ণের 'পরে অনিল শ্রদ্ধাপূর্ণ করুণা প্রকাশ করে থাকে। আমি তাকে বললেম, "পূর্বপুরুষের কলঙ্ক জন্মের দ্বারাই স্খলিত হয়ে যায়, এ তো তোমরা অমিয়ার জীবনেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ। সে পদ্ম, তাতে পঙ্কের চিহ্ন নেই।"

নববঙ্গের ভাইফোঁটার সভা তার পরে আর জমল না। ফোঁটা রয়েছে তৈরি, কপাল মেরেছে দৌড়। আর শুনেছি, অনিল কলকাতা ছেড়ে কুমিল্লায় স্বরাজ-প্রচারের কী-একটা কাজ নিয়েছে।

অমিয়া কলেজে ভর্তি হবার উদ্যোগে আছে। ইতিমধ্যে পিসিমা তীর্থ থেকে ফিরে আসার পর শুশ্রূষার সাত-পাক বেড়ি থেকে আমার পা দুটো খালাস পেয়েছে।

অগ্রহায়ণ ১৩৩২

সংস্কার

চিত্রগুপ্ত এমন অনেক পাপের হিসাব বড়ো অক্ষরে তাঁর খাতায় জমা করেন যা থাকে পাপীর নিজের অগোচরে। তেমনি এমন পাপও ঘটে যাকে আমিই চিনি পাপ ব'লে, আর কেউ না। যেটার কথা লিখতে বসেছি সেটা সেই জাতের। চিত্রগুপ্তের কাছে জবাবদিহি করবার পূর্বে আগে-ভাগে কবুল করলে অপরাধের মাত্রাটা হাল্কা হবে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল কাল শনিবার দিনে। সেদিন আমাদের পাড়ায় জৈনদের মহলে কী-একটা পরব ছিল। আমার স্ত্রী কলিকাকে নিয়ে মোটরে করে বেরিয়েছিলুম—চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল বন্ধু নয়নমোহনের বাড়িতে।

স্ত্রীর কলিকা নামটি শ্বশুর-দত্ত, আমি ওর জন্য দায়ী নই। নামের উপযুক্ত তাঁর স্বভাব নয়, মতামত খুবই পরিস্ফুট। বড়োবাজারে বিলিতি কাপড়ের বিপক্ষে যখন পিকেট করতে বেরিয়েছিলেন, তখন দলের লোক ভক্তি ক'রে তাঁর নাম দিয়েছিল ধ্রুবব্রতা। আমার নাম গিরীন্দ্র; দলের লোক আমাকে আমার পত্নীর পতি ব'লেই জানে, স্বনামের সার্থকতার প্রতি লক্ষ করে না। বিধাতার কৃপায় পৈতৃক উপার্জনের গুণে আমারও কিঞ্চিৎ সার্থকতা আছে। তার প্রতি দলের লোকের দৃষ্টি পড়ে চাঁদা-আদায়ের সময়।

স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর স্বভাবের অমিল থাকলেই মিল ভালো হয়, শুকনো মাটির সঙ্গে জলধারার মতো। আমার প্রকৃতি অত্যন্ত ঢিলে, কিছুই বেশি ক'রে চেপে ধরি নে। আমার স্ত্রীর প্রকৃতি অত্যন্ত আঁট, যা ধরেন তা কিছুতেই ছাড়েন না। আমাদের এই বৈষম্যের গুণেই সংসারে শান্তিরক্ষা হয়।

কেবল একটা জায়গায় আমাদের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ঘটেছে তার আর মিটমাট হতে পারল না। কলিকার বিশ্বাস, আমি স্বদেশকে ভালোবাসি নে। নিজের বিশ্বাসের উপর তাঁর বিশ্বাস অটল—তাই আমার আন্তরিক দেশ-ভালোবাসার যতই প্রমাণ দিয়েছি, তাঁদের নির্দিষ্ট বাহ্য লক্ষণের সঙ্গে মেলে না ব'লে কিছুতেই তাকে দেশ-ভালোবাসা ব'লে স্বীকার করাতে পারি নে।

ছেলেবেলা থেকে আমি গ্রন্থবিলাসী, নতুন বইয়ের খবর পেলেই কিনে আনি। আমার শত্রুরাও কবুল করবে যে, সে বই প'ড়েও থাকি; বন্ধুরা খুবই জানেন যে, প'ড়ে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেও ছাড়ি নে।—সেই আলোচনার চোটে বন্ধুরা পাশ কাটিয়ে চলাতে অবশেষে একটিমাত্র মানুষে এসে ঠেকেছে, বনবিহারী, যাকে নিয়ে আমি রবিবারে আসর জমাই। আমি তার নাম দিয়েছি কোণ-বিহারী। ছাদে ব'সে তার সঙ্গে আলাপ করতে করতে এক-একদিন রাত্তির দুটো হয়ে যায়। আমরা যখন এই নেশায় ভোর তখন আমাদের পক্ষে সুদিন ছিল না। তখনকার পুলিস কারও বাড়িতে গীতা দেখলেই সিডিশনের প্রমাণ পেত। তখনকার দেশভক্ত যদি দেখত কারও ঘরে বিলিতি বইয়ের পাতা কাটা তবে তাকে জানত দেশবিদ্রোহী। আমাকে ওরা শ্যামবর্ণের প্রলেপ দেওয়া শ্বেত-দ্বৈপায়ন ব'লেই গণ্য করত। সরস্বতীর বর্ণ সাদা ব'লেই সেদিন দেশভক্তদের কাছ থেকে তাঁর পুজো মেলা শক্ত হয়েছিল। যে সরোবরে তাঁর শ্বেতপদ্ম ফোটে সেই সরোবরের জলে দেশের কপাল-পোড়ানো আগুন নেবে

না, বরঞ্চ বাড়ে, এমনি একটা রব উঠেছিল।

সহধর্মিণীর সদ্‌দৃষ্টান্ত ও নিরন্তর তাগিদ সত্ত্বেও আমি খদ্দর পরি নে; তার কারণ এ নয় যে, খদ্দরে কোনো দোষ আছে বা গুণ নেই, বা বেশভূষায় আমি শৌখিন। একেবারে উল্টো—স্বাদেশিক চাল-চলনের বিরুদ্ধ অনেক অপরাধ আমার আছে, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা তার অন্তর্গত নয়। ময়লা মোটা রকমের সাজ, আলুথালু রকমে ব্যবহার করাটাই আমার অভ্যাস। কলিকার ভাবান্তর ঘটবার পূর্ববর্তী যুগে চীনেবাজারের আগা-চওড়া জুতো পরতুম, সে জুতোয় প্রতিদিন কালিমা-লেপন করিয়ে নিতে ভুলতুম, মোজা পরতে আপদ বোধ হত, শার্ট না পরে পাঞ্জাবি পরতে আরাম পেতুম, আর সেই পাঞ্জাবিতে দুটো-একটা বোতামের অভাব ঘটলেও খেয়াল করতুম না—ইত্যাদি কারণে কলিকার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হবার আশঙ্কা ঘটেছিল।

সে বলত, "দেখো, তোমার সঙ্গে কোথাও বেরোতে আমার লজ্জা করে।"

আমি বলতুম, "আমার অনুগত হবার দরকার নেই, আমাকে বাদ দিয়েই তুমি বেরিয়ো।"

আজ যুগের পরিবর্তন হয়েছে, আমার ভাগ্যের পরিবর্তন হয় নি। আজও কলিকা বলে, "তোমার সঙ্গে বেরোতে আমার লজ্জা করে।" তখন কলিকা যে দলে ছিল তাদের উর্দি আমি ব্যবহার করি নি, আজ যে দলে ভিড়েছে তাদের উর্দিও গ্রহণ করতে পারলুম না। আমাকে নিয়ে আমার স্ত্রীর লজ্জা সমানই রয়ে গেল। এটা আমারই স্বভাবের দোষ। যে-কোনো দলেরই হোক, ভেক ধারণ করতে আমার সংকোচ লাগে। কিছুতেই এটা কাটাতে পারলুম না। অপর পক্ষে মতান্তর জিনিসটা কলিকা খতম ক'রে মেনে নিতে পারে না। ঝর্নার ধারা যেমন মোটা পাথরটাকে বারে বারে ঘুরে ফিরে তর্জন করে বৃথা ঠেলা দিতেই থাকে, তেমনি ভিন্ন রুচিকে চলতে ফিরতে দিনে রাত্রে ঠেলা না দিয়ে কলিকা থাকতে পারে না; পৃথক মত নামক পদার্থের সংস্পর্শমাত্র ওর স্নায়ুতে যেন দুর্নিবারভাবে সুড়্‌সুড়ি লাগায়, ওকে এ'কেবারে ছট্‌ফটিয়ে তোলে।

কাল চায়ের নিমন্ত্রণে যাবার পূর্বেই আমার নিষ্‌খদ্দর বেশ নিয়ে একসহস্র-একতম বার কলিকা যে আলোচনা উত্থাপিত করেছিল তাতে তার কণ্ঠস্বরে মাধুর্য-মাত্র ছিল না। বুদ্ধির অভিমান থাকাতে বিনা তর্কে তার ভর্ৎসনা শিরোধার্য করে নিতে পারি নি—স্বভাবের প্রবর্তনায় মানুষকে এত ব্যর্থ চেষ্টাতেও উৎসাহিত করে। তাই আমিও একসহস্র-একতম বার কলিকাকে খোঁটা দিয়ে বললুম, "মেয়েরা বিধিদত্ত চোখটার উপর কালাপেড়ে মোটা ঘোমটা টেনে আচারের সঙ্গে আঁচলের গাঁট বেঁধে চলে। মননের চেয়ে মাননেই তাদের আরাম। জীবনের সকল ব্যবহারকেই রুচি ও বুদ্ধির স্বাধীন ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে সংস্কারের জেনানায় পর্দানশীন করতে পারলে তারা বাঁচে। আমাদের এই আচারজীর্ণ দেশে খদ্দর-পরাটা সেইরকম মালা-তিলকধারী ধার্মিকতার মতোই একটা সংস্কারে পরিণত হতে চলেছে ব'লেই মেয়েদের ওতে এত আনন্দ।"

কলিকা রেগে অস্থির হয়ে উঠল। তার আওয়াজ শুনে পাশের ঘর থেকে দাসীটা মনে করলে, ভার্যাকে পুরো ওজনের গয়না দিতে ভর্তা বুঝি ফাঁকি দিয়েছে। কলিকা

বললে, "দেখো, খদ্দর-পরার শুচিতা যেদিন গঙ্গাস্নানের মতোই দেশের লোকের সংস্কারে বাঁধা পড়ে যাবে সেদিন দেশ বাঁচবে। বিচার যখন স্বভাবের সঙ্গে এক হয়ে যায় তখনি সেটা হয় আচার। চিন্তা যখন আকারে দৃঢ়বদ্ধ হয় তখনি সেটা হয় সংস্কার; তখন মানুষ চোখ বুজে কাজ করে যায়, চোখ খুলে দ্বিধা করে না।"

এই কথাগুলো অধ্যাপক নয়নমোহনের আপ্ত বাক্য; তার থেকে কোটেশনমার্কা ক্ষয়ে গিয়েছে, কলিকা ওগুলোকে নিজের স্বচিন্তিত বলেই জানে।

'বোবার শত্রু নেই' যে পুরুষ বলেছিল সে নিশ্চয় ছিল অবিবাহিত। কোনো জবাব দিলুম না দেখে কলিকা দ্বিগুণ ঝেঁকে উঠে বললে, "বর্ণভেদ তুমি মুখে অগ্রাহ্য কর অথচ কাজে তার প্রতিকারের জন্য কিছুই কর না। আমরা খদ্দর প'রে প'রে সেই ভেদটার উপর অখণ্ড সাদা রঙ বিছিয়ে দিয়েছি, আবরণভেদ তুলে দিয়ে বর্ণভেদটার ছাল ছাড়িয়ে ফেলেছি।"

বলতে যাচ্ছিলুম, 'বর্ণভেদকে মুখেই অগ্রাহ্য করেছিলুম বটে যখন থেকে মুসলমানের রান্না মুর্গির ঝোল গ্রাহ্য করেছিলুম। সেটা কিন্তু মুখস্থ বাক্য নয়, মুখস্থ কার্য—তার গতিটা অন্তরের দিকে। কাপড় দিয়ে বর্ণ-বৈষম্য ঢাকা দেওয়াটা বাহ্যিক; ওতে ঢাকা দেওয়াই হয়, মুছে দেওয়া হয় না।' তর্কটাকে প্রকাশ করে বলবার যোগ্য সাহস কিন্তু হল না। আমি ভীরু পুরুষমানুষ মাত্র, চুপ করে রইলুম। জানি আপসে আমরা দুজনে যে-সব তর্ক শুরু করি কলিকা সেগুলিকে নিয়ে ধোবার বাড়ির কাপড়ের মতো আছড়িয়ে কচলিয়ে আনে তার বাহিরের বন্ধুমহল থেকে। দর্শনের প্রোফেসর নয়নমোহনের কাছ থেকে প্রতিবাদ সংগ্রহ করে তার দীপ্ত চক্ষু নীরব ভাষায় আমাকে বলতে থাকে, "কেমন জব্দ।"

নয়নের ওখানে নিমন্ত্রণে যাবার ইচ্ছা আমার একটুও ছিল না। নিশ্চয় জানি, হিন্দু-কাল্‌চারে সংস্কার ও স্বাধীন বুদ্ধি, আচার ও বিচারের আপেক্ষিক স্থানটা কী, এবং সেই আপেক্ষিকতায় আমাদের দেশকে অন্য-সকল দেশের চেয়ে উৎকর্ষ কেন দিয়েছে, এই নিয়ে চায়ের টেবিলে তপ্ত চায়ের ধোঁয়ার মতোই সূক্ষ্ম আলোচনায় বাতাস আর্দ্র ও আচ্ছন্ন হবার আশু সম্ভাবনা আছে। এ দিকে সোনালি পত্রলেখায় মণ্ডিত অখণ্ডিতপত্রবতী নবীন বইগুলি সদ্য দোকান থেকে আমার তাকিয়ার পাশে প্রতীক্ষা করছে; শুভদৃষ্টিমাত্র হয়েছে, কিন্তু এখনো তাদের ব্রাউন মোড়কের অবগুণ্ঠন মোচন হয় নি; তাদের সম্বন্ধে আমার পূর্বরাগ প্রতি মুহূর্তে অন্তরে অন্তরে প্রবল হয়ে উঠছে। তবু বেরোতে হল; কারণ, ধ্রুবব্রতার ইচ্ছাবেগ প্রতিহত হলে সেটা তার বাক্যে ও অবাক্যে এমন-সকল ঘূর্ণিরূপ ধারণ করে, যেটা আমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

বাড়ি থেকে অল্প একটু বেরিয়েছি। যেখানে রাস্তার ধারে কলতলা পেরিয়ে খোলার চালের ধারে স্থূলোদর হিন্দুস্থানি ময়রার দোকানে তেলে-ভাজা নানা-প্রকার অপথ্য সৃষ্টি হচ্ছে তার সামনে এসে দেখি বিষম একটা হল্লা। আমাদের প্রতিবেশী মাড়োয়ারিরা নানা বহুমূল্য পুজোপচার নিয়ে যাত্রা করে সবে-মাত্র বেরিয়েছে। এমন সময় এই জায়গাটাতে এসে ঠেকে গেল। শুনতে পেলেম মার-মার ধ্বনি। মনে ভাবলুম, কোনো গাঁটকাটাকে শাসন চলছে।

মোটরের শিঙা ফুঁকতে ফুঁকতে উত্তেজিত জনতার কেন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখি আমাদের পাড়ার বুড়ো সরকারি মেথরটাকে বেদম মারছে। একটু আগেই রাস্তার

কলতলায় স্নান সেরে সাফ কাপড় পরে ডান হাতে এক বালতি জল ও বগলে ঝাঁটা নিয়ে রাস্তা দিয়ে সে যাচ্ছিল। গায়ে চেক-কাটা মেরজাই, আঁচড়ানো চুল ভিজে; বাঁ হাত ধরে সঙ্গে চলেছিল আট-নয় বছরের এক নাতি। দুজনকেই দেখতে সুশ্রী, সুঠাম দেহ। সেই ভিড়ে কারও সঙ্গে বা কিছুর সঙ্গে তাদের ঠেকাঠেকি হয়ে থাকবে। তার থেকে এই নিরন্তর মারের সৃষ্টি। নাতিটা কাঁদছে আর সকলকে অনুনয় করছে, "দাদাকে মেরো না।" বুড়োটা হাত জোড় করে বলছে, "দেখতে পাই নি, বুঝতে পারি নি, কসুর মাফ করো।" অহিংসাব্রত পুণ্যার্থীদের রাগ চড়ে উঠছে। বুড়োর ভীত চোখ দিয়ে জল পড়ছে, দাড়ি দিয়ে রক্ত।

আমার আর সহ্য হয় না। ওদের সঙ্গে কলহ করতে নামা আমার পক্ষে অসম্ভব। স্থির করলুম, মেথরকে আমার নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে দেখাব আমি ধার্মিকদের দলে নই।

চঞ্চলতা দেখে কলিকা আমার মনের ভাব বুঝতে পারলে। জোর করে আমার হাত চেপে ধরে বললে, "করছ কী। ও যে মেথর!"

আমি বললুম, "হোক-না মেথর, তাই ব'লে ওকে অন্যায় মারবে?"

কলিকা বললে, "ওরই তো দোষ। রাস্তার মাঝখান দিয়ে যায় কেন। পাশ কাটিয়ে গেলে কি ওর মানহানি হত।"

আমি বললুম, "সে আমি বুঝি নে, ওকে আমি গাড়িতে তুলে নেবই।"

কলিকা বললে, "তা হলে এখনি এখানে রাস্তায় নেমে যাব। মেথরকে গাড়িতে নিতে পারব না—হাড়িডোম হলেও বুঝতুম, কিন্তু মেথর!"

আমি বললুম, "দেখছ না স্নান করে ধোপ দেওয়া কাপড় পরেছে? এদের অনেকের চেয়ে ও পরিষ্কার।"

"তা হোক-না, ও যে মেথর!"

শোফারকে বললে, "গঙ্গাদীন, হাঁকিয়ে চলে যাও।"

আমারই হার হল। আমি কাপুরুষ। নয়নমোহন সমাজতত্ত্বঘটিত গভীর যুক্তি বের করেছিল—সে আমার কানে পৌঁছল না, তার জবাবও দিই নি।

মাদ্রাজ

১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

বলাই

মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা নানা জীব জন্তুর প্রচ্ছন্ন পরিচয় পেয়ে থাকি, সে কথা জানা। বস্তুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক ক'রে নিয়েছে— আমাদের বাঘ-গোরুকে এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে পুরে, অহি-নকুলকে এক খাঁচায় ধ'রে রেখেছে। যেমন, রাগিণী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সমুদয় সা-রে-গা-মা-গুলোকে সংগীত ক'রে তোলে— তার পর থেকে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না— কিন্তু, সংগীতের ভিতরে এক-একটি সুর অন্য-সকল সুরকে ছাড়িয়ে বিশেষ হয়ে ওঠে, কোনোটাতে মধ্যম, কোনোটাতে কোমলগান্ধার, কোনোটাতে পঞ্চম।

আমার ভাইপো বলাই— তার প্রকৃতিতে কেমন ক'রে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়ানো নয়। পূর্বদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে; ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেলবেলাকার রোদ্দুর প'ড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায়; সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী-একটা সংগ্রহ ক'রে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে; ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চার দিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভ'রে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা ব'সে ব'সে আপন-মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে, যা-কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে; অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে এক-জোড়া অতি পুরানো পাখি, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, তাদের গল্প। ঐ ড্যাবা-ড্যাবা-চোখ-মেলে-সর্বদা-তাকিয়ে-থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়। ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সবুজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে পর্যন্ত নেবে গিয়েছে, সেইটে দেখে আর ওর মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে। ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না; ওর বোধ হয়, যেন ঐ ঘাসের পুঞ্জ একটা গড়িয়ে-চলা খেলা, কেবলই গড়াচ্ছে। প্রায়ই তারই সেই ঢালু বেয়ে ও নিজেও গড়াত— সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত— গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুড়্সুড়ি লাগত আর ও খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠত।

রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনা-রঙের রোদ্দুর দেবদারুবনের উপরে এসে পড়ে— ও কাউকে না ব'লে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই দেবদারুবনের নিস্তব্ধ ছায়াতলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছম্‌ছম্ করে— এই-সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায়; তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা-সব যেন অনেক কালের দাদা-মশায়, 'এক যে ছিল রাজা'দের আমলের।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়, অনেক সময় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কী খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কোঁক্‌ড়ানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠছে এই দেখতে তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে প'ড়ে প'ড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, 'তার পরে? তার পরে? তার পরে?' তারা ওর চির-অসমাপ্ত গল্প। সদ্য-গজিয়ে-ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী-যে-একটা বয়স্যভাব তা ও কেমন ক'রে প্রকাশ করবে। তারাও ওকে কী-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে 'তোমার নাম কী', হয়তো বলে 'তোমার মা কোথায় গেল'। বলাই মনে মনে উত্তর করে, 'আমার মা তো নেই।'

কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে বুঝেছে। এইজন্যে ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আম্‌লকী পাড়ে; ও কিছু বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দু পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস্‌ ক'রে বকুলগাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়— ওর কাঁদতে লজ্জা করে, পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সব চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে বেড়িয়েছে— এতটুকু-টুকু লতা, বেগনি হল্‌দে নামহারা ফুল, অতি ছোটো ছোটো; মাঝে মাঝে কণ্টিকারি গাছ, তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও বা কালমেঘের লতা, কোথাও বা অনন্তমূল; পাখিতে-খাওয়া নিম ফলের বিচি প'ড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা— সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়নি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই।

এক-একদিন ওর কাকির কোলে এসে ব'সে তার গলা জড়িয়ে বলে, "ঐ ঘাসিয়াড়াকে বলো-না, আমার ঐ গাছগুলো যেন না কাটে।"

কাকি বলে, "বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস্‌। ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন।"

বলাই অনেক দিন থেকে বুঝতে পেরেছিল, কতকগুলো ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই— ওর চারি দিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে— সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চার দিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে— দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রান্তরে; তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ ব'লে ব'লে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধ'রে দ্যুলোককে দোহন করে পৃথিবীর অমৃত-

ভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলে, 'আমি থাকব।' সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন-এক-রকম ক'রে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ঐ বলাই। আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলুম।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে ব্যস্ত ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল বাগানে। এক জায়গায় একটা চারা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাকা, এ গাছটা কী।"

দেখলুম একটা শিমুলগাছের চারা বাগানের খোওয়া-দেওয়া রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে।

হায় রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে। এতটুকু যখন এর অঙ্কুর বেরিয়েছিল, শিশুর প্রথম প্রলাপটুকুর মতো, তখনই এটা বলাইয়ের চোখে পড়েছে। তার পর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু জল দিয়েছে, সকালে বিকেলে ক্রমাগতই ব্যগ্র হয়ে দেখেছে কতটুকু বাড়ল। শিমুলগাছ বাড়েও দ্রুত, কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। যখন হাত দুয়েক উঁচু হয়েছে তখন ওর পত্রসমৃদ্ধি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশুর প্রথম বুদ্ধির আভাস দেখবা মাত্র মা যেমন মনে করে— আশ্চর্য শিশু। বলাই ভাবলে, আমাকেও চমৎকৃত ক'রে দেবে।

আমি বললুম, "মালীকে বলতে হবে, এটা উপড়ে ফেলে দেবে।"

বলাই চমকে উঠল। এ কী দারুণ কথা। বললে, "না, কাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপড়ে ফেলো না।"

আমি বললুম, "কী যে বলিস তার ঠিক নেই। একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে। বড়ো হলে চার দিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির ক'রে দেবে।"

আমার সঙ্গে যখন পারলে না, এই মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কাকির কাছে। কোলে ব'সে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "কাকি, তুমি কাকাকে বারণ ক'রে দাও, গাছটা যেন না কাটেন।"

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল। ওর কাকি আমাকে ডেকে বললে, "ওগো, শুনছ! আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।"

রেখে দিলুম। গোড়ায় বলাই না যদি দেখাত তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হত না। কিন্তু, এখন রোজই চোখে পড়ে। বছর-খানেকের মধ্যে গাছটা নির্লজ্জের মতো মস্ত বেড়ে উঠল। বলাইয়ের এমন হল, এই গাছটার 'পরেই তার সব চেয়ে স্নেহ।

গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বোধের মতো। একটা অজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে কাউকে খাতির নেই, একেবারে খাড়া লম্বা হয়ে উঠছে। যে দেখে সেই ভাবে, এটা এখানে কী করতে। আরও দু-চারবার এর মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করা গেল। বলাইকে লোভ দেখালুম, এর বদলে খুব ভালো কতকগুলো গোলাপের চারা আনিয়ে দেব।

বললেম, "নিতান্তই শিমুলগাছই যদি তোমার পছন্দ, তবে আর-একটা চারা আনিয়ে বেড়ার ধারে পুঁতে দেব, সুন্দর দেখতে হবে।"

কিন্তু কাটবার কথা বললেই আঁৎকে ওঠে, আর ওর কাকি বলে, "আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হয়েছে।"

আমার বৌদিদির মৃত্যু হয়েছে—যখন এই ছেলেটি তাঁর কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেয়াল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকির কোলেই মানুষ। বছর দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলাতি কায়দায় শিক্ষা দেবেন ব'লে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিমলেয়—তার পরে বিলেত নিয়ে যাবার কথা।

কাঁদতে কাঁদতে কাকির কোল ছেড়ে বলাই চলে গেল, আমাদের ঘর হল শূন্য।

তার পরে দু বছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের শূন্য শোবার ঘরে গিয়ে তার ছেঁড়া এক-পাটি জুতো, তার রবারের ফাটা গোলা, আর জানোয়ারের গল্পওয়ালা ছবির বই নাড়েন-চাড়েন; এত দিনে এই-সব চিহ্নকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলাই অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে, এই কথা ব'সে ব'সে চিন্তা করেন।

কোনো-এক সময়ে দেখলুম, লক্ষ্মীছাড়া শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে—এতদূর অসংগত হয়ে উঠেছে যে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এক সময়ে দিলুম তাকে কেটে।

এমন সময়ে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, "কাকি, আমার সেই শিমুলগাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।"

বিলেত যাবার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।

তার কাকি আমাকে ডেকে বললেন, "ওগো শুনছ, একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন!"

বলাইয়ের কাঁচা হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন।

আমি বললেম, "সে গাছ তো কাটা হয়ে গেছে।"

বলাইয়ের কাকি দুদিন অন্ন গ্রহণ করলেন না, আর অনেক দিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও কন নি। বলাইয়ের বাবা ওকে তাঁর কোল থেকে নিয়ে গেল, সে যেন ওঁর নাড়ী ছিঁড়ে; আর ওর কাকা তাঁর বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ওঁর যেন সমস্ত সংসারকে বাজল, তাঁর বুকের মধ্যে ক্ষত ক'রে দিলে।

ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের প্রতিরূপ, তারই প্রাণের দোসর।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

চিত্রকর

ময়মনসিংহ ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস ক'রে আমাদের গোবিন্দ এল কলকাতায়। বিধবা মায়ের অল্প কিছু সম্বল ছিল। কিন্তু, সব চেয়ে তার বড়ো সম্বল ছিল নিজের অবিচলিত সংকল্পের মধ্যে। সে ঠিক করেছিল, 'পয়সা করবই সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে।' সর্বদাই তার ভাষায় ধনকে সে উল্লেখ করত 'পয়সা' বলে। অর্থাৎ, তার মনে খুব-একটা দর্শন স্পর্শন ঘ্রাণের যোগ্য প্রত্যক্ষ পদার্থ ছিল; তার মধ্যে বড়ো নামের মোহ ছিল না; অত্যন্ত সাধারণ পয়সা, হাটে হাটে হাতে হাতে ঘুরে ঘুরে ক্ষয়ে-যাওয়া মলিন-হয়ে-যাওয়া পয়সা, তাম্রগন্ধী পয়সা, কুবেরের আদিম স্বরূপ, যা রুপোয় সোনায় কাগজে দলিলে নানা মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে মানুষের মনকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

নানা বাঁকা পথের ভিতর দিয়ে নানা পঙ্কে আবিল হতে হতে আজ গোবিন্দ তার পয়সাপ্রবাহিনীর প্রশস্তধারার পাকা বাঁধানো ঘাটে এসে পৌঁচেছে। গানি-ব্যাগ্‌ওয়ালা বড়োসাহেব ম্যাক্‌ডুগালের বড়োবাবুর আসনে তার ধ্রুব প্রতিষ্ঠা। সবাই তাকে নাম দিয়েছিল ম্যাক্‌দুলাল।

গোবিন্দর পৈতৃব্য ভাই মুকুন্দ যখন উকিল-লীলা সম্বরণ করলেন তখন একটি বিধবা স্ত্রী, একটি চার বছরের ছেলে, কলকাতায় একটি বাড়ি, কিছু জমা টাকা রেখে তিনি গেলেন লোকান্তরে। সম্পত্তির সঙ্গে কিছু ঋণও ছিল, সুতরাং তাঁর পরিবারে অন্নবস্ত্রের সংস্থান বিশেষ ব্যয়সংক্ষেপের উপর নির্ভর করত। এই কারণে তাঁর ছেলে চুনিলাল যে-সমস্ত উপকরণের মধ্যে মানুষ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে তুলনায় সেগুলি খ্যাতিযোগ্য নয়।

মুকুন্দদাদার উইল-অনুসারে এই পরিবারের সম্পূর্ণ ভার পড়েছিল গোবিন্দর 'পরে। গোবিন্দ শিশুকাল থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রের কানে মন্ত্র দিলে— 'পয়সা করো'।

ছেলেটির দীক্ষার পথে প্রধান বাধা দিলেন তাঁর মা সত্যবতী। স্পষ্ট কথায় তিনি কিছু বলেন নি, বাধাটা ছিল তাঁর ব্যবহারে। শিশুকাল থেকেই তাঁর বাতিক ছিল শিল্পকাজে। ফুল ফল পাতা নিয়ে, খাবারের জিনিস নিয়ে, কাগজ কেটে, কাপড় কেটে, মাটি দিয়ে, ময়দা দিয়ে, জামের রস— ফলসার রস— জবার রস— শিউলি-বোঁটার রস দিয়ে, নানা অভূতপূর্ব অনাবশ্যক জিনিস-রচনায় তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। এতে তাঁকে দুঃখও পেতে হয়েছে। কেননা, যা অদরকারি, যা অকারণ, তার বেগ আষাঢ়ের আকস্মিক বন্যাধারার মতো— সচলতা অত্যন্ত বেশি, কিন্তু দরকারি কাজের খেয়া বাইবার পক্ষে অচল। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে— জ্ঞাতিবাড়িতে নিমন্ত্রণ, সত্যবতী ভুলেই গেছেন, শোবার ঘরে দরজা বন্ধ, এক তাল মাটি চ'টকে বেলা কাটছে। জ্ঞাতিরা বললে, বড়ো অহংকার! সন্তোষজনক জবাব দেবার জো নেই। এ-সব কাজেও ভালোমন্দর যে মূল্যবিচার চলে, সেটা বইপড়া বিদ্যার যোগেই মুকুন্দ জানতেন। আর্ট্‌ শব্দটার মাহাত্ম্যে শরীর রোমাঞ্চিত হত। কিন্তু, তাঁর আপন গৃহিণীর হাতের কাজেও যে এই শব্দটার কোনো স্থান আছে এমন কথা মনে করতেই পারতেন না। এই মানুষটির স্বভাবটিতে কোথাও কাঁটাখোঁচা ছিল না। তাঁর স্ত্রী

অনাবশ্যক খেয়ালে অযথা সময় নষ্ট করেন, এটা দেখে তাঁর হাসি পেত, সে হাসি স্নেহরসে ভরা। এ নিয়ে সংসারের লোক কেউ যদি কটাক্ষ করত তিনি তখনই তার প্রতিবাদ করতেন। মুকুন্দর স্বভাবে অদ্ভুত একটা আত্মবিরোধ ছিল— ওকালতির কাজে ছিলেন প্রবীণ, কিন্তু ঘরের কাজে বিষয়বুদ্ধি ছিল না বললেই হয়। পয়সা তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে যথেষ্ট বইত, কিন্তু ধ্যানের মধ্যে আটকা পড়ত না। সেইজন্য মনটা ছিল মুক্ত; অনুগত লোকদের 'পরে নিজের ইচ্ছে চালাবার জন্যে কখনো দৌরাত্ম্য করতে পারতেন না। জীবনযাত্রার অভ্যাস ছিল খুব সাদাসিধা, নিজের স্বার্থ বা সেবা নিয়ে পরিজনদের 'পরে কোনোদিন অযথা দাবি করেন নি। সংসারের লোকে সত্যবতীর কাজে শৈথিল্য নিয়ে কটাক্ষ করলে মুকুন্দ তখনই সেটা থামিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে আদালত থেকে ফেরবার পথে রাধাবাজার থেকে কিছু রঙ, কিছু রঙিন রেশম, রঙের পেন্সিল, কিনে এনে সত্যবতীর অজ্ঞাতসারে তাঁর শোবার ঘরে কাঠের সিন্ধুকটার 'পরে সাজিয়ে রেখে আসতেন। কোনোদিন বা সত্যবতীর আঁকা একটা ছবি তুলে নিয়ে বলতেন, "বা, এ তো বড়ো সুন্দর হয়েছে।" একদিন একটা মানুষের ছবিকে উলটিয়ে ধ'রে তার পা দুটোকে পাখির মুণ্ড ব'লে স্থির করলেন; বললেন, "সতু, এটা কিন্তু বাঁধিয়ে রাখা চাই— বকের ছবি যা হয়েছে চমৎকার!" মুকুন্দ তাঁর স্ত্রীর চিত্ররচনায় ছেলেমানুষি কল্পনা ক'রে মনে মনে যে রসটুকু পেতেন, স্ত্রীও তাঁর স্বামীর চিত্রবিচার থেকে ভোগ করতেন সেই একই রস। সত্যবতী মনে নিশ্চিত জানতেন, বাংলাদেশের আর-কোনো পরিবারে তিনি এত ধৈর্য, এত প্রশ্রয়, আশা করতে পারতেন না; শিল্পসাধনায় তাঁর এই দুর্নিবার উৎসাহকে কোনো ঘরে এত দরদের সঙ্গে পথ ছেড়ে দিত না। এইজন্যে যেদিন তাঁর স্বামী তাঁর কোনো রচনা নিয়ে অদ্ভুত অত্যুক্তি করতেন সেদিন সত্যবতী যেন চোখের জল সামলাতে পারতেন না।

এমন দুর্লভ সৌভাগ্যকেও সত্যবতী একদিন হারালেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর স্বামী একটা কথা স্পষ্ট ক'রে বুঝেছিলেন যে, তাঁর ঋণজড়িত সম্পত্তির ভার এমন কোনো পাকা লোকের হাতে দেওয়া দরকার যাঁর চালনার কৌশলে ফুটো নৌকোও পার হয়ে যাবে। এই উপলক্ষে সত্যবতী এবং তাঁর ছেলেটি সম্পূর্ণভাবে গিয়ে পড়লেন গোবিন্দর হাতে। গোবিন্দ প্রথম দিন থেকেই জানিয়ে দিলেন, সর্বাগ্রে এবং সকলের উপরে পয়সা। গোবিন্দর এই উপদেশের মধ্যে এমন একটা সুগভীর হীনতা ছিল যে, সত্যবতী লজ্জায় কুণ্ঠিত হত।

তবু নানা আকারে আহারে-ব্যবহারে পয়সার সাধনা চলল। তা নিয়ে কথায় কথায় আলোচনা না ক'রে তার উপরে যদি একটা আব্রু থাকত তা হলে ক্ষতি ছিল না। সত্যবতী মনে মনে জানতেন, এতে তাঁর ছেলের মনুষ্যত্ব খর্ব করা হয়— কিন্তু, সহ্য করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না; কেননা, যে চিত্তভাব সুকুমার, যার মধ্যে একটি অসামান্য মর্যাদা আছে, সে'ই সব চেয়ে অরক্ষিত; তাকে আঘাত করা, বিদ্রূপ করা, সাধারণ রূঢ়স্বভাব মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

শিল্পচর্চার জন্যে কিছু কিছু উপকরণ আবশ্যক। এতকাল সত্যবতী তা না চাইতেই পেয়েছেন, সেজন্যে কোনোদিন তাঁকে কুণ্ঠিত হতে হয় নি। সংসারযাত্রার পক্ষে এই-সমস্ত অনাবশ্যক সামগ্রী, ব্যয়ের ফর্দে ধ'রে দিতে আজ যেন তাঁর মাথা

কাটা যায়। তাই তিনি নিজের আহারের খরচ বাঁচিয়ে গোপনে শিল্পের সরঞ্জাম কিনিয়ে আনাতেন। যা-কিছু কাজ করতেন সেও গোপনে দরজা বন্ধ ক'রে। ভর্ৎসনার ভয়ে নয়, অরসিকের দৃষ্টিপাতের সংকোচে। আজ চুনি ছিল তাঁর শিল্প-রচনার একমাত্র দর্শক ও বিচারকারী। এই কাজে ক্রমে তার সহযোগিতাও ফুটে উঠল। তাকে লাগল বিষম নেশা। শিশুর এ অপরাধ ঢাকা পড়ে না, খাতার পাতাগুলো অতিক্রম ক'রে দেয়ালের গায়ে পর্যন্ত প্রকাশ হতে থাকে। হাতে মুখে জামার হাতায় কলঙ্ক ধরা পড়ে। পয়সা-সাধনার বিরুদ্ধে ইন্দ্রদেব শিশুর চিত্তকেও প্রলুব্ধ করতে ছাড়েন না। খুড়োর হাতে অনেক দুঃখ তাকে পেতে হল।

এক দিকে শাসন যতই বাড়তে চলল আর-এক দিকে মা তাকে ততই অপরাধে সহায়তা করতে লাগলেন। আপিসের বড়োসাহেব মাঝে মাঝে আপিসের বড়োবাবুকে নিয়ে আপন কাজে মফস্বলে যেতেন, সেই সময়ে মায়েতে ছেলেতে মিলে অবাধ আনন্দ। একেবারে ছেলেমানুষির একশেষ! যে-সব জন্তুর মূর্তি হত বিধাতা এখনো তাদের সৃষ্টি করেন নি—বেড়ালের ছাঁচের সঙ্গে কুকুরের ছাঁচ যেত মিলে, এমন-কি মাছের সঙ্গে পাখির প্রভেদ ধরা কঠিন হত। এই-সমস্ত সৃষ্টিকার্য রক্ষা করবার উপায় ছিল না—বড়োবাবু ফিরে আসবার পূর্বেই এদের চিহ্ন লোপ করতে হত। এই দুজনের সৃষ্টিলীলায় ব্রহ্মা এবং রুদ্রই ছিলেন, মাঝখানে বিষ্ণুর আগমন হল না।

শিল্পরচনাবায়ুর প্রকোপ সত্যবতীদের বংশে প্রবল ছিল। তারই প্রমাণস্বরূপে সত্যবতীর চেয়ে বয়সে বড়ো তাঁরই এক ভাগনে রঙ্গলাল চিত্রবিদ্যায় হঠাৎ নামজাদা হয়ে উঠলেন। অর্থাৎ, দেশের রসিক লোক তাঁর রচনার অদ্ভুতত্ব নিয়ে খুব অট্টহাস্য জমালে। তারা যেরকম কল্পনা করে তার সঙ্গে তাঁর কল্পনার মিল হয় না দেখে তাঁর গুণপনার সম্বন্ধে তাদের প্রচণ্ড অবজ্ঞা হল। আশ্চর্য এই যে, এই অবজ্ঞার জমিতেই বিরোধ-বিদ্রূপের আবহাওয়ায় তাঁর খ্যাতি বেড়ে উঠতে লাগল; যারা তাঁর যতই নকল করে তারাই উঠে পড়ে লাগল প্রমাণ করতে যে, লোকটা আর্টিস্ট্ হিসাবে ফাঁকি—এমন-কি, তার টেক্‌নিকে সুস্পষ্ট গলদ। এই পরমনিন্দিত চিত্রকর একদিন আপিসের বড়োবাবুর অবর্তমানে এলেন তাঁর মামির বাড়িতে। দ্বারে ধাক্কা মেরে মেরে ঘরে যখন প্রবেশলাভ করলেন, দেখলেন মেঝেতে পা ফেলবার জো নেই। ব্যাপারখানা ধরা পড়ল। রঙ্গলাল বললেন, "এতদিন পরে দেখা গেল, গুণীর প্রাণের ভিতর থেকে সৃষ্ট মূর্তি তাজা বেরিয়েছে—এর মধ্যে দাগা-বুলোনোর তো কোনো লক্ষণ নেই, যে বিধাতা রূপ সৃষ্টি করেন তাঁর বয়সের সঙ্গে ওর বয়সের মিল আছে। সব ছবিগুলো বের ক'রে আমাকে দেখাও।"

কোথা থেকে বের করবে। যে গুণী রঙে রঙে ছায়ায় আলোয় আকাশে আকাশে চিত্র আঁকেন তিনি তাঁর কুহেলিকা-মরীচিকাগুলি যেখানে অকাতরে সরিয়ে ফেলেন, এদের কীর্তিগুলোও সেইখানেই গেছে। রঙ্গলাল মাথার দিব্যি দিয়ে তাঁর মামিকে বললেন, "এবার থেকে তোমরা যা-কিছু রচনা করবে আমি এসে সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।"

বড়োবাবু এখনো আসেন নি। সকাল থেকে শ্রাবণের ছায়ায় আকাশ ধ্যানমগ্ন, বৃষ্টি পড়ছে; বেলা ঘড়ির কাঁটার কোন্ সংকেতের কাছে তার ঠিকানা নেই, তার খোঁজ করতেও মন যায় না। আজ চুনিবাবু নৌকো-ভাসানোর ছবি আঁকতে লেগেছেন।

নদীর ঢেউগুলো মকরের পাল, হাঁ ক'রে নৌকোটাকে গিলতে চলেছে এমনিতরো ভাব; আকাশের মেঘগুলোও যেন উপর থেকে চাদর উড়িয়ে উৎসাহ দিচ্ছে ব'লে বোধ হচ্ছে—কিন্তু, মকরগুলো সর্বসাধারণের মকর নয়, আর মেঘগুলোকে 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিবেশঃ' বললে অত্যুক্তি করা হবে। এ কথাও সত্যের অনুরোধে বলা উচিত যে, এইরকমের নৌকো যদি গড়া হয় তা হলে ইন্‌সুয়োরেন্স আপিস কিছুতেই তার দায়িত্ব নিতে রাজি হবে না। চলল রচনা, আকাশের চিত্রীও যা-খুশি তাই করছেন আর ঘরের মধ্যে ঐ মস্ত-চোখ-মেলা ছেলেটিও তথৈবচ।

এদের খেয়াল ছিল না যে, দরজা খোলা। বড়োবাবু এলেন। গর্জন ক'রে উঠলেন, "কী হচ্ছে রে!"

ছেলেটার বুক কেঁপে উঠল, মুখ হল ফ্যাকাশে। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, পরীক্ষায় চুনিলালের ইতিহাসে তারিখ ভুল হচ্ছে তার কারণটা কোথায়। ইতিমধ্যে চুনিলাল ছবিটাকে তার জামার মধ্যে লুকোবার ব্যর্থ প্রয়াস করাতে অপরাধ আরও প্রকাশমান হয়ে উঠল। টেনে নিয়ে গোবিন্দ যা দেখলেন তাতে তিনি আরও অবাক—এটা ব্যাপারখানা কী। এর চেয়ে যে ইতিহাসের তারিখ ভুলও ভালো। ছবিটা কুটিকুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেললেন। চুনিলাল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সত্যবতী একাদশীর দিন প্রায় ঠাকুরঘরেই কাটাতেন। সেইখান থেকে ছেলের কান্না শুনে ছুটে এলেন। ছবির ছিন্ন খণ্ডগুলো মেঝের উপর লুটোচ্ছে আর মেঝের উপর লুটোচ্ছে চুনিলাল। গোবিন্দ তখন ইতিহাসের তারিখ-ভুলের আদি কারণগুলো সংগ্রহ করছিলেন অপসারণের অভিপ্রায়ে।

সত্যবতী এতদিন কখনো গোবিন্দর কোনো ব্যবহারে কোনো কথা বলেন নি। এ'রই 'পরে তাঁর স্বামী নির্ভর স্থাপন করেছেন, এই স্মরণ করেই তিনি নিঃশব্দে সব সহ্য করেছেন। আজ তিনি অশ্রুতে আর্দ্র, ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "কেন তুমি চুনির ছবি ছিঁড়ে ফেললে।"

গোবিন্দ বললেন, "পড়াশুনো করবে না? আখেরে ওর হবে কী?"

সত্যবতী বললেন, "আখেরে ও যদি পথের ভিক্ষুক হয় সেও ভালো। কিন্তু, কোনোদিন তোমার মতো যেন না হয়। ভগবান ওকে যে সম্পদ দিয়েছেন তারই গৌরব যেন তোমার পয়সার গর্বের চেয়ে বেশি হয়, এই ওর প্রতি আমার মায়ের আশীর্বাদ।"

গোবিন্দ বললেন, "আমার দায়িত্ব আমি ছাড়তে পারব না, এ চলবে না কিছুতেই। আমি কালই ওকে বোর্ডিং-স্কুলে পাঠিয়ে দেব—নইলে তুমি ওর সর্বনাশ করবে।"

বড়োবাবু আপিসে গেলেন। ঘনবৃষ্টি নামল, রাস্তা জলে ভেসে যাচ্ছে।

সত্যবতী চুনির হাত ধরে বললেন, "চল্‌, বাবা।"

চুনি বললে, "কোথায় যাবে, মা।"

"এখান থেকে বেরিয়ে যাই।"

রঙ্গলালের দরজায় এক-হাঁটু জল। সত্যবতী চুনিলালকে নিয়ে তার ঘরে ঢুকলেন; বললেন, "বাবা, তুমি নাও এর ভার। বাঁচাও এ'কে পয়সার সাধনা থেকে।"

কার্তিক ১৩৩৬

চোরাই ধন

মহাকাব্যের যুগে স্ত্রীকে পেতে হত পৌরুষের জোরে; যে অধিকারী সেই লাভ করত রমণীরত্ন। আমি লাভ করেছি কাপুরুষতা দিয়ে, সে কথা আমার স্ত্রীর জানতে বিলম্ব ঘটেছিল। কিন্তু, সাধনা করেছি বিবাহের পরে; যাকে ফাঁকি দিয়ে চুরি করে পেয়েছি তার মূল্য দিয়েছি দিনে দিনে।

দাম্পত্যের স্বত্ব সাব্যস্ত করতে হয় প্রতিদিনই নতুন ক'রে, অধিকাংশ পুরুষ ভুলে থাকে এই কথাটা। তারা গোড়াতেই কাস্টম হৌসে মাল খালাস ক'রে নিয়েছে সমাজের ছাড়চিঠি দেখিয়ে, তার পর থেকে আছে বেপরোয়া। যেন পেয়েছে পাহার-ওয়ালার সরকারি প্রতাপ উপরওয়ালার দেওয়া হুকমার জোরে; উর্দিটা খুলে নিলেই অতি অভাজন তারা।

বিবাহটা চিরজীবনের পালাগান; তার ধুয়ো একটামাত্র, কিন্তু সংগীতের বিস্তার প্রতিদিনের নব নব পর্যায়ে। এই কথাটা ভালোরকম করে বুঝেছি সুনেত্রার কাছ থেকেই। ওর মধ্যে আছে ভালোবাসার ঐশ্বর্য, ফুরোতে চায় না তার সমারোহ; দেউড়িতে চার-প্রহর বাজে তার সাহানা রাগিণী। আপিস থেকে ফিরে এসে একদিন দেখি আমার জন্যে সাজানো আছে বরফ-দেওয়া ফল্‌সার সরবৎ, রঙ দেখেই মনটা চমকে ওঠে; তার পাশেই ছোটো রুপোর থালায় গোড়ে মালা, ঘরে ঢোকবার আগেই গন্ধ আসে এগিয়ে। আবার কোনোদিন দেখি আইস্‌ক্রীমের যন্ত্রে জমানো, শাঁসে রসে মেশানো, তালশাঁস এক-পেয়ালা, আর পিরিচে একটিমাত্র সূর্যমুখী। ব্যাপারটা শুনতে বেশি কিছু নয়, কিন্তু বোঝা যায় দিনে দিনে নতুন ক'রে সে অনুভব করেছে আমার অস্তিত্ব। এই পুরোনোকে নতুন ক'রে অনুভব করার শক্তি আর্টিস্টের। আর 'ইতরে জনাঃ' প্রতিদিন চলে দস্তুরের দাগা বুলিয়ে। ভালোবাসার প্রতিভা সুনেত্রার, নবনবোন্মেষশালিনী সেবা। আজ আমার মেয়ে অরুণার বয়স সতেরো, অর্থাৎ ঠিক যে বয়সে বিয়ে হয়েছিল সুনেত্রার। ওর নিজের বয়স আটত্রিশ, কিন্তু সযত্নে সাজসজ্জা করাটাকে ও জানে প্রতিদিন পুজোর নৈবেদ্য-সাজানো, আপনাকে উৎসর্গ করবার আহ্নিক অনুষ্ঠান।

সুনেত্রা ভালোবাসে শান্তিপুরে সাদা শাড়ি কালো-পাড়-ওয়ালা। খদ্দর-প্রচারকদের ধিক্কারকে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিয়েছে, কিছুতেই স্বীকার করে নি খদ্দরকে। ও বলে, 'দিশি তাঁতির হাত, দিশি তাঁতির তাঁত, এই আমার আদরের। তারা শিল্পী, তাদেরই পছন্দে সুতো, আমার পছন্দ সমস্ত কাপড়টা নিয়ে।' আসল কথা, সুনেত্রা বোঝে হালকা সাদা রঙের শাড়িতে সকল রঙেরই ইশারা খাটে সহজে। ও সেই কাপড়ে নূতনত্ব দেয় নানা আভাসে, মনে হয় না সেজেছে। ও বোঝে, আমার অবচেতন মনের দিগন্ত উদ্ভাসিত হয় ওর সাজে— আমি খুশি হই, জানি নে কেন খুশি হয়েছি।

প্রত্যেক মানুষেই আছে একজন আমি, সেই অপরিমেয় রহস্যের অসীম মূল্য জোগায় ভালোবাসায়। অহংকারের মেকি পয়সা তুচ্ছ হয়ে যায় এর কাছে। সুনেত্রা আপন মনপ্রাণ দিয়ে এই পরম মূল্য দিয়ে এসেছে আমাকে, আজ একুশ বছর ধ'রে।

ওর শুভ্র ললাটে কুঙ্কুমবিন্দুর মধ্যে প্রতিদিন লেখা হয় অক্লান্ত বিস্ময়ের বাণী। ওর নিখিল জগতের মর্মস্থান অধিকার করে আছি আমি, সেজন্যে আমাকে আর-কিছু হতে হয় নি সাধারণ জগতের যে-কেউ হওয়া ছাড়া। সাধারণকেই অসাধারণ ক'রে আবিষ্কার করে ভালোবাসা। শাস্ত্রে বলে, আপনাকে জানো। আনন্দে আপনাকেই জানি আর-একজন যখন প্রেমে জেনেছে আমার আপনকে।

বাবা ছিলেন কোনো নামজাদা ব্যাঙ্কের অন্যতম অধিনায়ক, তারই একজন অংশীদার হলেম আমি। যাকে বলি ঘুমিয়ে-পড়া অংশীদার একেবারেই তা নয়। আষ্টেপৃষ্ঠে লাগাম দিয়ে জুতে দিলে আমাকে আপিসের কাজে। আমার শরীর-মনের সঙ্গে এই কাজটা মানানসই নয়। ইচ্ছা ছিল, ফরেস্ট্‌ বিভাগে কোথাও পরিদর্শকের পদ দখল করে বসি, খোলা হাওয়ায় দৌড়ধাপ করি, শিকারের শখ নিই মিটিয়ে। বাবা তাকালেন প্রতিপত্তির দিকে; বললেন, 'যে কাজ পাচ্ছ সেটা সহজে জোটে না বাঙালির ভাগ্যে।' হার মানতে হল। তা ছাড়া মনে হয়, পুরুষের প্রতিপত্তি জিনিসটা মেয়েদের কাছে দামী। [illegible]র ভগ্নীপতি অধ্যাপক; ইম্পীরিএল সার্ভিস তার, সেটাতে ওদের মেয়েমহলের মাথা উপরে তুলে রাখে। যদি জংলি 'নিস্‌পেকেট্টর সাহেব' হয়ে সোলার হ্যাট প'রে বাঘ-ভালুকের চামড়ায় মেঝে দিতুম ঢেকে, তাতে আমার দেহের গুরুত্ব কমিয়ে রাখত, সেই সঙ্গে কমাত আমার পদের গৌরব আর-পাঁচজন পদস্থ প্রতিবেশীর তুলনায়। কী জানি, এই লাঘবে মেয়েদের আত্মাভিমান বুঝি কিছু ক্ষুণ্ণ করে।

এ দিকে ডেস্কে-বাঁধা স্থাবরত্বের চাপে দেখতে দেখতে আমার যৌবনের ধারা আসছে ভোঁতা হয়ে। অন্য কোনো পুরুষ হলে সে কথাটা নিশ্চিন্ত মনে ভুলে গিয়ে পেটের পরিধি-বিস্তারকে দুর্বিপাক ব'লে গণ্য করত না। আমি তা পারি নে। আমি জানি, সুনেত্রা মুগ্ধ হয়েছিল শুধু আমার গুণে নয়, আমার দেহসৌষ্ঠবে। বিধাতার স্বরচিত যে বরমাল্য অঙ্গে নিয়ে একদিন তাকে বরণ করেছি নিশ্চিত তার প্রয়োজন আছে প্রতিদিনের অভ্যর্থনায়। আশ্চর্য এই যে, সুনেত্রার যৌবন আজও রইল অক্ষুণ্ণ, দেখতে দেখতে আমিই চলেছি ভাঁটার মুখে— শুধু ব্যাঙ্কে জমছে টাকা।

আমাদের মিলনের প্রথম অভ্যুদয়কে আর-একবার প্রত্যক্ষ চোখের সামনে আনল আমার মেয়ে অরুণা। আমাদের জীবনের সেই উষারুণরাগ দেখা দিয়েছে ওদের তারুণ্যের নবপ্রভাতে। দেখে পুলকিত হয়ে ওঠে আমার সমস্ত মন। শৈলেনের দিকে চেয়ে দেখি, আমার সেদিনকার বয়স ওর দেহে আবির্ভূত। যৌবনের সেই ক্ষিপ্রশক্তি, সেই অজস্র প্রফুল্লতা, আবার ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহত দুরাশায় ম্লায়মান উৎসাহের উৎকণ্ঠা। সেইদিন আমি যে পথে চলতেম সেই পথ ওরও সামনে, তেমনি করেই অরুণার মায়ের মন বশ করবার নানা উপলক্ষ ও সৃষ্টি করছে, কেবল যথেষ্ট লক্ষগোচর নই আমিই। অপর পক্ষে অরুণা জানে মনে মনে, তার বাবা বোঝে মেয়ের দরদ। এক-একদিন কী জানি কেন দুই চক্ষে অদৃশ্য অশ্রুর করুণা নিয়ে চুপ ক'রে এসে বসে আমার পায়ের কাছের মোড়ায়। ওর মা নিষ্ঠুর হতে পারে, আমি পারি নে।

অরুণার মনের কথা ওর মা যে বোঝে না তা নয়; কিন্তু তার বিশ্বাস, এ সমস্তই

'প্রভাতে মেঘডম্বরম্', বেলা হলেই যাবে মিলিয়ে। ঐখানেই সুনেত্রার সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য। খিদে মিটতে না দিয়ে খিদে মেরে দেওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন পাত পড়বে তখন হৃদয়ের রসনায় নবীন ভালোবাসার স্বাদ যাবে মরে। মধ্যাহ্নে ভোরের সুর লাগাতে গেলে আর লাগে না। অভিভাবক বলেন, বিবেচনা করবার বয়েস হোক আগে, তার পরে, ইত্যাদি। হায় রে, বিবেচনা করবার বয়েস ভালোবাসার বয়েসের উল্টো পিঠে।

কয়েকদিন আগেই এসেছিল 'ভরা বাদর মাহ ভাদর'। ঘনবর্ষণের আড়ালে কলকাতার ইটকাঠের বাড়িগুলো এল মোলায়েম হয়ে, শহরের প্রখর মুখরতা অশ্রু-গদ্‌গদ কণ্ঠস্বরের মতো হল বাষ্পাকুল। ওর মা জানত অরুণা আমার লাইব্রেরি ঘরে পরীক্ষার পড়ায় প্রবৃত্ত। একখানা বই আনতে গিয়ে দেখি, মেঘাচ্ছন্ন দিনান্তের সজল ছায়ায় জানলার সামনে সে চুপ করে বসে; তখনো চুল বাঁধে নি, পুবে হাওয়ায় বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে তার এলোচুলে।

সুনেত্রাকে কিছু বললেম না। তখনি শৈলেনকে লিখে দিলেম চায়ের নিমন্ত্রণ-চিঠি। পাঠিয়ে দিলেম আমার মোটরগাড়ি ওদের বাড়িতে। শৈলেন এল, তার অকস্মাৎ আবির্ভাব সুনেত্রার পছন্দ নয়, সেটা বোঝা কঠিন ছিল না। আমি শৈলেনকে বললেম, "গণিতে আমার যেটুকু দখল তাতে হাল আমলের ফিজিক্সের তল পাই নে, তাই তোমাকে ডেকে পাঠানো; কোয়ান্টম্ থিওরিটা যথাসাধ্য বুঝে নিতে চাই, আমার সেকেলে বিদ্যেসাধ্যি অত্যন্ত বেশি অথর্ব হয়ে পড়েছে।"

বলা বাহুল্য, বিদ্যাচর্চা বেশিদূর এগোয় নি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস অরুণা তার বাবার চাতুরি স্পষ্টই ধরেছে আর মনে মনে বলেছে, এমন আদর্শ বাবা অন্য কোনো পরিবারে আজ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয় নি।

কোয়ান্টম্ থিওরির ঠিক শুরুতেই বাজল টেলিফোনের ঘণ্টা—ধড়্‌ফড়িয়ে উঠে বললেম, "জরুরি কাজের ডাক। তোমরা এক কাজ করো, ততক্ষণ পার্লার টেনিস খেলো, ছুটি পেলেই আবার আসব ফিরে।"

টেলিফোনে আওয়াজ এল, "হ্যালো, এটা কি বারোশো অমুক নম্বর।"

আমি বললেম, "না, এখানকার নম্বর সাতশো অমুক।"

পরক্ষণেই নীচের ঘরে গিয়ে একখানা বাসি খবরের কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেম, অন্ধকার হয়ে এল, দিলেম বাতি জেলে।

সুনেত্রা এল ঘরে। অত্যন্ত গম্ভীর মুখ। আমি হেসে বললেম, "মিটিয়রলজিস্‌ট্ তোমার মুখ দেখলে ঝড়ের সিগ্‌নাল দিত।"

ঠাট্টায় যোগ না দিয়ে সুনেত্রা বললে, "কেন তুমি শৈলেনকে অমন করে প্রশ্রয় দাও বারে বারে।"

আমি বললেম, "প্রশ্রয় দেবার লোক অদৃশ্যে আছে ওর অন্তরাত্মায়।"

"ওদের দেখাশোনাটা কিছুদিন বন্ধ রাখতে পারলে এই ছেলেমানুষিটা কেটে যেত আপনা হতেই।"

"ছেলেমানুষির কসাইগিরি করতে যাবই বা কেন। দিন যাবে, বয়স বাড়বে, এমন ছেলেমানুষি আর তো ফিরে পাবে না কোনো কালে।"

"তুমি গ্রহনক্ষত্র মান' না, আমি মানি। ওরা মিলতে পারে না।"

"গ্রহনক্ষত্র কোথায় কী ভাবে মিলেছে চোখে পড়ে না, কিন্তু ওরা দুজনে যে মিলেছে অন্তরে অন্তরে সেটা দেখা যাচ্ছে খুব স্পষ্ট করেই।"

"তুমি বুঝবে না আমার কথা। যখনি আমরা জন্মাই তখনি আমাদের যথার্থ দোসর ঠিক হয়ে থাকে। মোহের ছলনায় আর-কাউকে যদি স্বীকার করে নিই তবে তাতেই ঘটে অজ্ঞাত অসতীত্ব। নানা দুঃখে বিপদে তার শাস্তি।"

"যথার্থ দোসর চিনব কী করে।"

"নক্ষত্রের স্বহস্তে স্বাক্ষর-করা দলিল আছে।"

৩

আর লুকোনো চলল না।

আমার শ্বশুর অজিতকুমার ভট্টাচার্য। বনেদি পণ্ডিত-বংশে তাঁর জন্ম। বাল্যকাল কেটেছে চতুষ্পাঠীর আবহাওয়ায়। পরে কলকাতায় এসে কলেজে নিয়েছেন এম.এ. ডিগ্রি [illegible] সত জ্যোতিষে তাঁর যেমন বিশ্বাস ছিল তেমনি ব্যুৎপত্তি। তাঁর বাবা [illegible] নৈয়ায়িক, ঈশ্বর তাঁর মতে অসিদ্ধ; আমার শ্বশুরও দেবদেবী কিছু [illegible] তার প্রমাণ পেয়েছি। তাঁর সমস্ত বেকার বিশ্বাস ভিড় করে এসে প[illegible]র উপর, একরকম গোঁড়ামি বললেই হয়। এই ঘরে জন্মেছে সুনে[illegible] থেকে তার চার দিকে গ্রহনক্ষত্রের কড়া পাহারা।

আ[illegible] অধ্যাপকের প্রিয় ছাত্র, সুনেত্রাকেও তার পিতা দিতেন শিক্ষা। পরস্পর মে[illegible]সুযোগ হয়েছিল বারবার। সুযোগটা যে ব্যর্থ হয় নি সে খবরটা বেতার বিদ্যুদ্‌বার্তায় আমার কাছে ব্যক্ত হয়েছে। আমার শাশুড়ির নাম বিভাবতী। সাবেক কালের আওতার মধ্যে তাঁর জন্ম বটে, কিন্তু স্বামীর সংসর্গে তাঁর মন ছিল সংস্কারমুক্ত, স্বচ্ছ। স্বামীর সঙ্গে প্রভেদ এই, গ্রহনক্ষত্র তিনি একেবারেই মানতেন না, মানতেন আপন ইষ্টদেবতাকে। এ নিয়ে স্বামী একদিন ঠাট্টা করাতে বলেছিলেন, "ভয়ে ভয়ে তুমি পেয়েদাগুলোর কাছে সেলাম ঠুকে বেড়াও, আমি মানি স্বয়ং রাজাকে।"

স্বামী বললেন, "ঠকবে। রাজা থাকলেও যা, না থাকলেও তা; লাঠি-ঘাড়ে নিশ্চিত আছে পেয়াদার দল।"

শাশুড়ি-ঠাকরুন বললেন, "ঠকব সেও ভালো। তাই ব'লে দেউড়ির দরবারে গিয়ে নাগরা জুতোর কাছে মাথা হেঁট করতে পারব না।"

আমার শাশুড়ি আমাকে বড়ো স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে আমার মনের কথা ছিল অবারিত। অবকাশ বুঝে একদিন তাঁকে বললেম, "মা, তোমার নেই ছেলে, আমার নেই মা। মেয়ে দিয়ে আমাকে দাও তোমার ছেলের জায়গাটি। তোমার সম্মতি পেলে তার পরে পায়ে ধরব অধ্যাপকের।"

তিনি বললেন, "অধ্যাপকের কথা পরে হবে বাছা, আগে তোমার ঠিকুজি এনে দাও আমার কাছে।"

দিলেম এনে। তিনি বললেন, "হবার নয়। অধ্যাপকের মত হবে না। অধ্যাপকের মেয়েটিও তার বাপেরই শিষ্যা।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "মেয়ের মা?"

বললেন, "আমার কথা বোলো না। আমি তোমাকে জানি, আমার মেয়ের মনও জানি, তার বেশি জানবার জন্যে নক্ষত্রলোকে ছোটবার শখ নেই আমার।"

আমার মন উঠল বিদ্রোহী হয়ে। বললেম, এমনতরো অবাস্তব বাধা মানাই অন্যায়। কিন্তু, যা অবাস্তব তার গায়ে ঘা বসে না। তার সঙ্গে লড়াই করব কী দিয়ে।

এ দিকে মেয়ের সম্বন্ধের কথা আসতে লাগল নানা দিক থেকে। গ্রহতারকার অসম্মতি নেই এমন প্রস্তাবও ছিল তার মধ্যে। মেয়ে জিদ ক'রে বলে বসল, সে চিরকাল কুমারী থাকবে, বিদ্যার সাধনাতেই যাবে তার দিন।

বাপ মানে বুঝলেন না, তাঁর মনে পড়ল লীলাবতীর কথা। মা বুঝলেন, গোপনে জল পড়তে লাগল তাঁর চোখ দিয়ে। অবশেষে একদিন মা আমার হাতে একখানি কাগজ দিয়ে বললেন, "সুনেত্রার ঠিকুজি। এই দেখিয়ে তোমার জন্মপত্রী সংশোধন করিয়ে নিয়ে এসো। আমার মেয়ের অকারণ দুঃখ সইতে পারব না।"

পরে কী হল বলতে হবে না। ঠিকুজির অঙ্কজাল থেকে [illegible] উদ্ধার ক'রে আনলেম। চোখের জল মুছতে মুছতে মা বললেন, "পুণ্যক [illegible]।"

তার পরে গেছে একুশ বছর কেটে।

৪

হাওয়ার বেগ বাড়তে চলল, বৃষ্টির বিরাম নেই। সুনেত্রাকে [illegible] "আলোটা লাগছে চোখে, নিবিয়ে দিই।" নিবিয়ে দিলেম।

বৃষ্টিধারার মধ্যে দিয়ে রাস্তার ল্যাম্পের ঝাপসা আভা এল অন্ধকার ঘরে। সোফার উপরে সুনেত্রাকে বসালেম আমার পাশে। বললেম, "সুনি, আমাকে তোমার যথার্থ দোসর ব'লে মান তুমি?"

"এ আবার কী প্রশ্ন হল তোমার। উত্তর দিতে হবে নাকি।"

"তোমার গ্রহতারা যদি না মানে?"

"নিশ্চয় মানে, আমি বুঝি জানি নে?"

"এতদিন তো একত্রে কাটল আমাদের, কোনো সংশয় কি কোনোদিন উঠেছে তোমার মনে।"

"অমন সব বাজে কথা জিজ্ঞাসা কর যদি রাগ করব।"

"সুনি, দুজনে মিলে দুঃখ পেয়েছি অনেকবার। আমাদের প্রথম ছেলেটি মারা গেছে আট-মাসে। টাইফয়েডে আমি যখন মরণাপন্ন, বাবার হল মৃত্যু। শেষে দেখি উইল জাল ক'রে দাদা নিয়েছেন সমস্ত সম্পত্তি। আজ চাকরিই আমার একমাত্র ভরসা। তোমার মায়ের স্নেহ ছিল আমার জীবনের ধ্রুবতারা। পুজোর ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার পথে নৌকোডুবি হয়ে স্বামীর সঙ্গে মারা গেলেন মেঘনা নদীর গর্ভে। দেখলেম, বিষয়বুদ্ধিহীন অধ্যাপক ঋণ রেখে গেছেন মোটা অঙ্কের; সেই ঋণ স্বীকার ক'রে নিলেম। কেমন ক'রে জানব এই-সমস্ত বিপত্তি ঘটায় নি আমারই দুষ্টগ্রহ? আগে থাকতে যদি জানতে আমাকে তো বিয়ে করতে না।"

সুনেত্রা কোনো উত্তর না ক'রে আমাকে জড়িয়ে ধরলে।

আমি বললেম, "সব দুঃখ-দুর্লক্ষণের চেয়ে ভালোবাসাই যে বড়ো, আমাদের জীবনে তার কি প্রমাণ হয় নি।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয় হয়েছে।"

"মনে করো, যদি গ্রহের অনুগ্রহে তোমার আগেই আমার মৃত্যু হয়, সেই ক্ষতি কি বেঁচে থাকতেই আমি পূরণ করতে পারি নি।"

"থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না।"

"সাবিত্রীর কাছে সত্যবানের সঙ্গে এক দিনের মিলনও যে চিরবিচ্ছেদের চেয়ে বড়ো ছিল, তিনি তো ভয় করেন নি মৃত্যুগ্রহকে।"

চুপ করে রইল সুনেত্রা। আমি বললেম, "তোমার অরুণা ভালোবেসেছে শৈলেনকে, [illegible]ই থাক্ অজানা, কী বল, সুনি।"

[illegible] না।

[illegible]সেছিলুম, বাধা পেয়েছি। আমি সংসারে দ্বিতীয়-[illegible]তে দেব না কোনো গ্রহেরই মন্ত্রণায়। ওদের দুজনের [illegible]তে দেব না কিছুতেই।"

[illegible]তে পায়ের শব্দ শোনা গেল। শৈলেন নেমে চলে যাচ্ছে। [illegible] বললে, "কী বাবা শৈলেন! এখুনি তুমি যাচ্ছ নাকি।" [illegible] "কিছু দেরি হয়েইে গেছে, ঘড়ি ছিল না, বুঝতে [illegible]"

স[illegible] "না, কিছু দেরি হয় নি। আজ রাত্রে তোমাকে এখানেই খেয়ে যেতে [illegible]"

একেই তো বলে প্রশ্রয়।

সেই রাত্রে আমার ঠিকুজি-সংশোধনের সমস্ত বিবরণ সুনেত্রাকে শোনালেম। সে বলে উঠল, "না বললেই ভালো করতে।"

"কেন।"

"এখন থেকে কেবলই ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে।"

"কিসের ভয়। বৈধব্যযোগের?"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সুনি। তার পর বললে, "না, করব না ভয়। আমি যদি তোমাকে ফেলে আগে চলে যাই তা হলে আমার মৃত্যু হবে দ্বিগুণ মৃত্যু।

কার্তিক ১৩৪০